লেনিনবাদীরা
[সি পি এস ইউ–সি পি আই (এম)]
কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার
অনুবাদেও কারসাজি করেছে

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:
ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশে।

www.icwfreedom.org
e-mail:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com
Mob:(880) + 01675216486,
01715345006,01717895857.

প্রকাশকাল: জুলাই-২০১১।
মুদ্রণে-
দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
২০০ টাকা।

পুর্বাভাষ

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রচিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালের শেষ দিকে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে জার্মান ভাষায়। ১৮৫০ সালেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়। ইস্তাহারের 'ইতিহাস প্রতিফলিত করে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসের' কমিউনিস্ট ইস্তাহার সম্পর্কে এইরূপ মতামত সহ ইস্তাহার রচয়িতাদ্বয়ের অন্যতম ফেড্রারিখ এ্যাংগেলস ইস্তাহারের বিস্তৃতি –ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় লিখেন– " Thus the history of the Manifesto reflects the history of the modern working class movement; at present, it is doubtless the most wide spread, the most international production of all socialist literature, the common platform acknowledged by millions of working men from Siberia to California."

ইউরোপ হতে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ কর্মসূচি হিসাবে সমাদৃত এবং সমাজতান্ত্রিক সকল সাহিত্যের সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়া , সর্বাধিক আন্তর্জাতিক উৎপন্ন বস্তু বা সৃষ্টি– এই ইস্তাহারখানি কখনো তথাকথিত "জাতীয় মুক্তি" অর্জনে জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রীক রাজনৈতিক দলের জাতিগত স্বার্থের কর্মসূচির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হবে বা তদানুরূপ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এর বিকৃতি সাধন করা হবে বা অনুবাদ করার অজুহাতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমুলে ইস্তাহারের অংশ বিশেষ বা বাক্যাংশ বিশেষ বাদ দিয়ে বা অনুল্লেখ করে বা সুনির্দিষ্ট স্থানে সুনির্দিষ্ট শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার না করে, ভিন্নার্থ প্রকাশক শব্দ বা শব্দরাজি যুক্ত করা বা সাধারণভাবে প্রায় কাছাকাছি অর্থ প্রকাশক হলেও বিষয়বস্তুর সাথে যথার্থ নয় বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দরুন একইরূপ অর্থ প্রকাশ করে না বা পূর্বাপর বক্তব্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বা যথার্থ অর্থ বুঝানোর বিপরীতে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতে পারে বা যথার্থভাবে যথার্থ অর্থ প্রকাশে সহায়ক না হয়ে ভ্রান্তি ও ভ্রম সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে , এমন শব্দ বা শব্দরাজি বা বাক্য সংযুক্ত বা প্রতিস্থাপিত হবে, এমনটা কল্পনা করাও একটু দু:সাধ্য নয় কি?

তাছাড়া, ইস্তাহারে বিবৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহিত কমিউনিস্টদের সম্পর্ক বিষয়ক বক্তব্য, নীতিগতভাবে সঠিক হলেও কালিক পরিক্রমায় এসকল বিষয়ের কিছু মন্তব্য অপ্রয়োজনীয় হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েও উল্লেখিত ভূমিকায় এ্যাংগেলস লিখেন– " But then, the Manifesto has become a historical document which have no longer any right to alter."

অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্যতা ও গুরত্বের জন্যই এমন একটি আন্তর্জাতিক সৃষ্টির কোন প্রকার রদ-বদল করার অধিকার-এখতিয়ার ছিল না খোদ এ্যাংগেলসেরই। কাজেই, এ্যাংগেলসের লিখিত উল্লেখিত ভূমিকাও যেহেতু ইস্তাহারের অংশ হিসাবে গণ্য সেহেতু কমিউনিস্ট ইস্তাহার মুলেই ইস্তাহারের রদ-বদল ঘটানোর অধিকার নাই কারোই, তা তিনি অনুবাদকই হউন বা পন্ডিতবর্গীয় কেউ। এমনকি, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, ইস্তাহারে বর্ণিত কোনো বিশেষ বক্তব্য সঠিক নয়, বা ইস্তাহারে বিবৃত কোন বক্তব্য বা মতামত বা শব্দ বিশেষ যদি কখনো ভুল বলেও প্রমাণিত হয়, তবে সে সম্পর্কে

উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সহ সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশের সুযোগ ও অধিকার থাকতে পারে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগকারী যে কারো; কিন্তু, অনুরূপ ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত ও শনাক্তকারীও ঐতিহাসিক কারণেই মার্কস-এ্যাংগেলস'র রচিত ইস্তাহারে তা প্রতিস্থাপনের অধিকারী হতে পারেন না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় ব্লকের পতন-বিপর্যয়, দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ভাগ-বিভাজন ও বিভক্তি এবং দুনিয়াময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবক্ষয় ইত্যকার বিষয়াদির কারণ অনুসন্ধানে আমরা যখন নিয়োজিত হই, তখনো আমরা ছিলাম " মার্কসবাদী-লেনিনবাদী"। যদিও আমরা সংখ্যায় কয়েকজন, তবু আমরা ঠিক করেছিলাম যে, আমরা লেনিনীয় সাংগঠনিক নীতিমালা দ্বারাই পরিচালিত হবো। সুতরাং, লেনিন ছিল আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও পূঁজনীয় আদর্শিক নেতা। কাজেই, লেনিন বা লেনিনবাদকে খারিজ করা বা লেনিনকে অভিযুক্ত করা বা লেনিনদেরকে গালাগাল দেওয়া আমাদের যেমন লক্ষ্য ছিল না, তেমন তা -সাংগঠনিক এখতিয়ারভুক্তও ছিল না।

কিন্তু, অনুসন্ধানের বিষয় যেহেতু ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন, সেহেতু অনুসন্ধানের একটা পর্যায়ে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে - কমিউনিস্ট নীতি'র স্বার্থেই অমন স্বার্থপরতার জঘন্য লেনিনীয় মতাদর্শ ও সাংগঠনিক নিয়ম-নীতি,আমাদের নিকট পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে । তারই ফলশ্রুতিতে- 'লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো আই.এম.এফ দ্যা ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড....'সহ মোট ৫টি বই, আমরা ২০১০ সালে প্রকাশ করি।

ঐ সকল বই পুস্তকে আমরা প্রগতি প্রকাশন,মস্কো থেকে বাংলায় অনুদিত ও প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারখানি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে ব্যবহার করেছি এবং বহু বিষয়ে ঐ ইস্তাহার হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি। কিন্তু, তখনো জানতাম না যে, আমাদের ব্যবহারকৃত উদ্ধৃতিও মার্কস-এ্যাংগেলস'র লিখিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের হুবুহু অনুবাদ নয়। অতীতের বোকামির কারণেই অর্থাৎ লেনিনবাদের আছর হতে হয়তো সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারিনি বলেই আমাদের মনে হয়নি যে, যেখানে ইস্তাহারের বিষয়বস্তুকেই লেনিনবাদীরা অস্বীকার ও অকার্যকর করেছে সেখানে কমিউনিস্ট ইস্তাহার সহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের কেবল বিকৃতিই নয়, এমনকি কমিউনিস্ট ইস্তাহার অনুবাদেও জাল-জালিয়াতি বা ছল-চাতুরী ও কারসাজি করতে পারে লেনিনবাদীরা ।

তবে,দলীয় নেতাদের উপস্থাপনায় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবেচনায় রেখে জীবনে প্রথমবার যখন ইস্তাহারখানি পড়েছি, তখন থেকে যখন আমি নিজেও দলীয় বিভিন্ন ফোরামে ইস্তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি, তখনো ভুলক্রমেও মনে প্রশ্ন জাগেনি যে প্রগতি প্রকাশন কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত ইস্তাহারে কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে। অবশ্য, অনুসন্ধানী পর্যালোচনার সময়ে কিছু কিছু বিষয় মনে সংশয় ও সন্দেহ জেগেছে। যেমন-অনুদিত ইস্তাহারে বিবৃত- " পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।" এমন কিছু বিষয়। কিন্তু, সংশয় ভজনের চেষ্টা না করেই, নিজেই ধরে নিতাম চালাক-চতুর রাজনীতিকরা যেমন যখন-তখন " স্লিপ অব ট্যাংক" বলে থাকে এবং সেই মওকায় নিজের বক্তব্য বিষয়ে সাধারণ্যে পাল্টি খেতে অভ্যস্ত তেমন মস্কোর লেনিনবাদীরাও হয়তো " স্লিপ অব পেন" হিসাবে এমন ধরনের বাক্য লিখেছে। কিন্তু, তখনো মনে হয়নি-মূল্য, অত:পর, উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি সৃষ্টিতে ব্যক্তির অংশ গ্রহণ ও ভূমিকা আছে বলেই মার্কস পুঁজি গ্রন্থে

এ বিষয়ে যথার্থভাবে যা লিখেছেন এখানেও তাই লিখেছিলেন; এবং কেবলমাত্র জাতি বা সমাজের একচ্ছত্র প্রতিনিধি- চরম ও পরম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এবং সামরিক শৃংখলার দলীয় কেন্দ্রীয় নেতার দাবীদার লেনিনের- সমাজের নামে রাষ্ট্রীক একক ক্ষমতা ভোগ-দখল বা দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের সুযোগ সৃষ্টিতে দলে বা সমাজে ব্যক্তি নয়, নেতার-একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা -অবস্থা ও অবস্থানকে জায়েজ করার জন্য ইস্তাহার খানিতেও পুঁজি গঠন বিষয়ে ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করে কেবলই সমাজের ভূমিকা বুঝাতে মস্কোর লেনিনবাদীরা ইস্তাহার অনুবাদেও এমন অপতৎপরতা চালাবেন।

অথচ, মার্কসদের লেখা ইস্তাহারের ইংরেজী অনুবাদে লিখা আছে-" Capital is therefore not only personal; it is a social power." অসৎ উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি না থাকলে এই বাক্যের অনুবাদে মস্কোর পন্ডিত প্রবরগণ- "only" শব্দটি বাদ দিতে পারতেন, না কি তারা এই ছোট্ট অথচ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপুর্ণ শব্দটির বংগানুবাদ জানেন না ?

রুশ, জার্মান ভাষা, আমি জানি না ছাত্র ও যুবা বয়সে জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিকবোধে এবং লেনিনীয় 'জাতীয় মুক্তি'র রাজনীতির দলীয় মোড়ল-মাতুব্বর হওয়ায় ও থাকার কারণে ভাষা বিশেষের প্রতি অন্ধপ্রেম, মুর্খতা ও মূঢ়তায় ইংরেজীতে,এখনো ভাল দখল নাই আমার। তাই, বাংলায় প্রকাশিত বৈ কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে হবে এবং পড়া উচিৎ ছিল তাও মনে আসেনি বলে আমি দু:খিত।

অভিশপ্ত জাতীয়তার আচ্ছন্নতায় ইংরেজী ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণাবোধে ছাত্রাবস্থায় যেমন খুব একটা ইংরেজী পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি, তেমন কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়ে অনুসন্ধানকালেও ইংরেজী পাঠের কষ্ট ও বিড়ম্বনায় কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারখানির ইংরেজী ভার্ষাণ না পড়াটা কেবল ভোগান্তি হতে নিস্কৃতি লাভের প্রবণতাই নয়, চরম বোকামিও বটে আমার।

আমাদের প্রকাশিত বইগুলো প্রকাশিত হওয়াকালীন আমার কয়েক বন্ধু আমার নিকট হতে কমিউনিস্ট ইস্তাহার বইখানি নিতে চাইলে আমার নিকট যে কপিগুলো ছিল তা হাত ছাড়া না করার জন্যই বইয়ের বাজারে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশি করেও না পেয়ে ইন্ডিয়া থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কয়েক কপি আনিয়ে নেই। কিন্তু, কি সর্বনাশ! মস্কো ও কলকাতার অনুবাদে মিল নাই । তাই বাধ্য হয়ে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার তালাশ ও পাঠ করার পূর্বেও জানতাম না যে, কলকাতার লেনিনবাদীরা জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণায় মস্কোর লেনিনবাদীদের তুলনায় এমনকি অনুবাদ ইত্যাদিতেও আরেককাঠি সরেস।

কাজেই, ন্যাড়া দ্বিতীয়বার বেলতলায় না গেলেও আমরা বাধ্য হলাম আবারো লেনিনবাদীদের তদ্বিষয়ক কারসাজি অনুসন্ধানে।

উল্লেখ্য- ইতো:পূর্বে, আমাদের অনুসন্ধানী তৎপরতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, লেনিনবাদীরা খোদ কমিউনিস্ট ইস্তাহার বিরোধী কার্যক্রম করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'খাঁটি মার্কসবাদী' দাবী করে বিজ্ঞানী মার্কসকে দেবাদিদেব এবং " খাঁটি রুশী মার্কসবাদী" লেনিনকে দেবতা মার্কসের সেরা খলিফা সাব্যস্তে ও স্বীকৃতিতে বিরল প্রতিভার মহামানব প্রতিপন্নে তারই পরম্পরায় ষ্ট্যালিন-মাও, হোচিমিন-কিম প্রমুখদেরকে 'কাকা', 'চিরঞ্জীত বীর', 'মহান শিক্ষক', 'মহান নেতা', 'বিরল প্রতিভার

আজন্ম মেধাবী', ইত্যকার নানান প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের সুবিধাভোগী-স্বার্থন্বেষী, চালাক-চতুর ও পরজীবী বদমাইশদের বদমাইশী গুণাবলীর শিখন্ডী বানানোর তাবৎ বিশেষণে বিভূষিত করে,লেনিনবাদী রাজনীতির অতীব গুরুত্বপুর্ণ মোড়ল বানানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েও তারা নিজেদেরক কমিউনিস্ট দাবী করার ক্রমাগত অপকৌশলে লিপ্ত এবং তা প্রমাণিত । অনুরূপ অনুসন্ধানী কর্ম প্রক্রিয়ায় আমরা লক্ষ্য করেছি - লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার বিরোধী ও বৈরী কার্যক্রমতো করেছেই, এখন দেখছি তাদের কুমতলব হাসিলে তারা ইস্তাহার ভাষান্তরকরণেও কারসাজি করেছে।

স্বর্গে বিদ্রোহ ঘটালেন কোপার্নিকাস তার প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা দিয়ে। ব্রুনো, বিভেৎস, গ্যালিলিও, ডারউইন হয়ে এখনকার হকিন্স,তাদের সকলের অনুসন্ধান-নিরীক্ষা ও পরীক্ষণ দ্বারা তারা নিশ্চিত করেছেন যে, অতীতে যেমন বলা হয়েছিল যে, প্রমাণ অযোগ্য কোন বিশেষ ক্ষমতাবান বা স্বীয় অস্থিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের উর্দ্ধে অবস্থিত বিশেষ ক্ষমতাধর কেউ ধরিত্রী ও প্রাণী সৃষ্টি করেছে , তা- সঠিক নয়। অর্থাৎ একটি মাত্র পৃথিবীর ১বিলিয়ন ১০০ জন স্রষ্টা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ,জেহোভা, ইলোহিম,আমোন, আহুরা মাজদা বা মিকুটু এমন কেউ জগত ও জীব সৃষ্টি করেনি বা জগত ও জীবের দেখাশুনা করে না। তাই, ধরিত্রী ও প্রাণীকুলের উল্লেখিত সংখ্যক স্রষ্টা ও সংরক্ষকের দাবী করা হলেও কার্যত ও প্রকৃতপক্ষে কোপার্নিকাসদের যুগান্তকারী আবিস্কারের পুর্ববর্তীকালে চালুকৃত এতদসংক্রান্ত সকল বক্তব্য অসত্য-বানোয়াটি, কাল্পনিক ও মিথ্যা এবং মিথ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে নিশ্চিত হয়।

পৃথিবী যে স্থির নয়, এবং ঘুরছে প্রতিনিয়ত মহাশুন্যে তাতো টিভি দর্শকমাত্র অবলোকন করছে, এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবদানে জীবন ধারনের উপকরণের অভাবে নয়, বরং অতিরিক্ত প্রাচুর্যের প্রবাহে-প্রভাবে এখনো মারা যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে বহুলাংশে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে ক্ষেত্রবিশেষ নিরক্ষর মানুষও, ষ্টেমসেল-ক্লোনিং এর উদ্ভাবন, কৃত্রিম প্রাণ তৈরী করা সহ 'জিন চিত্র' এখন আবিস্কৃত, মৃত্যুর কয়েক বছর পরও মৃতদেহের কোষ বিশেষ হতে নতুন জীবের সৃষ্টি তত্ত্বও মানবজাতির করায়ত্ত; এন্টার্টিকা ও মহাকাশে বসতি স্থাপন করেছে মানুষ; সুনামি সমেত আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি পুবাহ্নেই জানছে ,এমনকি পৃথিবীরতো বটেই সূর্যের বয়স যেমন মানুষের জানা তেমন জানে তাদের আয়ুস্কালও, সূর্যের আলো,বাতাস বা অনুরূপ ননলিভিং এলিমেন্ট, মানুষ তৈরী না করলেও ঐ এলিমেন্টগুলির বহুমুখিন ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ব্যবহারোপযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সমেত মানুষ যা- কিছু ব্যবহার ও ভোগ করে তা উৎপাদিত বা সংগৃহীত হয় মানুষের শ্রম দ্বারা এবং এটি দৃশ্যমান। অথচ, নানান মিথ অনুযায়ী মানুষ নয়, বিশেষ বিশেষ অদৃশ্যমান শক্তি বিশেষই নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের জীবন-মৃত্যু ও ভোগ-ব্যবহারের মাত্রা-পরিমাণ, যা সম্পূর্ণত অসত্য-বানোয়াটি এবং মিথ্যা বলে প্রমাণিত। তবু, প্রমাণিত সত্য নয়, ধরিত্রীর অধিকাংশ মানুষ এখনো বিশ্বাস করে ঐ সকল 'মিথ'! এটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকল আশ্চর্যের মধ্যে এক নম্বর স্থান দখলকারী বিস্মকর বিষয়।

ইহলৌকিকতা-গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ইত্যকার- 'মিথ' বিরোধী নানান রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি, দিচ্ছেন যারা হর-হামেশা তাদেরও নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ট অংশ, হয়তো বদমতলবে অথবা অজ্ঞতাবশত- মিথ বিশ্বাসী ও মিথ্যাচারে অভ্যস্ত এবং বাদ যাচ্ছে না খোদ চিকিৎসক-বিজ্ঞানীরাও। নাট্যকার-গীতিকার,সাহিত্যিক-সংবাদ কর্মী এবং শিক্ষা কর্মীও বাদ যায় না, হয়তো অজ্ঞতায়, নয়তো স্বার্থান্ধতায় ও মুঢ়তায়। নানান জাতের সমাজ দরদী ও কর্তাদের এমন অপকর্মের বাতাবরণে -বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও বৈজ্ঞানিকতা বা বিজ্ঞান মনস্কতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হচ্ছে দারুনভাবে। তাইতো, মার্কস-এ্যাংগেলসের রচিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার অনুবাদে লেনিনবাদীদের কারসাজির ঘটনা বিবেচনায় নিতে এবং বুঝতে আমরাও দীর্ঘ সময় নিয়েছি ।

সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের নিমিত্তেই পুঁজিবাদীরা জালিয়াতি-প্রতারণা ও কারসাজি ইত্যকার দুস্কর্ম সংঘটিত করে থাকে, এবং জাল-জালিয়াতিতে সাফল্য লাভকারী যথারীতি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অত:পর, মস্কো ও কলকাতা হতে বাংলায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুবাদে- সি.পি.এস.ইউ এবং সি.পি.আই. (এম) এর কারসাজির হেতুবাদ ও অনুরূপ কারসাজি হতে সুবিধাভোগীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়েও আমরা অনুন্ধান করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুবিধাভোগীদের মতামত বা তাদের প্রণীত, আইন-সংবিধান ইত্যাদি যেমন পর্যালোচনা করেছি তেমন অতি অবশ্যই এ সকল বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসের সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিরও দ্বারস্ত হয়েছি।
তাছাড়া, নিপীড়িত বুর্জোয়ার দৃঢ় সমর্থক লেনিন ও জাতীয় পুঁজি'র রক্ষক দেশপ্রেমিক মাওসেতুঙ গয়রহরা, জাতি ও জাতীয় মুক্তি, শ্রেণী ও শ্রেণী মুক্তি, পুঁজি ও পুঁজিবাদ, উপনিবেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র - সাম্যবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টি,এবং পুঁজিবাদী সমাজের পতন ও সমাজতন্ত্রের উত্থান ও হেতুবাদ ইত্যকার বিষয়াদি সম্পর্কে নিজেরা যা যা বলেছেন তা মার্কস-এ্যাংগেলস না বললেও লেনিন-ষ্ট্যালিন, মাও-কিমরা নিজেদের সেসকল বক্তব্য বিবরণকে 'মার্কসবাদ' এর সংযোজনী স্বরূপ লেনিনবাদ বা মাও চিন্তাধারা ইত্যকার নানান 'ইজম' বলে চালিয়েছেন; আবার এ সকল বিষয়াদি নিয়ে মার্কস-এ্যাংগেলস যা যা বলেছে তা প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও কার্যত সেই সকল বক্তব্যকে অকার্যকর ও গুরুত্বহীন করে বরং তদ্বিষয়গুলি সম্পর্কে মার্কস-এ্যাংগেলস যা যা কখনো বলেননি-তাও বানোয়াটিমূলে মার্কসদের নামে জাহির করেছেন। তাই তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থকরণেই শ্রমিক শ্রেণীসহ মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও প্রসারের দুরভিসন্ধিতে কমিউনিস্ট ইস্তাহার অনুবাদেও সি.পি.এস.ইউ এবং সি.পি.আই (এম) কারসাজি করেছে।
এ জাতীয় দুস্কর্ম সংঘটন করে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ভয়ানক ক্ষয়-ক্ষতি করে বিপদাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী ও মরণাপন্ন পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে সহায়তা করে নানান ধরণের সুযোগ-সুবিধা হাসিল করেছে খোদ লেনিন সহ লেনিনবাদী মাও-হোচি, কিম-হোক্সা, টিটু-সচেস্কু,চে-ফিদেল গয়রহ।
পুস্তকের শুরু হতে একটা বিরাট অংশ জুড়ে লেনিনবাদীদের কারসাজির উদ্দেশ্য-প্রেক্ষিত ও হেতুবাদ আলোচনায় মার্কস-এংগেলসদের রচনাবলীর সহিত লেনিন-মাও গয়রহদের রচনা-নিবন্ধ বা গৃহীত কার্যাদি বা তদ্রুপ মতামতের তুলনামুলক পর্যালোচনা যেমন করতে হয়েছে, তেমন অস্থায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হালনাগাদী অবস্থা-ব্যবস্থা সমেত কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়েও আলোকপাত করা সহ কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কিঞ্চিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।
তাই,পুস্তকের শেষাংশেই মুলত, কমিউনিস্ট ইস্তাহার অনুবাদে- লেনিনবাদীদের কারসাজির বিষয়গুলো চিহ্নিত ও শনাক্ত করে তার প্রেক্ষিত ইত্যাদিও কম-বেশ আলোচনা করেছি আমরা । এই অনুসন্ধানী কাজে আমরা যত্নবান থাকার চেষ্টা করেছি। তবে, যথার্থ শব্দের অভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হয়তো সাবেকী শব্দ যেমন ব্যবহার করেছি, তেমন শব্দ বিভ্রাট হতে রেহাই পায়নি। তাছাড়া- কথিত সন্মানীয় বা ক্ষমতাবান বা এজাতীয় কাউকে বুঝাতে " তাঁর" বা " যাঁর" এবং অর্ডিনারী বা অসন্মানীয় বা তথাকথিত নীচু মানের কাউকে চিহ্নিতকরণে "তার " বা " যার" , ব্যবহারের প্রথাগত রীতি-নিয়মের শ্রেণী বৈরীতা ও শ্রেণী কর্তৃত্বের অর্থাৎ অধিপতিদের আধিপত্যের অবসানে- সর্বজনের ক্ষেত্রেই "তার" বা " যার" শব্দ ব্যবহার করেছি আমরা । তবু, পুরনো স্বভাবদোষে বা ভুলে যদি কোথাও "তাঁর" বা " যাঁর" বা "যাহার" বা " যাহার" বা "যাঁদের" বা "তাদের" ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে- ঁ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু চিহ্নটি মোছনীয় ও বর্জনীয়।
তবু, অনুবাদ বা শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস বা ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও মার্কসদের মতামতের সাথে ইস্তাহার অনুবাদে কারসাজিওয়ালাদের বিকৃত ও বানোয়াটি মতামতের তুলনামুলক পর্যালোচনা

সহ কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে না, এমনটা দাবী করতে চাই না। কাজেই, সাম্য প্রত্যাশী ব্যক্তি মাত্রই, আমাদের বক্তব্য - মতামতের ভ্রান্তি-খুঁত বা ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি চিহ্নিতকরণে আমন্ত্রিত। সাম্যবাদী আন্দোলনের পুনর্গঠন ও সাফল্যের স্বার্থেই আশু করণীয় বিবেচনায় কমিউনিস্ট দায়িত্বের অংশ হিসাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহার সহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিখুঁতভাবে উপস্থাপনে - আমন্ত্রিতগণ স্বেচ্ছায় ও স্বতো:প্রণোদিতভাবে আমন্ত্রণ কবুল করলে - শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মী হিসাবে আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবো; সর্বোপরি, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন, প্রতিযোগিতা ও অতি উৎপাদনের মহামারির মরণসূত্রে জন্ম নেওয়া চিরকালীন অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা ও অশান্তির বয়োবৃদ্ধ -অতীত আশ্রিত ও মরণাপন্ন পুঁজিবাদী সমাজের অগুণতি সমস্যা-চরম সংকট ও দু:সহনীয় যন্ত্রণা হতে মুক্তি বিধানকারী দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সহ মুক্তি প্রত্যাশী প্রত্যেকে তুলনামূলক নির্ভূল ও নিখুঁত মতামত প্রাপ্তির সুযোগ পাবে।

ফলে- কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে; সকল জাতিগত সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শীতা বর্জিত আন্তর্জাতিকতাবাদের কমিউনিস্ট আন্দোলন কার্যকরভাবে দুনিয়াব্যাপী বিস্তার ও প্রসার লাভ করবে; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত পুঁজির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতিতে কমবেশ সকল রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন-বিঘ্ন করে মূলত রাষ্ট্রের অস্তিম দশা নিশ্চিতকারী বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণীর সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ইত্যকার বৈশ্বিক সিন্ডিকেট - সংস্থা এবং এসকল সংস্থার সদস্য-সমর্থক সকল প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ-বিনাশ ও ব্যক্তিমালিকানার অবসানান্তে সাধারণ বা সামাজিক মালিকানার শ্রেণী হীন সমাজের ভিত্তি- সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগি ও উপযুক্ত এক বৈশ্বিক জনসমিতি প্রতিষ্ঠার অগ্রণী - দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি, যথার্থভাবেই সমগ্র দুনিয়ায় কার্যকর ও সংগঠিত হবে। তাতে- শ্রমিক শ্রেণী সহ সমগ্র মানবজাতি সকল প্রকার পরজীবীতা মুক্ত তথা শোষণ-পীড়ন, দমন-দলন, অনাচার-অত্যাচার, বৈরীতা-বৈষম্য, খুন-সন্ত্রাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অনিশ্চয়তা-অশান্তি হতে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে ।

যদিচ, এটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, তবু -২০০৮ সাল হতে কেন্দ্রীভূত পুঁজি ভয়ানক মজুত সমস্যায় আক্রান্ত হয়েও সমগ্র দুনিয়ায় হাজারো সংকট-সমস্যার জন্ম দিয়ে অসংখ্য মানুষকে অসংখ্য ও অভাবনীয় সংকট-দুশ্চিন্তায় নিপতিত করে বহু মানুষের জীবনহানি করে যাচ্ছে। অথচ, পুঁজিবাদকে গুড বাই জানানোর এমন মোক্ষ সময় খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করলেও কমিউনিস্ট ইস্তাহার তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান নির্ভর ও ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি তথা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি নাই বলেই সমাধিস্ত ও সমাহিত করা যাচ্ছে না পুঁজিবাদী সমাজ সমেত পুঁজিপতি শ্রেণীকে।

ইতিহাসের এমন সন্ধিক্ষণে- দুনিয়ায় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি অর্জন-সাধনে মার্কসদের রচিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার ভিত্তিক একটি কমিউনিস্ট পার্টি বিকল্পহীন শর্ত বিধায় লেনিনবাদীদের অনুদিত ও বাজারে বিদ্যমান ভুয়া-জাল ও বিকৃত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিকৃতি ও জাল-জালিয়াতি চিহ্নিত-শনাক্ত ও দুরীকরণ যেমন অপরিহার্য তেমন ভুয়া কমিউনিস্ট লেনিনবাদী প্রতারক-জুচ্চোরদের মুখোশ উন্মোচন ও অবিকৃত কমিউনিস্ট ইস্তাহার উপস্থাপন অতীব জরুরী ও আবশ্যক হেতু এই বইটি রচিত হল।

পুনশ্চ:- বিশ্ব দখলদার পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মার্কস পুঁজি গ্রন্থে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের ঐতিহাসিক চাল-চিত্র সমেত পুঁজি তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাতকারী পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি- ব্যক্তিগত মালিকানা; ব্যক্তি মালিকানার গতি-প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা-বিনাশ ও ধ্বংস অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর চরিত্র-বাধ্যবাধকতা, সংকট-সমস্যা এবং পুঁজিবাদের

স্ববিরোধীতা ও বৈরীতামূলক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন; পুঁজিবাদী সমাজের পতন ও পতনের কারণ ও পতনের শুরু বা পতনের ঐতিহাসিক কাল শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ সমেত পুঁজিবাদী সমাজের মরণসূত্র নির্দিষ্টকরণ; বৃদ্ধ-জরাজীর্ণ পুঁজিবাদী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি – সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যোগ্য-উপযুক্ত একমাত্র শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণী; এবং শ্রম ও ঘনীভূত শ্রমের মুল্য রূপ -পণ্য সম্পর্কেও কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বক্তব্যই যথার্থভাবে সমর্থিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে পুঁজিতে।

কিন্তু, পুন:পুন অতি উৎপাদন সংকটে ব্যক্তিমালিকানা বিকাশের অক্ষমতায় নৈরাজ্যিক উৎপাদনের স্থলে পরিকল্পিত উৎপাদনের উপযোগি সামাজিক মালিকানার উপযুক্ত ভিত্তি ও শর্ত তৈরী করে পতনসীমায় উপনীত পুঁজিবাদী সমাজ সংরক্ষায় যেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ঘটানো প্রয়োজন তেমন বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেও নানান দেশের নানান বৈশিষ্ট ইত্যকার ছুতায় দুনিয়ার দেশে দেশে নানান ধরণের সমাজ তথা প্রাক পুঁজিবাদী, আধা বা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ ইত্যকার বানোয়াটি তথ্য-তত্ত্ব বিনির্মাণ করে কেবল মাত্র একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব নয়, বরং দেশে দেশে নানান ধরনের পৃথক-পৃথক আর্থ-সামাজিক অবস্থার কল্পিত চিত্রায়ন করে ঐ সকল নানান সমাজের বিপরীতে নানান ধরণের নানান বিপ্লব সংঘটনের অজুহাতে কার্যত দেশ বা রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা আবশ্যক ছিল পতন সীমায় উপনীত পুঁজিবাদের। অনুরূপ আবশ্যকতায় বুর্জোয়া স্বার্থের বর্ণচোরা পাহারাদার লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মতোই **মার্কসের " পুঁজি"র অনুবাদেও যথারীতি জাল-জালিয়াতি করতে কসুর করেনি।**

প্রগতি প্রকাশন হতে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদের পুঁজির ১ম খন্ড, ১ম ভাগ, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম বাক্য এই: " যে সমস্ত সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাধান্য বর্তমান, সেখানকার ধনসম্ভার ' পণ্যের এক বিপুল সমারোহরূপে দেখা দেয়'* আর এক একটি পণ্য এ ধনসম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসাবে দেখা দেয়।"

অর্থাৎ কেবল লেনিন-মাওরা নয়, স্বয়ং মার্কস পুঁজি গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, দুনিয়ায় তখনো নানান সমাজ বিদ্যমান; তন্মধ্যে যে সমস্ত সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করেছে সেখানেই ধন সম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসাবে দেখা দিয়েছে "পণ্য"। উল্লেখিত বাক্য দ্বারা এরূপও বুঝায় যে, যে সমস্ত সমাজে তখনো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করেনি সেখানে অর্থাৎ দুনিয়ায় বিদ্যমান ঐ সকল পিছিয়ে থাকা সমাজে ধন সম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসাবে- "পণ্য" আবির্ভূত হয়নি। কাজেই, ঐ সমস্ত সমাজে তথা দুনিয়ার যে সমস্ত সমাজে তখনো পণ্য -ধনসম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসাবে গণ্য হয়নি, ঐ সকল সমাজের কমিউনিস্টদের করণীয় হচ্ছে পুঁজিবাদী প্রাধান্যের প্রতিবন্ধক সমাজকে পণ্য উৎপাদনকারী সমাজে রূপান্তির করা। সুতরাং, উপরোদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ীই -নয়া গণতন্ত্র বা জাতীয় গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র ইত্যকার বিপ্লব সমূহের তত্ত্ব নির্মাতা- লেনিন-মাওরা পুঁজি গ্রন্থের অনুসারী।

তাছাড়া, দাস-সামন্ত সমাজের সংরক্ষক-প্রবক্তাদের কারো কারো বক্তব্য অনুযায়ী -মানব জাতির প্রথম মহান শিক্ষকের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের মহান শিক্ষকগণ যথারীতি অভিশপ্ত মানব জাতিকে চিরন্তন সত্য-ন্যায় ও কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য

আবশ্যকীয় নীতি-রীতি ও আচার-আচরণ ও করণীয় সমূহকে যথার্থ ও স্বার্থকভাবে সংযোজিত ও পরিপূর্ণ করেছেন। ঠিক সেই ধারণার অনুগামিতায় মার্কসকে সমাজতন্ত্রের গুরু সাজিয়ে তার অসম্পূর্ণ তত্ত্বকে সুসম্পূর্ণ ও পুর্ণাংগ করেছেন বটে লেনিন-মাও সমেত সমাজতন্ত্রের আরো আরো "মহান শিক্ষকগণ" -বলে দাবী করছেন লেনিনবাদীরা ।

অথচ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো হতে ১৯৫৪ সাল হতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজীতে প্রকাশিত মার্কসের- " CAPITAL" এর ১ম খন্ডের, ১ম ভাগ, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম বাক্য এই: " The wealth of those societies in which the captalist mode of production prevails, present itself as " an immense accumulation of commodities," its unit being a single commodity."

না, পৃথিবীর নানান অংশে নানান সমাজের বিদ্যমানতার কথা যেমন উপরোক্ত বাক্যে বিবৃত নাই, তেমন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাধান্যে-ই ধনসম্ভারের প্রাধমিক রূপ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে -'পণ্য', তাও বর্ণিত নয়। উপরন্ত, আদি, দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজ- এভাবেই সমাজসমূহকে শনাক্ত ও চিহ্নিত করা হয়। কাজেই, মার্কস কেবলমাত্র ঐ সকল সমাজের মধ্যে পণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিবাদী সমাজের বিবরণ দিতেই পুঁজি গ্রন্থের উপরোক্ত প্রথম লাইনটি লিখেছেন। যা বাংলা অনুবাদে এই:"ঐ সমস্ত সমাজ গুলির মধ্যে যেটিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি বিরাজিত সেখানে "পণ্যের এক অতিকায় পুঞ্জিভবন" হিসাবে, সম্পদ নিজেকে উপস্থাপন করে, ইহার একক সত্তা হচ্ছে এক একটি পণ্য।"

অতীতের অপরাপর সমাজ হতে পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও তফাৎ শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণে মার্কস উদ্ধৃত প্রারম্ভিক বাক্য দিয়ে যথার্থভাবেই পুঁজি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাজেই, মানবজাতির ইতিহাসে চিহ্নিত সমাজগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদনকারী সমাজই যে, পুঁজিবাদী সমাজ- তা আবারো নিশ্চিত করে পুঁজি'র ইংরেজী সংস্করণের ১ম খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় মার্কস লিখেছেন- " Every product of lobour is, an all states of society , a use-value; but it is only at a definite historical epoch in a society's development that such a production becomes a comodity," কিন্তু, এই বাক্যের বাঙ্গালা অনুবাদেও যথারীতি লেনিনবাদীরা কারসাজি করে মার্কসের বক্তব্যের বিকৃতি সাধন করেছে।

অত:পর,কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার এবং পুঁজি গ্রন্থের ভাষান্তরেও লেনিনবাদীদের এত্তোসব কারসাজিমূলক কীর্তি-কলাপ কি কমিউনিস্ট মার্কসের রচনার তথাকথিত অপূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দান বা তাতে নব সংযোজন, না কি- বর্ণচোরাদের বদমতলব হাসিলের দুরভিসন্ধিতে সংঘটিত জালিয়াতি- প্রতারণা এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিকৃতি ও দুষণ?

শাহ্ আলম।

তারিখ-২৫ জুন, ২০১১, ঢাকা ।

লেনিনবাদীরা
[সি পি এস ইউ-সি পি আই (এম)]
কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার
অনুবাদেও কারসাজি করেছে

যে কোন বিষয় ভাষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাক্য বিন্যাস করতেই পারেন; যেমন কমিউনিষ্ট পার্টির্র ইস্তাহারের একদম শুরুর ইংরেজী বাক্য : " A spectre is hunting Europe- the spectre of communism." এর বংগানুবাদ হিসাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত ইস্তাহারে বিবৃত আছে: " ইউরোপকে আতংকগ্রস্ত করেছে একটা ভূত- কমিউনিজমের ভূত।" আর কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইস্তাহারটিতে বর্ণিত এই: "ইউরোপে ভূত হানা দিচ্ছে- কমিউনিজমের ভূত।" কিন্তু, কোনো অনুবাদকের এমন কোন ক্ষমতা-এখতিয়ার থাকতে পারে না, যাতে অনুদিত বিষয়ের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়, বা মুল ভাষার পুস্তকের বক্তব্যের মুল প্রতিপাদ্য অটুট-অক্ষুন্ন না থাকে বা তদ্বিষয়ে ভ্রান্তি -বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় বা মুল ভাষায় যা যা বর্ণিত আছে তা তা বর্ণনা না করে অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া, এমনকি ভাষান্তর কালে মুল ভাষায় বিদ্যমান- ' only', 'a' or ' alone' শব্দগুলির মতো ছোট্ট ছোট্ট এক একটি শব্দকেও কর্তন বা বাদ দেওয়ার অধিকার অনুবাদকের নাই বা থাকতে পারে না। অথবা, একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের অনুদিত বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন মর্মার্থ প্রকাশ করবে তাওতো হতে পারে না।

কিন্তু,যদি এমনটা হয়, অর্থাৎ একই বিষয়ে দু'জন অনুবাদকের বক্তব্য দু'রকম হয়, তখনতো বুঝতে হবে- হয়তো একজনের অনুবাদ সঠিক, আরেকজনের অনুবাদ ভুল, নয়তো দু'জনই ভুলভাবে অনুবাদ করেছেন। অথবা, ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও অনেক সময় ভুল-বাল অনুবাদের কারণ হতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উত্থিত হবে যে, যিনি বা যারা অনুবাদ করবেন তিনি বা তারা অতি অবশ্যই দু'ভাষাতেই সমানভাবে দক্ষ বা বিজ্ঞ না হলেও অনুদিত বিষয়ের উভয় ভাষা সম্পর্কেই কেবল সাধারণভাবে অভিজ্ঞই নয়, কার্যত পারদর্শী হওয়াটাই বাঞ্চনীয়। অনুবাদক নয়, অথচ, নানান ভাষা জানেন,বুঝেন তারাও যতোটামাত্রায় ভাষান্তরিত বিষয় বুঝবেন, ততোটাও যদি অনুবাদক না বুঝেন তবেতো অমন অনুবাদকের অনুবাদ কর্ম না করাই কেবল শ্রেয় নয়, বরং তারা অনুবাদ পেশার যোগ্য ও উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য। তৎসত্ত্বেও জটিল-বিদঘুটে বিষয়াদি বিষয়ে হয়তো টুক-টাক ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে, যাকে সাধারণভাবে সদ্বিশ্বাসজাত বা সারল্যজনিত ভুল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এতদসত্ত্বেও কিন্তু ভুল অনুবাদকারী ভুল অনুবাদের দায়ে অপরাধী বা দন্ডনীয় দোষী হিসাবে গণ্য না হলেও তদার্থে কোন রকম দায় বহন করবে না বা দায়-দায়িত্ব মুক্ত হতে পারেন না। নিদেনপক্ষে তিনি যে, স্বীয় কর্ম বিষয়ে যথার্থ দায়-দায়িত্ববান ব্যক্তি নন বা অনুদিত বিষয়ের ভাষাদ্বয় সর্ম্পকে সম্যক ওয়াকিবহাল নন, তাওতো নিশ্চিত হবে, এবং

পেশাদার অনুবাদক হলে অনুরূপ ভুল অনুবাদের দায়ে তিনি বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অর্থাৎ পেশাগত ঝক্কি-জামেলা বা বিপত্তিতে পড়বেন। অন্যদিকে, পাঠকগণতো যথার্থ বক্তব্য হতে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনই।

কাজেই, অনভিজ্ঞ বা ভাষান্তর বিষয়ে বা ভাষান্তরকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকলে এবং মূল ও অনুদিত ভাষা অর্থাৎ উভয় ভাষা বিষয়ে যথার্থ ও পরিপক্ক জ্ঞান না থাকলে ভাষান্তরকরণের মতো কাজে হাত দেওয়া উচিত নয় কোনো সজ্জনের। ভাষান্তর বিষয়ে এমন নীতিমালা এমনকি, পেশাদার অনুবাদক নয়, যে কোন অনুবাদকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপরন্ত, অনুবাদের বিষয়টি যদি হয় মৌলিক বা বৈজ্ঞানিক বা অতীব গুরত্বপূর্ণ, তবেতো তাতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতির সুযোগ-অবকাশ নাই।

কারণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি চিহ্ন বেশ কম হলেও কাম্য ফলাফল নয়, বরং ঘটে যেতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর কোন দুর্ঘটনাও। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বিন্দু বা ডটও (.) গড়মিল হলে যথার্থ স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান হবে না বা প্রদত্ত চিত্র-সংবাদ ইত্যাদি উপযুক্ত ও যথাযথভাবে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হবে না । সেক্ষেত্রে, ঘটমান ভুল-ভ্রান্তি অসাবধানতাবশত, না কি সরল বিশ্বাসজাত তাও বিবেচ্য নয়। ক্ষয়-ক্ষতি, যা- হবার তা হবেই। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষান্তরকরণে নিছক সাহিত্যের মতো সাবধানতা নয়, বরং তদমর্মে উপযুক্ত -যোগ্য ব্যক্তিরও একদম অখন্ড ও নীবিড় অভিনিবেশ বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক এবং পুন:পুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুদিত বিষয়ের যথাযথ অনুবাদ নিশ্চিত করা বৈ সামান্যতম ব্যাত্যয় ঘটানোর অবকাশ-সুযোগ নাই।

অনুদিত বিষয়ের ভুল-ভ্রান্তি যাতে না থাকে বা তা যেন নিখুঁত ও যথাযথভাবে বা সঠিকভাবে হয়ে থাকে সেজন্য অনুবাদকের যেমন দায়বদ্ধতা আছে, তেমন দায়হীনতার সুযোগ নাই প্রকাশক বা তদার্থে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের। সেজন্য, অনুদিত বিষয়ের সঠিকতা ও যথার্থতা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরই এবং তদমর্মে সুনিশ্চিত হয়েই কেবলমাত্র ভাষান্তরকৃত বিষয় মুদ্রণ-প্রকাশ করাই প্রকাশক-কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব বৈ ভিন্ন কোন অজুহাত-অনুযোগ তদার্থে গ্রহণযোগ্য নয়।

অথবা, অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি যদি মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে, তবেতো তাও প্রকাশ বা প্রচারমাত্রই যেমন অনুবাদক, তেমন প্রকাশক-কর্তৃপক্ষের নজরে না আসার সুযোগ বা কারণ না থাকার কারণ নাই। কারণ, ছাপাখানার ভুত সমেত অনুরূপ ভুল-ত্রুটি প্রথম চোটেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও তাদেরই প্রাথমিক ও প্রধান দায়-দায়িত্ব। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, পাঠক-শ্রোতার মনে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি উৎপন্নে বা ভাষান্তরিত বিষয়টি ঠিক-ঠাক মতো যাতে পাঠক -শ্রোতা না বুঝে বরং অনুবাদক-প্রকাশক ও কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছামতো বুঝানোর অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, বা অনুবাদক-প্রকাশক ও কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন স্বার্থ হাসিলে বা তদানুরূপ বদমতলবে অনুদিত বিষয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে বা পরিকল্পিতভাবে ভুল ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, অথবা, অনুদিত বিষয়টি নির্ভূলভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত মর্মে মূল বিষয়ে পাঠক-শ্রোতাকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করার হীন উদ্দেশ্যজাত হয়, অথবা, অনুদিত বিষয়ের মূল লেখক বা লেখকগণকে ভিন্ন ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে স্বীয় অসদিচ্ছা পূরণের অসদাচরণজনিত কর্ম হয়, অথবা, অনুদিত বিষয় দ্বারা যারা উপকৃত হওয়ার কথা তাদেরকে অন্যায় ও অন্যায্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার বদখেয়ালে এবং অন্যকোন পক্ষকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বিশেষ সুযোগ-

সুবিধা দিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করার অসৎ উদ্দেশ্যজাত দুস্কর্ম হয়, অথবা, অনুদিত বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বক্তব্য যথাযথভাবে লাভ করার যথাযথ সুযোগ হতে পাঠক-শ্রোতাকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করার নিমিত্তে জেনে-বুঝে এবং ছল-চাতুরি ও দুরভিসন্ধিমূলে বা বানোয়াটিমূলে অনুদিত বিষয় উপস্থাপন-প্রকাশ ও প্রচার করা হয়, অথবা, স্বীয় দুস্কর্মকে সুকর্ম মর্মে উপস্থাপনে-ঠান্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পনামতো অনুদিত বিষয়ের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয় বা তদানুরূপ উদ্দেশ্য হাসিলে কোন বিষয় যা মূল বিষয়ে ছিল বা ছিল না তা ভাষান্তরিতকরণের প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে যোগ-বিয়োগ করা হয় তবে, তা- সন্দেহাতীতভাবে প্রতারণা-জালিয়াতি বলে গণ্য ও সাব্যস্ত হবে।

আবার, কোনো নীতি বা নীতিমালার অনুসারী-অনুগামী হিসাবে দাবী করে যদি কেউ সুকৌশলে ঘোষিত নীতি বা নীতিমালার বিপরীত ক্রিয়াদি সম্পন্ন-সম্পাদন করে, তবে তাও সন্দেহাতীতভাবে প্রতারণা-জালিয়াতি ইত্যকার দুস্কর্ম হিসাবে চিহ্নিত-শনাক্ত হয়। অথবা, যে রূপ নীতির পক্ষে বা স্বার্থে কোন কাজ করা হয়, অথচ, সেই অনুসৃত নীতিটি সাধারণ্যে জনপ্রিয় নয় বা তেমনটা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই সাধারণ্যে মিথ্যা-ভুয়া ও বানোয়াটি গাল-গল্প তৈরী করে কার্যত জনবিরোধী বা জন-অপ্রিয় বা সাধারণ্যে অগ্রহণীয় নীতিকেই সাধারণ্যের স্বার্থের নীতি বা নীতিমালা বলে চালিয়ে দিয়ে কার্যকরীর করার মতো জঘন্য কর্মও প্রতারণামূলক কুকর্ম হিসাবে গণ্য হয়। অথবা, কোন জনপ্রিয় বা জনগ্রাহ্য নীতি বা নীতিমালা স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহারের দুরভিসন্ধিতে জনগ্রাহ্য বা জনপ্রিয় নীতি-নীতিমালার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় অনুশীলত বা কার্যকৃত নীতি বা নীতিমালাকেই ঐ জনপ্রিয় বা জনগ্রাহ্য নীতি বা নীতিমালা হিসাবে দাবী করাও জালিয়াতিমূলক দুস্কর্ম হিসাবে নির্ণিত হয়। অথবা, কোন শ্রেণী বিশেষের স্বার্থাধীন নীতি বা নীতিমালা যা ঐ শ্রেণীর বিরোধী ও বৈরী পক্ষের স্বার্থে হানিকর তা, জেনে-বুঝে সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত-বিপদাপন্ন শ্রেণী তার শত্রুশ্রেণীকে ফাঁকি দিতে বা প্রতারিত করতে বা সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আসন্ন ক্ষয়-ক্ষতি হতে রেহাই পেতে- তারই প্রতিপক্ষের সাম্ভাব্য উত্থান ও জাগরণ ঠেকাতে নিজেরাই স্বীয় শত্রু শ্রেণীর নীতি বা নীতিমালার পোষাক আবৃত হয়ে, একদিকে নিজের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া এবং অন্যদিকে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে ঐ শ্রেণীকে স্বীয় নীতিমালার কার্যকর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সমেত তাদের জাগরণ-উত্থান প্রতিহত করার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তবে,অনুরূপ ব্যক্তি-গোষ্ঠী বিশেষ সন্দেহাতীতভাবে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক দুস্কর্মের জন্য দায়-দোষী।

মার্কস-এ্যাংগেলস যখন হতে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে আসছিলেন, তখন হতে মৃত্যু পর্যন্ত, মানব জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান, পর্যালোচনা করে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পুন:পুন রূপান্তর অর্থাৎ দাসতন্ত্রের বিলোপের মাধ্যমে সামন্ত সমাজ এবং সামন্ত সমাজের বিলুপ্তির মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে উঠার কার্যকারণ শনাক্ত-চিহ্নিত করা সমেত পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান, ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষণ, নিখুঁত তুলনামূলক পর্যালোচনা, এবং সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে যে কারণে অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পতন-বিনাশ ও বিলোপ সাধন হয়েছে, সেই কারণেই পুঁজিবাদী সমাজও বিলীন-বিলুপ্ত হয়ে পুঁজিবাদের সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে রূপ

তত্ত্বায়ন, সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এবং, অনুরূপ তত্ত্ব কার্যকরণে কমিউনিস্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পুঁজিবাদী সমাজের উৎপন্ন মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি যখন বুর্জোয়া মালিকানার বিকাশের জন্য আর সাহায্য না করার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখনই পুঁজিবাদী সমাজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিল বলেই পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি-সমাজতন্ত্রের বস্তুগত বিষয়াদি ও শর্তাদি পুঁজিবাদ যেমন উৎপন্ন করেছিল তেমন অনুরূপ সমাজের দৈনন্দিন বিষয়সমূহকে এক্কেবারে খোলাখোলি দেখা-বুঝার মতো বৈজ্ঞানিক অবস্থা তৈরী করা সমেত পুঁজিবাদী সমাজসমেত অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ সমূহের জন্ম-বিকাশ ও পতনের কার্য-কারণ নির্ণয়ের বিজ্ঞান বা তদার্থে বৈজ্ঞানিক সূত্র-তত্ত্ব উদ্ঘাটন-আবিস্কার, ও সূত্রায়নের মতো যথাযথ ও উপযুক্ত অবস্থা ও শর্তও পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ করেছিল স্বয়ং পুঁজিবাদই।

তাই, নিজ গুণেই স্বীয় বিনাশ নিশ্চিতির পুঁজিবাদী সমাজের ঐরূপ পরিপক্ক অবস্থায় কর্মরত বিজ্ঞানী মার্কসরা- মানবজাতির ইতিহাস হতে জানতে পেরেছেন যে, অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ছিল স্থানীয় বা জাতীয় গন্ডীভুক্ত। উৎপাদন ব্যবস্থাও ছিল স্থানীয়, এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। পৃথিবীর একাংশের মানুষ , অপরাংশ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ -মহামারী ছিল সেই সকল স্থানীয় অর্থনীতির সমাজভুক্তদের জীবন লিপি। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সাধনে আবশ্যকীয় জ্ঞানাভাবে তা যেমন তারা করতে পারতো না, তেমন উৎপাদিত সামগ্রী সংরক্ষণেও তাদের তেমন কোন প্রযুক্তিগত ধারণা ছিল না। তবু, অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলো চিরস্থায়ী হয়নি। কারণ- উৎপাদনী ব্যবস্থায় যখনই নতুন নতুন উপকরণ যুক্ত হয়েছে,তখনই উৎপাদনী ব্যবস্থার প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের সহিত নতুন নতুন উপকরণের বিরোধীতা ও বৈরীতা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়ছে। এবং নতুন উপকরণের সহিত সম্পৃক্ত শ্রেণী পুরাতন মালিকানা সম্পর্কের সহিত উপকরণগত বিরোধ-বৈরীতা ও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে পুরাতন মালিকানা ব্যবস্থা বাতিল-রহিত করে নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণের উপযুক্ত ও যোগ্য নতুন মালিকানা সম্পর্কের নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

অত:পর, সামন্ততন্ত্রী সমাজের গিল্ড ইত্যাদি যখন কারখানায় উন্নীত হয়ে বিক্রির জন্য পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছিল তখন উৎপাদনী প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য আবশ্যকীয় শ্রমিক পাওয়া ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি-উন্নয়ন সাধন করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। শিল্প ও যোগাযোগের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্তে শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধনও অনিবার্য ছিল এবং তা করতে হয়েছে। কিন্তু অনুরূপ অনিবার্য ক্রিয়াদির প্রতিবন্ধক সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করাও ছিল বিকল্পহীন করণীয়। তাই- পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে কথিত গণতন্ত্র কার্যত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং, বুর্জোয়া শ্রেণী যে সূত্রে- অস্ত্রে সামন্ত সমাজকে পরাজিত-পরাভূত করেছে, সে সূত্র- অস্ত্রতো বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই জন্ম দিয়েছে ও দিচ্ছে।

অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্নে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণ যেমন বিকল্পহীন শর্ত তেমন পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদনও বিকল্পহীন শর্ত। আর এরূপ শর্ত পূরণ করতে গিয়েই পারস্পারিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণী নিত্য-নৈমত্তিক নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণের জন্ম

দিতে বাধ্য। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সমাজে-পুঁজি, কেবল ব্যক্তিগত নয় , একটা সামাজিক শক্তি। অথচ, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনী উপকরণের মালিকানা হচ্ছে-ব্যক্তিগত। কাজেই , উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় এরূপ সম্পর্ক কেবল বিপরীত ও বৈরীতামূলকই নয়, বরং শত্রুতামূলক এবং অযৌক্তিক-অন্যায্য।

অনুরূপ বৈরীতা ও শত্রুতামূলক পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণী যতোই নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণের সৃষ্টি করে ততোই উৎপাদনের মাত্রা-পরিমাণ প্রসারিত হয়। এবং যেহেতু- প্রত্যেক পুঁজিপতিই পুনরুৎপাদনের শর্তে স্বীয় পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষার নিয়মে-নিগড়ে আবদ্ধ, সেহেতু, পুঁজিবাদী সমাজ একসময়ে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করে ফেলে বিক্রি সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে দায়-দেনাগ্রস্ত পুঁজিপতি তার শ্রমিক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ ইত্যাদি করে শেষত নিজেই দেউলিয়া বা মালিকানাহীন হয়। জন্মকালে পুঁজিপতি শ্রেণী গিল্ডকর্তা সমেত অনেক ছোট ছোট মালিককে-মালিকানাহীন করে স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে, এবার পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজেকে মালিকানাহীন করার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটানোর আবশ্যকীয় সকল শর্ত জন্ম দিচ্ছে। আর, ব্যক্তিমালিকানাহীন শ্রমিক শ্রেণী যেহেতু মূল্য অত:পর, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে, সেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের নৈরাজ্যিক প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে সমাজের সকল মানুষের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করার মাধ্যমে উৎপাদনী উপকরণের সামাজিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামাজিক তথা সাধারণ মালিকানার সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিক শ্রেণী।

তবে, পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন পুঁজিবাদী সমাজ হাসিল ও টিকিয়ে রাখার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ রাজনৈতিক দল ও তদানুরূপ নানান সংস্থা-সংগঠনের জন্ম দিয়েছে ও দিচ্ছে, তেমন পুঁজিবাদের কবর খনক ও কবরস্তকারী শ্রমিক শ্রেণীকেও কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা-সংরক্ষণ ও চূড়ান্তভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত-উৎখাত ও উচ্ছেদ করে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক-সংরক্ষক ও স্বপক্ষীয় সকল সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদিকে বিলুপ্ত ও বিনাশ ঘটানোর জন্য অতি আবশ্যকীয়ভাবে দুনিয়ার শ্রমিককে কেবলই শ্রেণী মুক্তির শ্রেণী চেতনায় শাণিত, সমৃদ্ধ ও সমোন্নত এবং সংগঠিত করার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য অর্জন ও অনুরূপ ঐক্য ও সাংগঠনিক কার্যাদি তথা সম্মিলিত ক্রিয়া-কর্মাদির মাধ্যমে শ্রমজীবী সহ সাম্য প্রত্যাশী সকলকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহতকরণের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক বলেই অনুরূপ আবশ্যকতায় ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রয়োজনীয় তথ্য-তত্ত্ব সম্বলিত ও নীতি-নির্দেশিকা সম্পন্ন -কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার প্রণয়ন করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

মানব জাতির জন্য অমর্যাদা ও অসন্মানের মজুরি দাসত্বের শ্রেণী বিভাজনের পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্তিতে- পুঁজিবাদী সমাজেরই সৃষ্ট একা বিপ্লবী শ্রেণী- শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, কার্যত সমগ্র মানব জাতি - শ্রেণী বিভাজন হতে শ্রেণীহীনতায় তথা শ্রেণী বিভাজনের সকল দায়-দোষ সহ সকল অমর্যাদা-অসন্মাণ, বৈষম্য-অসাম্য, দুর্দশা-দুশ্চিন্তা ও অশান্তি হতে মুক্তি লাভ করবে। কাজেই, প্রকৃতার্থে মানব জাতির মুক্তির ঐতিহাসিক কার্য-কারণ ও অনিবার্যতার সূত্র-বিবরণ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত- কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সনদ অনুরূপ বুর্জোয়া শ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানও বটে। সুতরাং, মরণাপন্ন ও মরণ চিন্তায়

আচ্ছন্ন-শংকিত ও ভীত বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় অনিবার্য বিনাশ ও বিলোপ হতে যতোটা মাত্রায় রক্ষা পেতে পারে বা নিজেদের ঐতিহাসিক পতন-পরাজয়কে যতোটা মাত্রায় ঠেকাতে-বিলম্বিত করতে পারে সে জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত নানান কলা-কৌশল ও পথ-পন্থা সমূহের মধ্যে " মার্কসবাদ"-র পোষাক পরিধানও অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়ারা জন্ম সূত্রেই প্রতারক-জালিয়াত ও ভন্ড বলেই স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় কোনো ধরণের প্রতারণা-জালিয়াতিই তাদের নিকট দোষণীয় নয়। তাই, বুর্জোয়াদের একাংশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার নাম ধারণ করে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারকে যেমন বিকৃত করেছে মার্কসদের কালেই তেমন এ্যাংগেলসের মৃত্যুর পর ঐ সকল বিকৃতকারীদের দোষর-ছেলা গয়রহ জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটদের যোগ্য শিষ্য জনাব লেনিনও নিজেকে মার্কসের খাঁটি মুরিদ ঘোষণা করে কমিউনিজম নয়, 'মার্কসবাদ'-র, নব সংযোজনী রূপ 'লেনিনবাদ'র জন্ম দিয়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেও লেনিনীয় সমাজতন্ত্র বিষয়ে রোমাঞ্চ ও মোহ উৎপন্ন করে নিপীড়িত পুঁজিপতি শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু-সমর্থক লেনিন ইউরোপের সবচাইতে বড় বাজার রাশিয়াকে ব্যবহার করে সংকটাপন্ন জার্মান পুঁজি-পণ্যের সংকটত্রাণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করাসহ অবাধ বাণিজ্যের বা সংরক্ষণ অর্থনীতির যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য ইত্যাদির মতো দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর হারে-মাত্রায় রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক একদা বিতাড়িত সামন্ত যুগের শ্রমের 'বেগারী' প্রথা পুনর্বহাল ও অব্যাহত রাখতেও লজ্জিত না হলেও এবং ডিভাইন রাইট হোল্ডার, রাশিয়ার সুপ্রিম অটোক্রাট সম্রাট জারের দুর্নীতিবাজ আমলাচক্রকে অধিকতর হারে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেও নিজেদেরতো বটেই সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের প্রচার-প্রচারণায় ধন্য হয়ে জালিয়াতি ও প্রতারণা মূলে -কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রূপায়নে দুনিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট মাত্রই কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার অনুসরণ-মান্য করবেন, এটাই স্বাভাবিক। যতোক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত নীতিমালায় অর্থাৎ ইস্তাহারে বর্ণিত কোন বক্তব্য ভুল- ভ্রান্ত হিসাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয়, ততোক্ষণ উল্লেখিত ইস্তাহারই কমিউনিস্ট মাত্রই অনুসরণ করবেন। ভুল-ভ্রান্তি অর্থাৎ মার্কস-এ্যাংগেলসতো পীর-পয়গম্বর বা মুনী-ঋষী বা দেব-দেবতা নন, কেবলই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মনষ্ক মানুষ ছিলেন এবং সদা-সর্বদা মানুষ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন। মার্কস-এ্যাংগেলসদের প্রণীত রচনা সমগ্রও তাই তথাকথিত নির্ভুল দৈববানী নয়।

কাজেই, মানুষ হিসাবে মানুষের সমাজের সূত্র- সূত্রায়ন-ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা বাক্য ইত্যাদি বিনির্মাণে বা শব্দ চয়নে কখনো কখনো অতীতের ভ্রান্ত ধারণা যা স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস-সেসব ভুল বা ভ্রান্ত ধারণার শব্দ বা শব্দরাজি তারা ব্যবহার করতে পারেন না বা তদানুরূপ ভুল করেননি, এমনটাতো নাও হতে পারে। অথবা,তথ্য-উপাত্তের সীমাবদ্ধতায় সীমিত হয়ে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, এমনটাও সুনিশ্চিত করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। তবে, মানব জাতির ইতিহাস এবং ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি- সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কিত সূত্র-তত্ত্ব যে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতা নির্ভর - তাতো কমিউনিস্ট মাত্রই কবুল

করবেন। তৎসত্ত্বেও, মার্কস-এ্যাংগেলসদের আবিস্কৃত-উদ্ভাবিত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত মৌলিক সূত্র-তত্ত্ব ইত্যাদিও প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত-পর্যবেক্ষিত হতে বারিত নয়, বা সেরকম পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত নয়; বা তদার্থে পুন:পুন পরীক্ষিত-নিরীক্ষিত হয়ে পুন:পুন প্রমাণিত হতেও প্রতিবন্ধকতা নাই।

কারণ- বিজ্ঞান পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্য বিষয় বলেই প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হতে আপত্তি থাকে না, এবং অনুরূপ প্রমাণিত বিষয় বলেই বিজ্ঞান পুন:পুন পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ সাপেক্ষ প্রমাণিত হতে প্রস্তুত থাকে বিধায় বিজ্ঞানে কোন ধরণের গোড়ামি-গোয়ার্তুমি ও মূঢ়তার স্থান নাই অথবা, নাই কোন অযুক্তি-কুযুক্তির সামান্যতম অবকাশ ।

কমিউনিস্ট মাত্রই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগিতেই কমিউনিস্ট ইস্তাহার গ্রহণ ও তা কার্যকর করবেন, এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় যদি কখনো কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কোন বিবরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা নিদেনপক্ষে কোন শব্দ বা শব্দমালার বাক্য বিশেষ ভুল-ভ্রান্ত হিসাবে প্রমাণিত ও নিশ্চিত হয়, তবে-সেরকম ভুলের উপযুক্ত কারণ ও যথার্থতা নিশ্চিত করেই কেবলমাত্র কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুরূপ ভুল-ভ্রান্তি বিষয়ে কমিউনিস্ট মাত্রই মতামত প্রদান করার অধিকারী ও এখতিয়ার সম্পন্ন। কিন্তু, অনুরূপ ভুল-ভ্রান্তি নির্ণয় ও নির্ধারণ ব্যাতিরেকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের নাম করে অর্থাৎ কমিউনিস্ট দাবীতে যদি কেউ কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত নীতি বা নীতিমালার বিরোধী ও বৈরী কোন নীতি ইত্যাদি চর্চা বা ভাষান্তরের প্রক্রিয়ায়ও এমন কোন ক্রিয়াদি করেন,যাতে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মুলনীতি বিকৃত-দুষণ হয় তবে তিনি কমিউনিস্ট নয়, জাল-জালিয়াতি সমেত প্রতারণার দায়ে দায়ী-দোষী না হওয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-যুক্তি থাকতে পারে না।

উল্লেখিত রূপ নীতির ভিত্তিতে -কমিউনিস্ট নামীয় বা কমিউনিস্ট দাবীদার যে কারো কার্যক্রম এমনকি কমিউনিস্ট ইস্তাহার ভাষান্তরকরণ সহ যে কোন ক্রিয়া-কর্মকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অধিকার কমিউনিস্ট মাত্রই স্বীকৃত অধিকার ও কর্তব্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপকার হিসাবে দুনিয়াব্যাপী লেনিন এখনো গণ্য এবং সকল লেনিনবাদীরা, যারা এখন ষ্ট্যালিন- ট্রটস্কি, মাও-হোচিমিন, হোক্সা বা কিম বা ফিদেল বা নিদেনপক্ষে চারু বাবুর অনুসারী বলেই তারা প্রত্যেক গোত্র ও গোষ্ঠী, প্রত্যেকে অপরাপর গোত্র-গোষ্ঠীকে কমিউনিস্ট নয়, পুঁজিবাদের সেবক-দালাল হিসাবে চিহ্নিত-শনাক্ত করে, এমন কি পরস্পরকে হত্যা-খুন করার জন্য লেনিনীয় বা মাও চিন্তার ফরমেটে পরস্পরকে শ্রেণী শত্রু হিসাবে বিবেচনা ও চিত্রিত করে আসছে বিধায় তারা প্রত্যেকেই লেনিনবাদী হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকে লেনিনবাদী হিসাবে কবুল করে না।

লেনিনবাদীদের অনুরূপ গাল-মন্দ সহ পরস্পরকে হত্যা-খুন করা সমেত পরস্পরকে ধ্বংস সাধনের নিমিত্তে তারা যেমন প্রতিনিয়ত বিনাশিত হচ্ছে তেমন খোদ লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সোভিয়েত সমর্থিত পূর্ব ইউরোপীয় ব্লকও ইতিহাসের খেরো খাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সমগ্র দুনিয়াব্যাপী, বহু লেনিনবাদী- পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমুহে ক্ষমতাসীন সরকারের বা ক্ষমতা প্রত্যাশী বিরোধী রাজনৈতিক দল-জোটের পার্টনার হয়েও নিজেদের রাজনৈতিক পরাজয় ও পরাভব ঠেকাতে না পেরে কেবলই প্রতিনিয়ত অবক্ষয়িত হচ্ছে। কারণ, চালাকি-চাতুরালী ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সুযোগ-সুবিধাভোগী অধিপতি শ্রেণী অর্থাৎ অতীতের সুবিধাবাদী-পরজীবীদের

পরিণতিই অর্থাৎ নিশ্চিত পরাজয়-পতন ও বিনাশ এবং বিলুপ্তিই যে, লেনিনবাদীদেরও ভবিতব্য তাওতো ইতিহাসের শিক্ষা।

খোদ লেনিনসহ লেনিনবাদীরা যে, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার , অমান্য-অস্বীকার ও অকার্যকর করবে তা যেমন স্বাভাবিক তেমন প্রতারণা ও জালিয়াতিমুলেই যে, নিজেদেরকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের রূপকার দাবী করবে তাও স্বাভাবিক। কিন্তু, দুনিয়ার সকল লোকজনকে অজ্ঞ -বোকা ভেবে কেবলই নিজেদেরকে চালাক-চতুর সাজিয়ে এমনকি ভাষাগত বিষয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ বা বহু ভাষা-ভাষী বহু মানুষজন দুনিয়ায় আছে এমনটা জেনেও কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার ভাষান্তর বা অনুবাদেও প্রতারণা-জালিয়াতি বা কারসাজি করবে লেনিনবাদীরা, এমনটা লেনিনবাদীদের উপযুক্ত কর্ম হলেও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই লেনিনবাদীদের ধান্ধাবাজি বিষয়ে যেমন নিশ্চিত হবেন, তেমন অপরাপর সকল জুচ্চোর-ভন্ডদের মতোই লেনিনবাদীদের মহাপন্ডিতিরূপ কাক-চরিত বোকামির মিল খুঁজে পাবেন।

অত:পর, লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার বিরোধী ক্রিয়া-কর্ম ও দুস্কর্ম সাধনে -সম্পন্নে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার অমান্য-অস্বীকার ও অকার্যকর করেছে এবং এমনকি, ইস্তাহার অনুবাদেও যে, কারসাজি করেছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু নজির উত্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হল-

শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল যে, আলোচ্য নিবন্ধে ব্যবহারের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার যা ১৮৪৮ সালের সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদ তা আমরা গ্রহণ করেছি- Marxists Internet Archive হতে। তবে ইংরেজী ভাষার আরো কয়েকটি সংস্করণ আমরা আরো অন্যান্য আর্কাইভ হতে সংগ্রহ করলেও যেহেতু উল্লেখিত সংস্করণগুলোতে কোন তফাত-তারতম্য দেখিনি সেজন্য প্রাপ্ত উৎসের সহজলভ্যতা বিবেচনায় আমরা Marxists Internet Archive হতে প্রাপ্ত সংস্করণটিকে ব্যবহার করেছি। আবার, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, হতে প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ এবং Marxists Internet Archive হতে প্রাপ্ত বাংলা সংস্করণে কোন তফাত নাই বলে আমরা প্রগতি প্রকাশনের বাংলা সংস্করণগুলো আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। উল্লেখ্য- কার্ল মার্কস -ফেডারিক এ্যাংগেলস * রচনা-সংকলন, দুই খন্ডে সম্পূর্ণ* প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, যা ১৯৭২ সালে প্রগতি প্রকাশন , মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে সংকলিত " কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার" , এবং একই প্রকাশনা হতে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত এবং একই প্রকাশনা হতে সাল-তারিখ বিহীন প্রকাশিত - "কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার" মোট এই ৩টি'র মধ্যে বিবৃত বিষয়ে মিল আছে বলে অত্র নিবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো ঐ ৩ টি বইয়ের যেকোনটিতেই পাওয়া যাবে। তবে, ইস্তাহার হিসাবে প্রকাশিত বই দুটোর প্রত্যেকটিতেই একটি করে লেনিনের মোট দুটো বক্তব্য আছে।

তাছাড়া- সলিলকুমার গাংগুলি কর্তৃক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চার্টার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ হতে প্রকাশিত এবং সমীর দাসগুপ্ত, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০১৬ হতে মুদ্রিত , "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার" ডিসেম্বর-১৯৯৮, অক্টোবর-২০০১, নভেম্বর-২০০১, জানুয়ারী-২০০২, জুলাই-২০০২, নভেম্বর-২০০২, সেপ্টেম্বর-২০০৪, সেপ্টেম্বর-

২০০৬, ডিসেম্বর-২০০৬, নভেম্বর-২০০৭ এবং নভেম্বর-২০০৮ সালে মুদ্রিত বইখানিও উল্লেখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি।

প্রগতি প্রকাশনের সত্ত্বাধিকারী লেনিনের প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক পার্টি, আর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও গণশক্তি প্রিন্টার্স'র সত্ত্বাধিকারী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) । কাজেই, উল্লেখিত প্রকাশনা হতে প্রকাশিত বই-পুস্তকের বিষয়াদি সমেত তদ্বিষয়ে দায়-দায়িত্ব উপরোল্লেখিত পার্টিদ্বয়েরই। উভয় পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহার গুলোকে সংক্ষেপে- মস্কো হতে প্রকাশিত বুঝাতে -ক.ই (ম) এবং কলকাতা হতে প্রকাশিত বুঝাতে -ক.ই (ক) হিসাবে অত্র নিবন্ধে ব্যবহার করা হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার সম্পর্কে ১৯৮৫ সালে প্রগতি প্রকাশনা হতে প্রকাশিত পুস্তকের প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্টায় লেনিনের বক্তব্য হিসাবে মুদ্রিত এই: " 'এই অনতিদীর্ঘ পুস্তিকাটির মূল্য বৃহৎ কয়েকখন্ড গ্রন্থের সমান; এর মর্মবাণী আজও সভ্য পৃথিবীর সমস্ত সংগঠিত ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতকে অনুপ্রাণিত ও পথনির্দেশ করে।"

অত:পর, কমিউনিস্ট ইস্তাহার কি কেবলই ' সংগঠিত ও সংগ্রামী' শ্রমিককে অনুপ্রাণিত ও পথনির্দেশ করার বচনামৃত মাত্র ? অথবা, অসংগঠিত বা সংগ্রামে লিপ্ত নয়, এমন শ্রমিক কি, স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ বুঝতে বা উপলব্ধি করতে বা স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষায় স্বীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিক অবস্থান ও দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য ও করণীয় বুঝতে এবং সেমতে সংগঠিত ও সংগ্রাম করার বোধ বা চেতনা পাবে না- কমিউনিস্ট ইস্তাহার হতে? তাছাড়া- শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য নয়, অথচ, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে যারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তে তথা সামাজিক মালিকানার সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিজের মুক্তিও অনুসন্ধান করবেন ও সেমর্মে সচেষ্ট ও সক্রিয় হবেন, তারাও কি তদার্থে উপযুক্ত প্রামাণ্য দলিল হিসাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহার গ্রহণ করতে পারবেন না? এক কথায়, যারাই শ্রেণী বিলুপ্তির শর্তে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গতি ও ধারার সাথে নিজেকে যুক্ত ও জড়িত করতে চান বা তেমনটা চাইবেন, তারা কি এই ইস্তাহার প্রণীত হওয়ার পুর্বে এমন কোন নীতি-সূত্র বা তাদানুরূপ সূত্রায়নের কোন বই পুস্তক লাভ করেছিলেন? অথবা, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির মাধ্যমে সমাজ হতে শ্রমিক-মালিক, এই শ্রেণী ও শব্দদ্বয়ের অবসান ও বিলুপ্তির মাধ্যমে কার্যত কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী নয়, বরং প্রকারান্তরে সমগ্র মানবজাতি মুক্তি অর্জন করবে বলেই অনুরূপ মুক্তির কার্যকারণ সমুহ বর্ণিত অত্র কমিউনিস্ট পার্টির ইস্ত াহার কি বস্তুতই এবং প্রকৃতই মানবজাতির মুক্তি সনদ নয়?

আর অন্ধ কবি হোমারের মহাকাব্যগুলো বা সেক্সপিয়রের নাট্যসমগ্র বা কৃষাণ চন্দরের উপন্যাসসমুহ বা মধুসুদনের মহাকাব্য নয়, বরং একটি সনেট বিশেষতো বটেই, এমনকি নাম-গোত্রহীন বা অনভিজাত লেখকের লিখিত বই-পুস্তকও কি অনেক অনেক বই-পুস্তকের ভিত্তিতে লিখিত এবং সেরকমভাবে ব্যাখ্যাত নয় কি ? লিখিত ইতিহাসের যুগ হতে একাল পর্যন্ত অনেক অনেক কাব্য-মহাকাব্যই নয় কেবল, বরং বহু বহু বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাদি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে যার মুল্য কেবল ক্ষতিকরই নয়, বরং মানবজাতির অগ্রগতির প্রতিবন্ধক বলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল। উপরন্ত, মিথ বা কল্পকথা জাতীয় বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়বস্তু কেবলই স্বার্থান্ধতার ও অজ্ঞতার এবং কল্পিত কল্পনার ফসল বলেই ঐ সমস্ত বৃহৎ গ্রন্থসমুহের মুল্য কেবলই মানুষকে স্বাধীন-মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে দাসানুদাস হতে অনুগত ভৃত্যে নামিয়ে আনার মুল্যেরই সমান মাত্র।

অত:পর, লেনিন কি তার অনুরূপ মুল্যায়নে সেই অতীব মুল্যবান গ্রন্থাদিকে তার বিচার-বিবেচনা হতে বাদ দিয়েছেন? তবে, বাইবেল সহ এজাতীয় নানান গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ এবং রাষ্ট্রিকভাবে সেই সকল গ্রন্থের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এমনকি দিনপঞ্জী ইত্যাদি চালু করে বা মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করা সহ হত্যা-খুনে সেই রকম দৃষ্টিভংগি পোষণ ও তদানুরূপ কুকর্মাদি সম্পাদন বা নারী-পুরুষ বিষয়ে সেই সকল বৃহৎ গ্রন্থাদির আদলেই ভাগ-বিভাজন করে, এমনকি ভূমি সংস্কারকালীন পুরুষ অপেক্ষা নারীকে কম পরিমাণ দখলীস্বত্ব প্রদানের মাধ্যমেও নারীকে হেয় ও হীন গণ্য করেছেন বলেই মানবজাতির দাসত্বের প্রতিবিধান সম্বলিত ঐ সকল বৃহৎ গ্রন্থাদিও যে মি: লেনিনের নিকট অতীবমুল্যবান তাতে আর সন্দেহ কি। সেজন্যই দাসত্বের রক্ষক-পোষক লেনিন কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারখানিকেও কেবলই একটি অনতিদীর্ঘ পুস্তক হিসাবে শনাক্ত ও চিহ্নিত করা সমেত কোন প্রকার বাচ-বিচার ছাড়াই কেবলই বৃহৎ কয়েকখন্ড গ্রন্থের সমতুল্য করার অপচেষ্টা করেছেন।

পুঁজিবাদ- পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে অতীতের সামন্ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দুনিয়াজোড়া একটি আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কসরা এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এই:

" ঐতিহাসিকভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সামন্ত-বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল, তার স্বভাবসিদ্ধ উর্দ্ধতন' দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে; মানুষের সংগে মানুষের নগ্ন স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ দেনাপাওনার' সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই রাখেনি । আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের ঠান্ডা জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কুপমন্ডক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মুল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময়-মুল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে এরা এনে খাড়া করেছে ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা-অবাধ বাণিজ্য। এককথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহগ্রস্ততার মধ্যে যে শোষণে এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সন্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ,পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী-সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরিভোগী শ্রমজীবী রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা থেকে তার ভাবালু আবরণকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে নামিয়ে এনেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসাবে চূড়ান্ত অলস নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের প্রয়:প্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদুর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযানে অতীতের সকল জাতির দলবদ্ধ দেশান্তর যাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকে ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেইসংগে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপরপক্ষে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকী উৎপাদন পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটা বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুসাংগিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভারাক্রান্ত কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিত সম্পর্ক ইত্যাদি দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে উঠবার আগেই সেকেলে হয়ে আসে। যা কিছু সারবান তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কুলষিত, শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সংগে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য-ব্যবস্থাতে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতিগত ভূমিটা যার উপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবনমরণের প্রশ্নের শামিল; এমন সব শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় সুদুরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করছে; এমন সব শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, দুনিয়ার সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদুর দেশ বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার অবস্থাতে উৎপন্ন সামগ্রী। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর-নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে উদ্ভুত হয় একটা বিশ্ব সাহিত্য। ”

উল্লেখ্য- এই উদ্ধৃতিটি এখানেই শেষ নয়। তবে, মস্কো ও কলকতা হতে প্রকাশিত ইস্তাহারদ্বয়ের মধ্যে ফারাক বা তফাত সমেত ইংরেজী ভাষার ইস্তাহারখানির বৈশাদৃশ্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকৃতির নজির হিসাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতির অংশ বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ প্রথমে কলকাতার বাংলা অনুবাদ এবং পরবর্তীতে ইংরেজী অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করবো। এবং যথারীতি যৎকিঞ্চিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করে উপরোক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশ উদ্ধৃত করবো।

ক-ই (ক) : “নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র একে বসতি নির্মাণ করতে হয়, সর্বত্র একে উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে শোষণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগকে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে এ শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে জাতীয় ভূমিটি, যার ওপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত প্রাচীন-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প, যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবনমরণের প্রশ্নের শামিল; এমন সব শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় সুদুরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করছে; এমন সব শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার দুরবর্তী দেশ ও জলবায়ুর উৎপাদন। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর-নির্ভরতা; বস্তুগত উৎপাদনে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। স্বতন্ত্র জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সর্বজনীন সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে জেগে ওঠে একটা বিশ্ব সাহিত্য। ”

এবারে শুধুমাত্র উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের ইংরেজী ভার্ষাণ দেখা যাক:-

“ The need of a constant expanding market for its product chases the bourgeogiesie over entire surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere.

The bourgeoisie has, through its exploitation of the world market, given a cosmopolitan character to production and consumption in every country. To the great chagrin of reactionaries, it has drawn from under the feet of industries the national ground on which it stood. All old established national industries have been destroyed or are daily being destroyed. They are dislodged by new industries, whose introduction becomes a life and death question for all civilized nations, by industries that no longer work up indigenous raw material, but raw material drawn from the remotest zones; industries whose products are consumed, not only at home, but in every quarter of the globe. In place of the old wants, satisfied by the production of the country, we find new wants, requiring for their satisfaction the product of distant lands and clims. In place of old local and national seclusion and self-sufficiency, we have intercourse in every direction, universal inter-dependence of nations. And as in material,so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sidedness and narrow-mindedness become

more and more impossible, and from the numerous national and local literatures, there arise a world literature."

অত:পর, " nestle" এর বাংলা " ঢুকা" বা উপনিবেশ নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী-বাজার নয়, শ্রম শক্তি শোষণ করে। কাজেই ক-ই(ক) এ বর্ণিত " বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে শোষণের মধ্য দিয়ে" রূপ বক্তব্য বা বুর্জোয়াদের শোষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত ক-ই (ম) এ বিবৃত কেবলই " বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে" রূপ বিবরণ যেমন ইংরেজীর হুবুহু নয়, তেমন উভয় ইস্তাহারের বিবরণও তফাত বৈ একার্থক বা সমার্থক নয়; এবং "Cosmopolitan" and "Universal" শব্দদ্বয় ভাবার্থের দিক থেকে নিকটবর্তী হলেও ব্যবহারিক পার্থক্য বিদ্যমান বলেই আলোচ্য উদ্ধৃতিতে শব্দ দুটো দুস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। "Cosmopolitan", & "Universal" এর আভিধানিক বাংলা যথাক্রমে : "স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত" বা " বিশ্বজনীনতার উদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি, যিনি সকল দেশকেই নিজের দেশ মনে করেন " এবং " বিশ্বজনীন"। সুতরাং, " বিশ্ব বাজারে ইহার শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিটি দেশে উৎপাদন এবং ভোগে সর্বজনীন চরিত্র দান করেছে" রূপ বাংলা অনুবাদই কি উল্লেখিত ইংরেজী বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ নয়?

জলবায়ু নয়,পণ্য উৎপাদন করে বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু, ক-ই (ক)তে বর্ণিত হয়েছে " এমন সব চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা,যা মেটাতে দরকার দুরবর্তী দেশ ও জলবায়ুর উৎপাদন।" বিধায় অনুদিত অনুরূপ বক্তব্য দ্বারা বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে যেমন বিভ্রান্তি ও ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে তেমন " জলবায়ু" সম্পর্কেও ভয়ানক অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে, এটি যে, জলবায়ু বিষয়ে অনুবাদকের মূর্খতা নয়, বরং অনুবাদ কর্মটি স্বীয় রাজনৈতিক অবস্থান জনিত দোষে দুষ্ট বা আদিষ্টদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে সম্পাদিত বলেই পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও অনুবাদক ও অনুমোদকদের চৈতন্যহীনতার অকাট্য প্রমাণ। তবে অনুরূপ বক্তব্যটি, ক-ই (ম) এর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

পারস্পারিক নির্ভরতার সম্পর্কের বহুজনের মতোই দাম্পত্যজীবনের সক্রিয় অংশীদারদ্বয়ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, একই দেহের অংগাদি ইন্টার-রিলেটেড বা ইন্টর-ডিপেন্ডেড অর্থাৎ আন্ত:সম্পর্কীত বা আন্ত:নির্ভরশীল। অত:পর, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল দম্পতি বিশেষ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হলেও স্ব-স্ব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, বরং কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়াই শ্রেয়তর। কিন্তু, দেহগত অংগাদি " পরস্পর" নির্ভরশীল হলেও কেবলই পারস্পারিক নয় বলেই কখনো কখনো কোন অংগ বিশেষ বিচ্ছিন্ন হলে বা দেহগত প্রয়োজনে তেমনটা করা হলে বিচ্ছিন্ন অংগ বিশেষ, স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম ও অনুপযুক্ত হেতু দেহগত অংগাদি পরস্পর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতার্থে ইন্টার-ডিপেন্ডেড ।

আধুনিক শিল্পের দ্বারা অতীতের দেশীয় শিল্পের বিলোপ-বিনাশ, স্থানীয় কাঁচামালে আধুনিক শিল্প সচলে অক্ষমতা হেতু একদম দুর-দুরান্ত বা গহীন অঞ্চল হতেও কাঁচামাল সংগ্রহ এবং আধুনিক শিল্পে উৎপন্ন পণ্য কেবলমাত্র উৎপাদিত স্থান বা উৎপন্নের নিজ দেশেই নয়, বরং বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহৃত হয় বলেই সাবেকী স্থানীয় ও জাতিয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার স্থলে দুনিয়ার সকল জাতি এক বৈশ্বিক আন্ত:নির্ভরতায় নিপতিত হয়েছে

বলেই অনুরূপ বিবরণ যথার্থ ও নিখুঁতভাবে বিবৃত করে ইস্তাহারের ইংরেজী ভাষার্ণে বর্ণিত : "universal inter-dependence of nations." এর বাংলা অনুবাদের উভয় ইস্ত াহারে বর্ণিত " জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পারস্পারিক নির্ভরতা", কেবল ভুল বা ভ্রান্তই নয়, বরং তা যে, অনুবাদকদের বিশেষ অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে করা হয়েছে, তাও পরবর্তীতে নিশ্চিত হবে।

"Individual" শব্দের বাংলায় " স্বতন্ত্র" হলেও ব্যবহারের স্থান বিশেষে তফাত হয় বলেই " The intellectual creations of individual nations become common property." এর বাংলাকরণে ক-ই(ম) এ- বর্ণিত এই: " এক একটা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি।" যদিচ, বুর্জোয়া যুগেও সম্পত্তি হতে উৎখাত-উচ্ছেদ করা বৈ প্রত্যেক দেশেই বহু মানুষের সম্পত্তি থাকার সুযোগ বুর্জোয়া অর্থনীতি দিতে পারে না বলেই সকল দেশেই অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। তবু, সম্পত্তিহীন শ্রমজীবী মানুষকে ফাঁকি-জুঁকি দিয়ে স্ব-স্ব বা স্বীয় সম্পত্তি রক্ষায় বুর্জোয়ারা প্রায়শই বলে থাকেন যে, দেশ বিশেষের সকল সম্পত্তি সকলের বা রেল-বিমান বা তেল-গ্যাস ইত্যাদির মতো জাতীয়করণকৃত সম্পত্তিকেও জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক অধিপতি শ্রেণী-গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা হাসিল করা ব্যতীত এমনকি জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানে শ্রম-শক্তি বিক্রেতা শ্রমিকও কখনো কথিত জাতীয় সম্পত্তির অংশীদার হওয়াতো দুরে থাকুক ন্যূনতম স্বীয় শ্রম-শক্তির মূল্যও পায় না, বরং বুর্জোয়া অর্থনীতির সূত্রমতোই তার শ্রম শক্তির ক্রেতা খোদ রাষ্ট্রকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে দিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিকট শ্রম বিক্রেতা শ্রমিক তার নিয়োগকর্তা রাষ্ট্র কর্তৃক কেবল পীড়িত-নির্যাতিতই নয়, বস্তুত শোষিত হয়; এবং অনেক সময়েই রাষ্ট্রিক কর্তাদের গৃহীত ভুয়া নীতি, ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ও মাথাভারী প্রশাসনের অতিরিক্ত ব্যয়ভার এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বহুমুখিন টানা-পোড়ন ইত্যকার হেতুবাদে মাসের পর মাস প্রাপ্ত মজুরি না পেয়ে ভয়ানক দুর্দশায় নিপতিত হয়ে , রাষ্ট্রিক কর্তাদের ছবি সম্বলিত প্লাকার্ড বহন করে আনুগত্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও প্রাপ্য মজুরি নয়, রাষ্ট্রিক কর্তাদের হুকুম নির্দেশিত পুলিশ ক্ষেত্রবিশেষ সেনাবাহিনীর গুলি-টিয়ার শ্যাল বা কামানের খোরাক হয়ে মৃত্যুবরণ, হামলা-মামলায় জখম-জেল, চাকুরীচ্যুতি সহ নানান ধরণের নিপীড়ন-নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়। রুশ-চীন সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত দেশগুলির শ্রমিকরা যেমন অমন রাষ্ট্রিক দমন-পীড়নের বলি হয়েছে তেমন বাদ যায় না ভারত-বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক খাতের শ্রমিকরা। তবু, বলা হয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি জাতীয় সম্পদ, তাই নাকি, তা জাতির সকলের সম্পদ ! এক্ষেত্রেও "কমন প্রপার্টি"র হুবুহু বাংলা " সাধারণ সম্পত্তি" বলতে বুর্জোয়া দোষেই কিঞ্চিত হলেও লজ্জা বোধ করেছেন অনুবাদক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু,ক-ই(ক) তে সকলের সম্পত্তি লিখেও আধুনিক বুর্জোয়া যুগে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়া জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণচিত্ততার "বৈশ্বিক আন্ত:সম্পর্কাধীন জাতিসমূহের" স্থলে বসানো হল -" স্বতন্ত্র জাতি" !

স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও স্বীয় স্ত্রী সংরক্ষা ও উদ্ধারে অক্ষম-অযোগ্য রাজা রামের অপহৃত স্ত্রী-সীতা উদ্ধারের উপাখ্যান-'রামায়ন' রচনা করেছিলেন ভারতীয় কবি বাল্মিকী। তবু, কারো কারো জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা-পরিসীমা নির্ণয়ে রচিত বাংলার বাগবিধি-'সারারাত রামায়ন পড়ে সকালে বলে সীতা কার বাপ'এর মতো প্রশ্ন উত্থাপনকারীর সাথেই, ক-

ই(ক) অনুবাদক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ তুলনীয় নয় কি? তবে, "স্বতন্ত্র জাতি" বলা না হলে অনুবাদকারীরা- লেনিনীয় " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক নীতি বা " জাতীয় মুক্তি"র রাজনীতি কি করে করবেন ? অথবা, নিউ ইর্য়ক ডেইলী ট্রিবিউন, ৩৮২৪ সংখ্যা, ২০ শে জুলাই,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত " ভারত শাসন", যা প্রগতি প্রকাশন, মস্কো হতে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত " কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকে মুদ্রিত ঐ নিবন্ধে মার্কস যেমন লিখেছেন- "ভারতীয় ধর্মের দ্বারাপ্রান্তে দেখা যায় এক স্বর্গীয় ত্রিমূর্তি," ; ঈশ্বর অবিশ্বাসী হয়েও কেবলই পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থে ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী জহরলাল নেহেরুদের প্রণীত ত্রিমূর্তি সম্বলিত ভারতীয় সংবিধান সমর্থন-রক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে ঈশ্বরের নামে শপথমূলে আবদ্ধ হয়ে ভারত রাষ্ট্রের সেবা তথা দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আইনের শাসন ইত্যকার নানান কিছিমের ভাওতা দ্বারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকিয়ে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের সেবা ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন কি ভাবে সি.পি.আই. (এম) ?

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উপরে উল্লিখিত অংশে যেমন বুর্জোয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন তেমন নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, ৩৮৪০ সংখ্যা, ৮ই আগষ্ট,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা-একদিকে মানবজাতির পারস্পারিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমন বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন জগতের বৈষয়িক সর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব আত্মস্থ করে নিবে, এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।"

কাজেই," বুর্জোয়া যুগের ফলাফল-বিশ্ব বাজার ও আধুনিক উৎপাদন শক্তি", এর পরিণতি যে- পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রত্যেক মানুষের উপর প্রত্যেক মানুষের নির্ভরশীলতার বৈরী সম্পর্কের পুঁজিবাদী সমাজের স্থলে প্রত্যেকের পারস্পারিক নির্ভরতার কার্যকর রূপ অর্থাৎ প্রত্যেকের সহযোগিতার সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সামাজিক বিপ্লব সংঘটন ছাড়া তথাকথিত জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন ইত্যাদি যে, শ্রমিক শ্রেণীর কর্ম নয়, তাওতো নিশ্চিত হয় উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা।

উল্লেখিত মতামত দ্বারা মার্কস খুবই পরিস্কার করে জানিয়েছেন যে, উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তারকারীকারী কতিপয় দেশের কতিপয় ব্যক্তি তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর মালিকানার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে যদি উৎপাদন উপকরণের মালিকানা গ্রহণ করে ঐ সমস্ত দেশের জনগণ, তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মুক্ত হবে উপনিবেশ।

একই নিবন্ধে মার্কস আরো লিখেন- " খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে,

ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।" কাজেই, বুর্জোয়া সমাজের নতুন নতুন উপাদান যা বৃটিশ বুর্জোয়ারাই ভারতে ছড়িয়েছে এবং সেই ছড়ানো-ছিটানো উপকরণাদির সুযোগ-সুবিধায় ভারতীয় হিন্দুরা যে, এক সময়ে ইংরেজ বুর্জোয়ার জোয়াল ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইতোমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে আধুনিক উপকরণের মালিকানাজনিত বিরোধ-বৈরীতার আন্ত:দ্বন্দ্বে লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারাই। আবার, শিল্প শ্রমিক কর্তৃক খোদ বৃটেনের বুর্জোয়ারা শাসক শ্রেণী'র ক্ষমতা হতে বিচ্যুত হলেও তেমনটা ঘটার শর্তই মার্কস আলোচ্য নিবন্ধে বিবৃত করেছেন।

কিন্তু, উল্লেখিত "উপনিবেশিকতা প্রসংগে"বইয়ের "প্রকাশকের বক্তব্য" এই: " মার্কস লেখেন, 'রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে নিয়ে চলছে বৃটিশ বুর্জোয়ারা যদিও সেই সংগে বাধ্য হচ্ছে ভারতের পুঁজিবাদী শিল্পের বীজবপনে।' ইংরেজ বুর্জোয়ারা হয়তো বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা, সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না,- এগুলি শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ওপরই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব গ্রহণের উপরও নির্ভরশীল।" এবং তিনি আরো লেখেন-" মার্কস এই সিদ্ধান্ত টানেন: একমাত্র বৃটিশ জোয়াল থেকে ভারতের মুক্তিতেই ' এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন' ঘটা সম্ভব।"

শ্রমিক নয়, ভারতীয় 'হিন্দু' কর্তৃক বুর্জোয়া উপাদানের ফলাফল লাভ বা ভারতের পুনরুজ্জীবন আর ভারতের মুক্তি একই কথা নয়, বা সমার্থকও নয়। তবু, এই বইয়ের কোন্ নিবন্ধে প্রকাশকের দাবীকৃত -" ভারতের মুক্তি" বিষয়ে মার্কস এমন আজগুবি কথা লিখেছেন তার উল্লেখ কিন্তু মান্যবর প্রকাশক মহোদয় করেননি। তবে, কেবলমাত্র উল্লেখিত নিবন্ধ হতেই কতিপয় উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করে, আন-কোট বক্তব্য তথা "ভারতের মুক্তিতেই" বক্তব্যটি মার্কস টেনেছেন বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এখন, প্রশ্ন হচ্ছে- মার্কস এমন সিদ্ধান্ত টেনে থাকলে সেই ভুল সিদ্ধান্তটি তিনি নিজেই কেন লিখলেন না বা মার্কস যা, লিখেননি তেমন বক্তব্য মার্কসের নামে আন-কোট চালিয়ে দেওয়ার দুর্মতি বা সুযোগ, প্রতারক বা ভন্ড ছাড়া আর কারো থাকে?

অত:পর, মার্কসের বরাতে বিবৃত "ভারতের মুক্তির" বিষয়টি কতটা মাত্রায় সঠিক বা যথার্থ বা আদৌ মার্কস এমন মতামত দিয়েছেন কি না , তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার সুবিধার্থে এই হেন পন্ডিত প্রবর প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণিত পুস্তকের তদসংশ্লিষ্ট তথা পূর্বোল্লেখিত " ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" নিবন্ধের দীর্ঘ অংশ বিশেষ আমরা উদ্ধৃত করছি: " রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির ওপর ভারতের জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেংগে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা হয়তো বা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না-এগুলি শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপরই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব গ্রহণের ওপরও নির্ভরশীল। কিন্তু, এ দুটি জিনিষের জন্যই বৈষয়িক পূর্ব স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশী কি

বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা,দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক, ন্যূনাধিক সুদুর ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা-প্রিন্স সালতিকভের ভাষায়-এমনকি হীনতম শ্রেণীগুলিও " plus fine et plus adroits que les Italiens" (৬৬), যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা সহনীয় (counterbalanced),স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা বৃটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের জাতিরূপ।

উপসংহারে কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসংগে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অংগাংগি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামনি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন সাধারণ দুর্নীতি ওদের লালসার সংগে তাল রাখতে পারছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলংঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করেনি- কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যে রাজারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলোতে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি? ' সম্পত্তি, শৃংখলা, পরিবার ও ধর্মের' পুরোধা হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখন্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসংগে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিৎ নয়,বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন সংগঠিত, ও হল তারই অগাংগি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্থিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থনীতিশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অংগাংগি নিয়মগুলি কাজ করছে, বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেগুলোকেই উদ্ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে।"

কাজেই, কপট, বর্বর এবং সম্পত্তির সমর্থক বুর্জোয়া, তা ইংলন্ড বা ভারত যেখানকারই হোক না কেন তারা যে শোষণ, লুণ্ঠন, ও রক্ত ঝরানো সমেত জনজীবনের দু:খ-দুর্দশা ও দীনতা বাড়ানো ছাড়া পুঁজিবাদী উৎপাদন করতে পারেনি এবং পারে না তাতো আলোচ্য উদ্ধৃতি দ্বারা নিশ্চিত হয়। তাছাড়া, শ্রমিক শ্রেণী নয়, ভারতীয় হিন্দুরা বুর্জোয়া ব্যবস্থার

উপকরণাদির সুবিধাদি পেতে হলে মার্কস দু'টো শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি- ইংলান্ডে প্রলেতারীয় কর্তৃক বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত এবং অন্যটি ভারতীয় হিন্দু কর্তৃক ইংরেজকে বিতাড়ন করা। না-মার্কস, ইংরেজ তাড়ানোর দায়-দায়িত্ব ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে নিতে বলেননি। আর, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপকরণাদির সুবিধাদি পাওয়া আর বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদ করা এক নয়। উপকরণের সুবিধা পায় বুর্জোয়া শ্রেণী, আর বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিনাশে সুবিধা কেবল শ্রমিক শ্রেণী নয়, পাবে বটে সমাজের সকলেই। অত:পর, পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ-উৎখাত ও বিনাশ তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান করার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সাধন ব্যতীত অন্যকোন মুক্তি বা ভারত মুক্তি ইত্যকার অসত্য বক্তব্য ভুয়াভাবে মার্কসের বরাতে লেনিনবাদীরা যেমন বলছে তেমন ভারতের লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা নিজেদের ব্রত হিসাবে ঘোষণা করেছিল ভারতের- মুক্তি ।

প্রাসংগিকভাবে বলা যায়- প্রাক পুঁজিবাদী সময়ে গ্রীক রাজা আলেকজান্ডার বা মোংগলীয় রাজা চেগিংস খান প্রমুখ লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি মানুষ হত্যা করে দুনিয়ার বহু দেশ দখল করে স্বীয় সাম্রাজ্য বাড়িয়ে নিজেরাও গ্রেট বা কিং অব কিং হয়ে বিজিত দেশের বহুজনকে জাত-ধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করেছে। আবার, পরাজিত রাজারাও সুযোগ পেলেই দেশ মাতৃকাসমেত জাত-ধর্ম ইত্যাদি রক্ষা ও পুনুরুদ্ধারে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। তবে, ভারত দখলকারী- " আরবী,তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দু ভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। বৃটিশরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু অনধিগম্য। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেংগে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে উন্মেলিত করে এবং স্থানীয় সমাজের যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়।" মর্মে লিখেছেন মার্কস-" ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" নিবন্ধেই। এবং

নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, ৩৮০৪ সংখ্যা, ২৫ শে জুন,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত -" ভারতে বৃটিশ শাসন" নিবন্ধে মার্কস লিখেন- " বৃটেন শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গেছে।" এবং একই নিবন্ধে তিনি আরো লিখেন- " এই সব ছোটো ছোটো বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেংগে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাস্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলই। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে কাটা সূতা, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এক বিশিষ্ট সমন্বয়ের কুটির শিল্প, যা থেকে তারা পেত আত্ম নির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাংকাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সূতা কাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করেছে এবং এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেংগে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।"

কাজেই, ১০৬৬ সালে ফ্রান্সের নরমান্ডির ডিউক উইলিয়ামের ইংলন্ড দখল বা চেংগিস খানের উত্তরাধিকার উজবেকিস্তানে জন্ম নেওয়া কাবুলের রাজা ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের ১৫২৬ সালে ভারত দখল বা এরূপ আরো অন্যান্য রাজাধিরাজদের নানান দেশ দখল -বেদখল করা আর ফ্রান্স বা ডাস বা বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত দখল সহ পৃথিবীর তাবৎ দেশগুলো দখল করা এক কথা নয়, বা সমার্থক নয়। কারণ, চেংগিস খান, উইলিয়ম বা বাবর , প্রমুখরা রাজ্য বিস্তার করলেও দখলাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো ভেংগে দেয় নাই। কিন্তু, পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলো যখন যে দেশ দখল করেছে সে দেশেই যে, ভারতের মতোই তান্ডব চালিয়েছে এবং পুরোনো ব্যবস্থা ভেংগে চুরমার করে নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনী উপকরণের উপযুক্ত ও যোগ্য নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিপ্লব সংঘটিত করেছে, তাওতো মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিত হয়।

ঐ একই নিবন্ধে মার্কস আরো লিখেছেন- " এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"

কাজেই, " ভারতের মুক্তি" সাধনকারী লেনিনবাদী প্রকাশক মহোদয় যে, ইতিহাসে বুর্জোয়া সমাজ ও শ্রেণীর ভূমিকা বুঝতে অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে কার্যত সোনালী অতীতের রামরাজত্বের ভারতে ফিরে যাওয়ার অবাস্তব ও কল্পনাবিলাসী, তবে উদ্দেশ্য আরোপিত বলেই, যেমন সামাজিক বিপ্লব বুঝতে পারছেন না, তেমন প্রাক-পুঁজিবাদী রাজ-রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ইউরোপীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর দুনিয়া দখল, ও নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যকার ফারাক-তফাৎ ও তাৎপর্যও, বিবেচনায় নিতে পারছেন না, বলেই মার্কসের বক্তব্যকেও বিকৃত করতে পিছপা হচ্ছেন না ।

তাছাড়া, মার্কস তার " ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল"(সূত্র উপরে উল্লেখিত হয়েছে) নিবন্ধেই লিখেছেন- " হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক সৈন্যবাহিনী দ্বারাই? বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোন ইতিহাস নেই-অন্তত জানা কোন ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন এই, আমরা কি চাই তুর্কী, পারসিক কি রুশদের দ্বারা ভারত বিজয়, নাকি বৃটেনের দ্বারা ভারত বিজয়?"

অত:পর, ইতিহাসের গতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনকারী, বিজ্ঞানী মার্কস- ঐতিহাসিক কারণেই মধ্যযুগীয় বর্বর বা অর্ধ বর্বর ও অর্ধ অসভ্য সমাজের পুঁজিবাদী সামাজিক রূপান্তরের পক্ষভুক্ত হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যথার্থভাবেই বিবৃত

করেছিলেন এবং অতীতের সমাজের তুলনায় পুঁজিবাদী সমাজ যে খুবই প্রগতিশীল তাও সন্দেহাতীতভাবে ও ইতিহাস সম্মতভাবে কবুল করেছেন। তাই, ইংলন্ডের ভারত দখলকে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা বৈ বিরোধীতা করেননি মার্কস।

সুতরাং, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ ও বিলোপ এবং জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার যে সমার্থক নয়, বা পুঁজিবাদ বিরোধীরা যে জাতীয় মুক্তি পন্থী নয়, বলেই মার্কসরা পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া অবস্থা-ব্যবস্থা, ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইস্তাহার সহ তাদের নানান গ্রন্থ-নিবন্ধে যেমন লিখেছেন, তেমন পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার অনুমোদক হয়েও কখনো পুঁজিবাদী ছিলেন না বলেই কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচয়িতাদ্বয় প্রকৃতই কমিউনিস্ট ।

উপরন্ত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান না ঘটিয়ে দেশ বিশেষের তথাকথিত স্বাধীনতা বা মুক্তি অর্জন যে, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কোন ধরণের কল্যাণ বয়ে আনে না, তাতো- বিগত শতকের তথাকথিত স্বাধীন-মুক্ত ও নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাকালেই স্বার্থান্ধ ও সুবিধাভোগীরা ছাড়া আর সকলেই সহজেই দেখতে ও বুঝতে পারবেন। কাজেই- "স্বতন্ত্র জাতি" বা " পরস্পর নির্ভরশীল জাতি" এমন শব্দ যে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখতে পারেন না বা তারা যা লিখেছেন, তার বংগানুবাদ যে, বর্ণিত শব্দে প্রকাশিত হতে পারে না, তাওতো প্রমাণিত।

এবারে আমরা ফিরে যাবো, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উপরোদ্ধৃত অংশের বাকী অংশের দিকে-

ক-ই(ম) - " সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সকল, এমনকি অসভ্যতম জাতিদেরও টেনে আনছে সভ্যতার আওতায়। যে ভারী কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, বর্বর জাতিদের একরোখা বিজাতি বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হল তার পণ্যের সস্তা দর। অন্যথায় বিলুপ্তির ভয় দেখিয়ে সকল জাতিকে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী গ্রহণে তারা বাধ্য করে; বাধ্য করে সেই বস্তু চালু করতে যাকে তারা বলে সভ্যতা- অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁর নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে। গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে (কিন্তু, এখানে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দটি হচ্ছে - " rescued", যার অর্থ ঢাকার বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত অভিধান অনুযায়ী- "উদ্ধারকৃত"। তবে, দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি যেহেতু মস্কো হতে বাংলায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার হতে নেওয়া হয়েছে , তাই সেখানে যা মুদ্রিত আছে তাহাই অবিকৃতভাবে উল্লেখ করণে- " বাঁচিয়েছে" শব্দটিই বিবৃত হল। কাজেই, বন্দনীভুক্ত বক্তব্য ইস্তাহারের অংশ নয়। লেখক) গ্রাম্যজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধ-বর্বর দেশগুলোকে সভ্য দেশের, কৃষি-প্রধান জাতিগুলোকে বুর্জোয়া প্রধান জাতির, প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের উপরে নির্ভরশীল করে তুলেছে।

জনসমষ্টির, উৎপাদনের উপকরণের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জিভূত করেছে, উৎপাদন উপকরণগুলি করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তিকে জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ, আইন-কানুন, শাসনব্যবস্থা অথবা করপ্রথা

সম্বলিত স্বতন্ত্র কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে ঠেসে মেলানো হয় এক-একটা জাতিতে যাদের একই শাসনযন্ত্র, একই আইন সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণী স্বার্থ, একই সীমান্ত এবং একই শুল্কব্যবস্থা।

তার আধিপত্যের এক শতাব্দি পুর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করেছে তা সকল পুর্ববর্তী প্রজন্মের উৎপাদন শক্তির চেয়েও আকারে ও পরিধিতে অনেক বেশী বড়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ, চাষাবাসের জন্য গোটা এক একটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযাত্রার জন্য নদীর খাল কাটা, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে পুরো একটা জনসমষ্টির আবির্ভাব- সামাজিক শক্তির কোলে যে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল,

আগেকার কোনো শতক কি তার পূর্বাভাসটুকুও ধরতে পেরেছিল? ”

জীবন ধারণের উপকরণের অভাব হতে শ্রেণী বিভাজনের উদ্ভব হলেও উৎপাদনী উপকরণ ও জীবন ধারণের উপকরণের ব্যাপক প্রাচুর্য ঘটিয়ে মানব জাতিকে শ্রেণীহীন সমাজে উন্নীত ও উপনীত করার বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কে উপরোল্লেখিত ২ কিস্তির দীর্ঘ উদ্ধৃতির তাৎপর্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী মাত্রই যেমন যথাযথভাবে উপলব্দি করা আবশ্যক, তেমন পুরো বক্তব্যটি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা সমেত বুর্জোয়া সমাজের উত্থান-বিকাশ ও এর পরিধি-বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা তথা গোটা দুনিয়ার সকল মানুষকে একই অর্থনৈতিক বুনিয়াদের মধ্যে একত্রিত করে প্রত্যেক মানুষকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি বৈশ্বিক জালে আটক করে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে বেঁচে থাকার বস্তুগত শর্ত তৈরী করে সাবেকী প্রকৃতি নির্ভরতার পরিবর্তে সমাজের উপর নির্ভরতার শর্ত সৃষ্টি করেছে, তা কমিউনিস্ট মাত্রই বিবেচনা না করার সুযোগ নাই।

সূর্যের আলো-তাপ ও খরা-বন্যা বা গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্ভর তথা প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ও হস্ত শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনী ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে পালাক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে ২৪ ঘন্টাই উৎপাদন সংঘটনের বিহীতাদি সম্পাদনের মাধ্যমে রাত-দিনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎসগুলির বহুমুখি ব্যবহার এবং হাইব্রিড বীজ-সার বা রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে এমনকি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যেমন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করেছে, তেমন কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য পূর্বেকার সময়সীমা ক্রমেই হ্রস্ব হতে হ্রস্বতর করেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক বিস্তার সাধন করে মানুষের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনের ক্ষমতা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী । প্রকৃতি বিজ্ঞান সমেত যন্ত্র-পুরকৌশল ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সমানতালে পাল্লা দিয়ে উন্নত ও বিকশিত হয়েছে। ফলে- মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ আমুল পাল্টিয়েছে ও গড় জীবনকাল বর্ধিত হয়েছে। কাজেই, পুঁজিবাদী অর্থনীতিই মানুষকে প্রকৃতির প্রাকৃতিক শোভন সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা ও ক্ষুদ্রতা হতে মুক্ত করেছে।

প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ তথা ভূমির সাথে আট-ঘাটে বাঁধা বলে ভূমিপতির- পা, আর চাষীর মাথা, একই রেখায় থাকাই চাষীর বেঁচে থাকার চিরকালীন শর্তে ভূমিপতিকে দেয়, খাজনা-বেগারী সমেত প্রভু গণ্যে দাসানুদাসের শ্রদ্ধাবনত সম্পর্কের শিরোধার্য

জমিদারদের ভজন-পূঁজন বা তদানুরূপ আচার-আচরণ তথা ভূমিপতি ও ভূমিপতির স্থায়ীত্ব, চিরন্তনতা ও ন্যায্যতার ফতোয়াদাতা পরজীবী গয়রহ কথিত বুদ্ধিজীবী-জ্ঞানী গুণি গোষ্ঠীর দয়া-দাক্ষিণ্য যাঞ্চায় অনুরূপ ফতোয়াদাতা জ্ঞানী-গুণি ভন্ডদেরসহ অধিপতির গোত্রের পা ধরে সেলাম-কদমবুচি সমেত নির্ঘাত অসুস্থতার কারক ও স্বাস্থ্যহানির বিষসম জারক কথিত 'চরণামৃত' পান-সেবন ও সাষ্ঠাংগ প্রণাম ও প্রণামী প্রদানের নানান জাত-পাতের ভাগ-বিভাজনের সূচি-অসূচির ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য দাসগোত্রীয় শ্রেণীর আজন্ম দুর্দশার অনঢ়-অচল জীবন ব্যবস্থার নানান ধরণ-বর্ণের শ্রেণী ব্যবস্থার বিলীন-বিলোপ করা ব্যতীত শিল্প-কারখানার প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়া যেমন সম্ভব ছিল না, তেমন উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটানো যেমন আবশ্যক এবং সেজন্য যেমন প্রাকপুঁজিবাদী সমাজ ভাংগা-চুরমার করাটা ছিল এক ঐতিহাসিক আবশ্যকতা-অনিবার্যতা তেমন উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহ করা ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার জন্য জঘন্য সামাজিক প্রথাবিশেষ তথা সূচি-অসূচি ও অসূচিতা বা পরস্পরের ছোঁয়াছুয়ির বা ছায়া মাড়ানির দুষণীয় রূপ মুল্যবোধের, যে সকল কুসংস্কার ও কুসংস্কৃতি বহু বছর যাবৎ জারী রেখেছিল প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতিরা , এমনকি অধিপতিরা মরে গেলেও তাদেরেকে জীবৎগণ্যে প্রণাম ও প্রণামী প্রদানের নিমিত্তে, তাদের জন্ম-মৃত্যু দিবসে নানান পূঁজা-অর্চনা ও ভজনার ঘৃণ্য রীতি-নীতি ও প্রথা চালু ও বহাল রাখার জন্য ঐ সকল রাজ-রাজা নামীয় দেব-দেবতার মূর্তি বানিয়ে সে সকল মূর্তিকে অস্পৃশ্য-দাসদের জীবন্ত উদ্ধারকর্তা,বিপদতারিণী ও ত্রাণকর্তা এবং জীবনদাতা ও জীবন রক্ষক প্রতিপন্নে সর্বকালীন ক্ষমতাবান-কর্তৃত্ববান সাজিয়ে রাখার বিহিতাদির জঘন্য সামন্ত ও বর্বর এশিয়াটিক সমাজ, বিলুপ্ত করা ছাড়া পুঁজিবাদের গত্যান্তর ছিল না, বলেই ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নয়, বরং প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদী উৎপাদনী উপকরণই বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধ্য করেছিল অতীতের অন্ধত্ব - অজ্ঞতা ও মূঢ়তার অনঢ়-অচল বৃক্ষ সুলব সমাজ বিলোপ ও বিলীন করার জন্য অর্থাৎ প্রাক পুঁজিবাদী সমাজকে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই দিতে সংঘটিত সমাজ বিপ্লব সাধনে বুর্জোয়ারা ইতিহাসের এক অবচেতন হাতিয়ার বিশেষমাত্র।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অতীতের উৎপাদনী সীমাবদ্ধতার ও স্থিরতার বিপরীতে এক অসীম ও বিপুল-বিশাল পরিমাণের উৎপাদনী ব্যবস্থাই কেবল নয়, বরং একই সংগে উৎপাদনী উপকরণের বিরতিহীন পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটিয়ে তথা জ্বালানী-বাস্প, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রম উন্নতি সাধন করে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কের মধ্যেও নিত্যই পরিবর্তন সাধন করেছে।অতীতে যা- ছিল অন্ধআবেগ, তাকে আলো ও যুক্তির মুখামুখি করেছে পুঁজিবাদ। ফলে- ছিঁড়ে গেছে অতীতের সকল স্বশ্রদ্ধ সম্পর্ক এবং ক্রমেই তিরোহীত হয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা, শৌর্যবৃত্তি ও কুপমন্ডকতার ভাবালুতা। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে পরিণত করেছে কেবলই নগদ দেনা-পাওনার ভিত্তিতে। দাসত্বের অনুশাসন-তথা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অন্ধাবেগের চাদরে ঢাকা, ইতো:পূর্বেকার শোষণের বদলে বা শোষণ ব্যবস্থায় কোন প্রকার রাখ-ডাক না রেখে খোলাখুলি, নির্লজ্জ ও জঘন্য শোষণকে প্রকাশ্য রূপ দিয়েছে বুর্জোয়ারা। বুর্জোয়া শ্রেণীই উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিতিতে আমেরিকা-ভারত ভ্রমণ-দখল করে ইত:পূর্বেকার অজ্ঞাত দুনিয়াকে

আবিস্কার-জ্ঞাত ও একত্রিত করেছে। ফলে- স্থানীয় ও স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির সাবেকী সকল ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে সমগ্র পৃথিবীকে কেবল একটিমাত্র অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন করেছে। তাতে, অতীতের সকল জাত-জাতি ইত্যাদি ক্রমেই মিলিয়ে যাওয়া সমেত জাতিগত সংকীর্ণতা-একদেশদর্শীতা বিদুরীত হয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ব বাজার ও সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব সাহিত্য।

কাজেই, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগত গড়ে তোলে। এরূপ জগত গড়তে গিয়ে বুর্জোয়ারা অতীতের সকল শিল্প ইত্যাদি ধ্বংস করেছে। অনুরূপ ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্ট বুর্জোয়া অর্থনীতির অধিকর্তা বুর্জোয়া শ্রেণী- হেন কোন জঘন্য কর্ম নেই যা করেনি। অর্থাৎ শ্রম শক্তি শোষণ, হত্যা-খুন, ভয়-ভীতি, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-জবর দখল,চোরাচালানি-কালোবাজারী, মজুতদারী-মুনাফাখোরী,সন্ত্রাস-চালবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি, জোচ্চুরি-ঠগবাজি, প্রতারণা-জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, প্রলোভন-প্ররোচনা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অত্যাচার-নির্যাতন সমেত এমন যা কিছু ঘৃণ্য কার্যাদি মানবজাতির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা যায় তার সবই করেছে। তবু, মানব জাতির ইতিহাসের তুলনামূলক বিচার-বিবেচনায় ও কালিকতার নিরিখে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সমেত উৎপাদনী ব্যবস্থার উন্নয়নসহ খোদ উৎপাদনের মাত্রা প্রসারিত করার কারণেই বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজ বিকাশের যাত্রা পথে খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল।

সমাজের বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে স্বার্থান্ধ ও লোভোন্মত এবং হিংসাশ্রয়ী বুর্জোয়া শ্রেণী যে সকল ঘৃণ্য ক্রিয়াদি করেছে তা সংঘটন ছাড়া অন্ধত্ব, অজ্ঞত্বা, মূঢ়তা ও দাসত্বের তথা প্রকৃতি শোভন-পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলোপ সাধন সম্ভব ছিল কিনা, সে বির্তক এখন অসার।

ডিভাইন রাইট হোল্ডার রাজ-রাজা ও রাজপুত্রদের মৌরশী পাট্টার রাজসিক অসভ্য জীবনাচার সমেত বর্বর রাজতন্ত্রের সমর্থক-রক্ষক পরজীবী গোষ্ঠী তথা রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা ও চিরন্তনতার পক্ষে প্রচার-প্রসারে জগত-জীবন এবং জাগতিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বানোয়াটি মূলে পরজীবীদের স্বার্থান্ধতায় রচিত অসত্য-মিথ্যা বিবরণ-বক্তব্যসহ তাবৎ অজ্ঞতা-অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের রীতি-নীতি যা- ধর্ম নামে চালু ও জারী, আসলে দাসতান্ত্রিক -রাজতান্ত্রিক রাজনীতি, তাকেই সুকৌশলে ও চালাকির মাধ্যমে বলা হয়েছিল দৈববাণী বা অলৌকিক শক্তির নির্দেশিকা। সেই অলৌকিকতার বিপরীতে লৌকিকতা বা ইহলৌকিকতার রাজনীতি অর্থাৎ পরলৌকিক পরম কর্তৃত্বের কর্তৃত্ববলে নয় বা চিরন্তন ক্ষমতার ডিভাইন রাইট হোল্ডারও নয়, বা সেই সুবাদে কেবলই জন্মসূত্রে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসাবেও নয়, বরং, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামো অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্র যেমন ইহলৌকিক তেমন ইহলৌকিক কার্যাদির নিমিত্তে সৃষ্ট রাষ্ট্র, পরিচালনায় চিরকালীন নয়, কেবলই খন্ডকালীন সময়ের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী বা প্রয়োজনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবে শাসকমন্ডলী; এবং শাসক শ্রেণীর স্বার্থে শাসক মন্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইন-বিধি দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

যদিচ, শ্রমিকের শ্রম শক্তি শোষণের মাধ্যমে সৃষ্ট পুঁজি বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী জন্মসূত্রেই এবং আজন্মই শোষক, অসৎ, দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজ। তাই স্বীয় শ্রেণী চরিত্র ও স্বার্থানুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী আইন করে কেবলই তা ভাংগার জন্য। তবু, অলৌকিক শক্তির নির্দেশিকা

নয়, বরং পরজীবী রাজন্যবর্গ রাজকীয় পরজীবীতার হীন স্বার্থে বানোয়াটি মুলে সৃষ্টি ও চালু করেছিল ইহলোক ও পরলোকের কল্পিত মহাক্ষমতাধর মহাশক্তির যাবতীয় পরলৌকিকতার গাল-গল্প এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের অংশীদার দাবীতে ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বলীয়ান এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট রীতি নীতি ও নৈতিকতার রক্ষক-সংরক্ষক সাজিয়ে তদানুরূপ আইন-কানুনকে ঐশ্বরিক বিধি-বিধান বলে জারী ও চালুকৃত নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বা সংস্কৃতি বা বিধি-বিধানের স্থলে ও বিপরীতে -ঈশ্বর নয়, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিও নয়, বরং খাস ও খোদ মানুষ কর্তৃক রচিত আইন-বিধান দ্বারা মানুষের সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি- ইহলৌকিকতা তথা সেক্যুলারিজমের উদ্ভব ও বিকাশের স্রষ্টাও বুর্জোয়া শ্রেণী।সুতরাং, পরলৌকিকতার ধর্মকে তাড়িয়ে ইহলৌকিকতার নীতি প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবেও বুর্জোয়ারা ইতিহাসের প্রগতিশীল-বিপ্লবী শ্রেণী।

যদিচ, এই বুর্জোয়া শ্রেণীই কালে কালে তাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় উপনীত হয়ে তাদেরই সৃষ্ট, তবে বৈরীতার সম্পর্কাধীন অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজেরই অস্থিত্ব রক্ষায় আবশ্যকীয় শ্রমিক শ্রেণীর মুখোমুখি হয়ে বিপদাপন্ন-বিপন্ন ও উচ্ছেদ-উৎখাত হওয়ার মতো দুর্যোগপূর্ণ দুরাবস্থায় পড়ে, খোদ শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করার জন্য বা শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী চেতনা হতে সুকৌশলে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি গঠনে ও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ লাভের ব্যক্তিমালিকানা সম্পর্কে তথা জাগতিক বিষয়সমেত সমাজ জীবন সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীকেই তাবৎ ভুল-ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা-কুসংস্কারে আবিষ্ট-মোহাবিষ্ট করে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক মুল্যবোধে নিপতিত ও নিমজ্জিত করার বদ খেয়ালে ও তদ্রুপ দুরভিসন্ধিতে আবারো দাসত্বের রাজনীতির রক্ষক-সংরক্ষক রাজনীতি তথা দৈববাণীর দেবতাদের প্রতি আনুগত্যের আচার-আচরণ তথা ধর্মকে নতুন রূপে নতুনভাবে দুনিয়ায় উপস্থাপন করছে । এমনকি, জগত ও জীব সম্পর্কে বা জাগতিকতা ও জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বা উৎপাদন ও ভোগ-বন্টন সম্পর্কে এক ঈশ্বরবাদী ও বহু ঈশ্বরবাদীদের মৌলিক দৃষ্টিভংগি একই ধরণের হলেও বা ক্ষেত্র বিশেষ তদমর্মে কারক ও কারিকা বিষয়ে কিঞ্চিত তারতম্য হলেও তাদের আচার-আচরণে বা রীতি-নীতি বা পুঁজন-ভজনে নানান পার্থক্য ও ভিন্নতা বিদ্যমান। তৎসত্ত্বেও ধর্মীয় সংস্কার সহ সকল ধর্মাবলম্বীকে একই ধর্মের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নিজেদের মতো করে ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে বা তদানুরূপ উপস্থাপন করতে বা তদার্থে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টিতে কার্পণ্য করেনি বুর্জোয়ারা।

এমনকি, এক্ষেত্রে বাদ যায়নি ভারতীয় বুর্জোয়াদের অগ্রগামী, বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগি ও সহচর এবং একমাত্র ভারতীয়- যিনি, কোম্পানীর সর্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ৫০০ টাকার চাকুরে, যদিও দুর্নীতির অভিযোগে চাকুরী ত্যাগী এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন চীনে আফিম চালানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, তখন, স্বীয় কোম্পানীর প্রক্সিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আফিম চীনে পাচার করে বিপুল পরিমাণ পুঁজির মালিক বনা,এবং বাংগালী বা ভারতীয় ম্যানেজার নিয়োগে জমিদারীর খাজনা কম আদায় হতে পারে আশংকায়, এমত ক্ষতির সম্মুখীন হতে না চেয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত জমিদারী প্রাপ্তির, ভারতের মধ্যে একমাত্র জমিদার, যিনি চাষীদেরকে সর্বাধিক মাত্রায় শোষণ করার জন্য স্বীয় জমিদারীর ম্যানেজার নিয়োগ করেছিলেন জনৈক

ইংরেজকে; এবং যিনি, নীল চাষ সমেত বিরাট জমিদারী প্রতিষ্ঠা এবং শিপিং-ব্যাংকিং ও বীমা সমেত নানান ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ভারতীয় কংগ্রেসের ফোররানার ইন্ডিয়ান ল্যান্ডহোল্ডার এসোসিয়েশন ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা করে নিজেই ঐ সমিতির প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, এবং তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে ও রাজনৈতিক কার্যাদিতে ইংরেজ বেনিয়াদের সর্বরকম সাহায্য-সহযোগিতা করে নিজের মানি ল্যান্ডার পূর্ব প্রজন্মের আর্থিক ভিত্তিকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে স্বীয় খ্যাতি-সুনামের প্রসার ঘটিয়ে, এমনকি ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরীয়ার বিশেষ পেয়ারের লোক হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন, কলকাতার সেই প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুরের পুত্র এবং প্রায় পৌণে তিনশত বছরের জনশোষক পরিবারের বিশাল পরিমাণ জমিদারীর তদারককারী হিসাবে বৃটিশের নাইট উপাদি প্রাপ্ত ও বুর্জোয়াদের অসৎ রাজনীতির উদ্দেশ্যে দেয় তথাকথিত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের পিতা- দেবন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত ব্রহ্ম ধর্ম সহ সমগ্র দুনিয়ায় এমন বহু ধর্মের জন্ম দিয়েও বুর্জোয়ারা, অস্তিত্ব সংকটের সমস্যা হতে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে না পেরে, আদি ধর্মগুলোকেই যতভাবে সম্ভব পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও প্রয়োজনে জংগীরূপ দিয়ে হতদরিদ্র শ্রেণীকে দুনিয়াদারী নয়, পরলৌকিক জীবনের ভুয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন ও প্ররোচনায় বহু ধরণের ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমেত নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সংগঠন ক্রমাগত গড়ে তুলছে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের শত্রু। কেননা- ধর্ম, ইহলৌকিকতার বিষয়াদিকে ভুয়াভাবে পরলৌকিকতার অধীনস্ত করে, বিজ্ঞান- ইহলৌকিক; ধর্ম- অন্ধত্ব ও অজ্ঞতার ভান্ডার, এবং কেবলই ভুয়া বিষয়ে কেবলই বিশ্বাসের বিষয়, বিজ্ঞান- যুক্তি তর্ক ও প্রমাণ সাপেক্ষ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর নিখুঁত অভিজ্ঞতা; ধর্ম- ভাব নির্ভর, বিজ্ঞান- বস্তু নির্ভর; ধর্ম- মৌলিক বিষয়েও প্রশ্নের বিরোধী, বিজ্ঞান-প্রশ্নহীনভাবে কোন বিষয় গ্রহণে অস্বীকৃত; ধর্ম - অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিজ্ঞান-আলোকিত; ধর্ম- মূঢ়তার পরিপোষক, বিজ্ঞান-জ্ঞান ভান্ডার; ধর্ম- স্থির ও অনঢ়, বিজ্ঞান- সদা পরীক্ষার মুখোমুখি-চলমান-গতিশীল ও নতুন সত্য গ্রহণে সদা প্রস্তুত; ধর্ম -কার্যকারণের বানোয়াটি ও একই ফর্মেটের বা পূর্বারোপিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, বিজ্ঞান- যথাযথ বস্তুগত তথ্য-সূত্র উদ্ঘাটন ও আবিস্কার এবং সেমতো বস্তুগত বিষয়কে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে; ধর্ম-কল্পনা প্রসূত-অসত্য, বিজ্ঞান- বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য; ধর্ম-বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপিত, বিজ্ঞান- সত্যান্বষণে সদা নিরত ও ক্রিয়াশীল এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত ও সকলের কল্যাণে নিয়োজিত; ধর্ম-মানুষের চিন্তা শক্তি ও চিন্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত-বিঘ্নিত ও অবশ-ভোতা করে, বিজ্ঞান- মানুষের চিন্তা শক্তি ও চিন্তন প্রক্রিয়াকে প্রসারিত-প্রস্ফুটিত, সুতীক্ষ্ণ-চৌকশ ও নিখুঁত করে; ধর্ম-মানুষকে উন্মত্ত করে, বিজ্ঞান- মানুষকে প্রশান্ত করে; ধর্ম- মানুষকে হিংস্র ও বিদ্বেষী করে, বিজ্ঞান- মানুষকে সামাজিক বোধ-বুদ্ধি, কল্যাণ-শান্তি ও ভালোবাসায় আগ্রহী করে; ধর্ম-ব্যক্তির মর্যাদা অস্বীকারকারী, বিজ্ঞান- প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা সুরক্ষায় কার্যকর; ধর্ম- মানুষকে বিভাজন করে, বিজ্ঞান-মানুষে মানুষে বিভাজনের দরজা বন্ধ করে; ধর্ম- জীব ও জাগতিক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যাদানে অক্ষম, বিজ্ঞান- জীব- জগত ও জাগতিক বিষয়ে প্রকৃত ব্যাখ্যা বৈ ভুল বক্তব্য প্রদানে অক্ষম; ধর্ম-মানুষকে সংকীর্ণ করে, বিজ্ঞান-মানুষকে উদার করে; ধর্ম -

মানুষকে অলৌকিকতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, বিজ্ঞান-মানুষকে লৌকিকতার পক্ষে-অনুকূলে নিয়ে যায়; ধর্ম-মানুষকে গোঁয়ার করে, বিজ্ঞান- মানুষকে যুক্তিশীল করে; ধর্ম-দেবতা নির্ভর, বিজ্ঞান- মানুষের শক্তি-ক্ষমতায় আস্থাশীল; ধর্ম- বিশ্বাসের ঘেরাটোপের আবরণে আবদ্ধ থেকে যেমন জগতকে , তেমন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে একপাক্ষিক ও অন্ধভাবে দেখতে বাধ্য করে, বিজ্ঞান- খোলা চোখে খোলাভাবে সব কিছু অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ককে দেখতে-বুঝতে ও নির্ধারণে মানুষকে সচেতন- উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে; ধর্ম-মানুষকে ভাব প্রবন করে অন্ধত্বের পথে নিয়ে যায়, বিজ্ঞান-মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে আলোর দিকে নিয়ে যায়; ধর্ম-মানুষকে তার স্বীয় অবস্থা-অবস্থান সমেত পারিপাশ্বিকতাকে বুঝতে কেবলই অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে বলে। তাই- ধর্মীয় ভাবাবেগ-আবেশে আবদ্ধ মানুষ- যেমন নিজেকে চেনে না, তেমন জাগতিক বিষয়েও জাগতিক বা প্রকৃত তথ্য-তত্ত্ব ও সূত্র জানতে পারে না বলেই জীবন-জগত ও জাগতিক বিষয় সম্পর্কে কেবলই অবাস্তব মতামত ও ধারণা পোষণ করে বলে, যেমন নিজের সাথে অপরের, তেমন অপরের সাথে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে না বলে স্বীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি বিষয়ে কেবলই ভুল ধারণায় বন্দী থেকে বাস্তবের জীবনকে হারায়। অথচ, জীবন বাস্তব বলেই বাস্তব জীবনের চাহিদার সাথে ধর্মীয় বোধের সংঘাত-সংঘর্ষে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সমেত আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে, জাগতিক জীবনের চাহিদা পূরণে অক্ষম-অযোগ্যতায় চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে কখনো কখনো সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয় , বিজ্ঞান-মানুষকে সব কিছু খোলাখুলিভাবে দেখতে ও জানতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে বলে বিজ্ঞানী মানুষ যেমন নিজেকে চিনে, তেমন নিজের সাথে অপরের ও অপরের সাথে নিজের সম্পর্ক সমেত, প্রকৃতির সাথে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক, নির্ধারণ করতে পারে বলেই জাগতিক ব্যবস্থার জাগতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিষয়ে খুব একটা হতাশায় ভোগে না বলে মানসিকভাবে সুস্থ থাকে; ধর্ম-মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হতে ও প্রকৃতির দাসত্ব মেনে নিতে বলে, বিজ্ঞান-মানুষকে প্রকৃতি জয়ে প্রেরণা ও প্রণোদনা দেয় ; ধর্ম- পরিবর্তনশীলতাকে মানতে অপরাগতা প্রকাশ করে, বিজ্ঞান- পরিবর্তনশীলতাকে স্বাগত জানায়; ধর্ম-মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, বিজ্ঞান-মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে; ধর্ম-মানুষকে ভীতু ও ভীরু করে, বিজ্ঞান- মানুষকে নির্ভয় ও নির্ভীক করে; ধর্ম-ভিন্নমত ও পরমত দলন ও পীড়নকারী, বিজ্ঞান- পরমত সহিষ্ণু; ধর্ম-মানুষকে যুগপৎ প্রভুত্ব ও দাসত্বের ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত রাখে, বিজ্ঞান- মানুষকে স্বাধীন ও মুক্ত হতে উদ্বেলিত ও উন্মুখ করে; ধর্ম-মানুষকে পরলৌকিকতার মধ্যে ইহজাগতিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ও অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি তথা নির্বিচার ভোগ-সম্ভোগের প্ররোচনা দেয়,বিজ্ঞান-ইহলৌকিক সমস্যা ও বিষয়কে ইহলৌকিকতার মধ্যেই ইহলৌকিকভাবে সমাধা ও সম্পন্নকরণে মানুষকে সচেতন-উদ্বুদ্ধ করে; ধর্ম- কেবলই নিয়ম-নীতির নিগড়ে মানুষকে আবদ্ধ করে রাখে, বিজ্ঞান- বস্তু ও বস্তুজগতের নিয়ম উদ্ঘাটনে সদাক্রিয়াশীল ও বস্তুগত বা জাগতিক নিয়মে জীবনাচারের প্রগতির পথে মানুষকে ক্রমাগত এগিয়ে নেয়; ধর্ম-অতীতের বিষয়, বিজ্ঞান- আবহমানকালের; ধর্ম-স্থবির, প্রতিক্রিয়াশীল, বিজ্ঞান-গতিশীল,প্রগতিশীল ও বিপ্লবী; ধর্ম -মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর, বিজ্ঞান- কল্যাণকর; ধর্ম-পরিত্যাজ্য, বিজ্ঞান-অপরিহার্য্য।

ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লেখিত রূপ মতামত পূর্বাপর দিয়েছেন বহু বুর্জোয়া দার্শনিক-যুক্তিবিদ, আইনবিদ-রাজনীতিবিদ, মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানী, এবং সাম্য প্রত্যাশী সমাজতান্ত্রিক মানুষেরা । উইকিপিডিয়ার তথ্যানুসারে- "Into the Universe, with Stephen Hawking". Discovery Channel. 2010. http://dsc.discovery.com/tv/stephen-hawking/about/about.html. Retrieved 25 April 2010. ”

বিজ্ঞানী হকিন্স বলেছেন-

"There is a fundamental difference between religion, which is based on authority [imposed dogma, faith], [as opposed to] science, which is based on observation and reason. Science will win because it works.”

একই সূত্রে বিবৃত আছে হকিংস তাঁর *A Brief History of Time*: নামক বইয়ে বলেছেন-

" God was unnecessary to explain the origin of the universe.” and [55]

His 2010 book *The Grand Design* , Hawking wrote as: "The question is: is the way the universe began chosen by God for reasons we can't understand, or was it determined by a law of science? I believe the second." He adds, "Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself from nothing."[57][58]

তাছাড়া- ঈশ্বরকে মানবকল্পিত রূপক হিসাবে চিহ্নিত করে স্বর্গ-নরকের ধারণাকে খারিজ করে মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে কেবলই জীবনকে উপভোগ্য করার তাগিদ সম্পন্ন যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ানে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার- “ হকিংয়ের দাবি মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই” শিরোনামে , প্রথম পাতার প্রথম সংবাদ হিসাবে গত ১৭মে-২০১১ সালে প্রকাশ করেছে ঢাকা হতে প্রকাশিত দৈনিক কালের কণ্ঠ।

তবু, পুঁজিবাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিকে ধর্মের আবরণ পরানোর প্রাণান্তকর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। আজকের যুগে অর্থাৎ বুর্জোয়া সভ্যতার আবিস্কৃত-উদ্ভাবিত আধুনিক যন্ত্রপাতি, দুরবীণ-ক্যামেরা, লাইটার-টর্চ, মুদ্রণযন্ত্র-এক্সরে মেশিন, বিদ্যুৎ-সৌর জ্বালানী প্লান্ট, জাহাজ-মটরগাড়ী, রেল-বিমান, রেডিও-টিভি, ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার-ফটোকপিয়ার,সেটেলাইট-মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সমেত তথ্য-প্রযুক্তিগত হালের নানাবিদ সুযোগ-সুবিধাসহ শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধনে বা মানুষের দীর্ঘজীবন লাভ সমেত প্রায় অমরত্বের সাম্ভাব্য সুবিধাদি কেন প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ তথা ধর্মীয় যুগ দিতে পারলো না, এসকল প্রশ্ন, এমনকি-পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি বা সৌরজগতের উত্থান-পতন বা জীব জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্মের ব্যাখ্যা যে, সম্পূর্ণত ভুল-ভ্রান্ত -তার সদোত্তর যেমন ধর্ম- দিতে পারে না, তেমন বিজ্ঞানকে কবুলও করতে পারছে না।

অথবা, পুঁজিবাদী সমাজের সৃষ্ট উপকরণগুলোর উদ্ভাবন কেন, প্রাক-পুঁজিবাদী যুগে হ'ল না, তার সদোত্তরও প্রাক পুঁজিবাদী রাজনীতি তথা ধর্ম দিতে পারছে না, অথবা, এমনকি, মহাজগতের জন্ম সম্পর্কে বিজ্ঞান যা বলছে, বা মহাজগতের ব্যাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলই যে, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ভিত্তি ও সহায়ক সেটি অস্বীকার করতে না পারলেও, সেসকল বিষয়কে স্বীকার না করে নানান আবোল-তাবোল বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে ধর্মবেত্তারা। পুঁজিবাদে নেতা আছে, দেবতা নাই বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগী, বিশেষ প্রতিভার পুরোহীতের আবশ্যকতা নাই বলেই, ঈশ্বরের আইনের পরিবর্তে মানুষের সৃষ্ট আইন দ্বারা মানুষ পরিচালিত-নিয়ন্ত্রিত হবে এবং পরিচালক বা শাসন কর্তৃত্বের কর্তারাও নির্বাচিত বৈ দৈববলে বলীয়ান নয়, এমন বিধানই প্রস্তুত করেছিল বুর্জোয়া বিপ্লব।

অথচ, প্রাক পুঁজিবাদী সমাজতো পরিচালিত হ'ত স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক ও ঈশ্বরের আত্মজ বা অংশ বা কৃপাধন্য দেব-দেবতা রূপী রাজ-রাজন কর্তৃক; এবং অপরাপর রাজা-বীর কর্তৃক বেদখল না হলে, সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ-দখল করত, ঈশ্বরের নাতি-পুতিরাই। তবু, ঈশ্বর কেন তার আত্মজ-অংশ বা অনুগৃহীত দেব-দেবতা রূপী রাজন্যবর্গকে আজকের সাধারণ মানুষও যে ধরণের সুযোগ-সুবিধা পায় সে ধরণের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলো না; বরং পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে ও পুঁজিবাদী সুযোগ-সুবিধায় যাদের কঠোর অনুসন্ধানী প্রচেষ্টা ও শ্রমে এমনকি, পৃথিবীর পরিসর ও সৌর মন্ডলীতে পৃথিবীর অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্ক জানা সহ আজকের যুগের সকল সুযোগ-সুবিধার পত্তন হয়েছে, সেই সকল অনুসন্ধানী-সত্যান্বেষী, সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্য নিষ্ঠ- মানুষজন,যেমন- ব্রুনো,সেভৎ প্রমুখ বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার দায়ে পুড়িয়ে মেরেছে, বা গ্যালিলিউকে দন্ডিত করেছে, খোদ ধর্মের রক্ষক ক্যাথলিক চার্চ। কিন্তু, প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমন তাতে থেমে থাকেনি, তেমন বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাও, খোদ পুঁজিবাদী মালিকানার শিকলে আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ থাকলেও, ক্রমেই ব্যক্তি মালিকানার অনুরূপ শিকল ভাংগতে পিছ পা হচ্ছে না। মাইক ব্যবহার করা বা ছবি তোলা ইত্যাদিকে, যারা- অপরাধ গণ্য করতো, ধর্মের সেই সকল ধামাধরারা, নিজেরাই এখন, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানাদিতে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রায় সকল উপকরণাদি ব্যবহার করে থাকে।

চরম ও উভয়সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি সৃষ্টি ও ব্যবহার না করে, নিজেই টিকে থাকতে পারছে না; আবার, পতনসীমায় উপনীত পুঁজিপতি শ্রেণী, ব্যক্তিমালিকানা রক্ষার অপচেষ্টায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাকেও স্বীকার করতে পারছে না। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী কম-বেশ, প্রায় সকল ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। সভ্যতার প্রতিবন্ধক, কুপমন্ডক পুঁজিপতিদের ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরাই, হাস্যকরভাবে বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির আবিস্কার বিষয়ে যুক্তি-তর্কহীন ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েই যাচ্ছে। সেজন্য নতুন ধর্মের প্রবর্তন সমেত ধর্মেরও নানান রকমের সংস্কার করতে তারা পিছ পা হচ্ছে না । প্রকৃতপক্ষে, মুল্য সৃষ্টিতে- শ্রমের গুরুত্বকে অস্বীকার করার হীনমানসে, বিজ্ঞানীদের শ্রমশীল কর্মকেও ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও দয়ায় প্রাপ্ত, বিশেষ বিশেষ প্রতিভা-মেধাবীর মেধাবী কর্মরূপ শব্দের বোতলে ভরে সাহিত্যসম্ভার নামীয় আবর্জনা হিসাবে পরিবেশনা করছে। যদিচ, তারা মনেই রাখে না

যে, পুঁজিবাদী বৃহদায়ন শিল্পই,বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর বা দেবতা ইত্যাদি রূপ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের যুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক শিল্পের কর্মক্ষেত্রেই মানুষকে কেবলমাত্র শ্রমশীল মানুষ হিসাবে গণ্য করার মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে চালু থাকা, ইতো:পূর্বেকার ম্যানুয়েল ও ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্কের ফারাককে ক্রমাগত শূন্য পর্যায়ে নামিয়ে এনে, পুঁজিবাদী উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় শ্রমক্ষমতা-যোগ্যতায়, মানুষে মানুষে বৈষম্য বিলীন করে, সাম্য বা সাধারণভাবে তদ্বিষয়ে যেমন সমতা স্থাপন করে, সকল বিষয়ে আবশ্যকীয় তথ্য-উপাত্ত জানা, তথা জ্ঞানার্জনে সমাজের সকলের সম সুযোগ লাভের সামাজিক সুযোগ সৃষ্টির সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল বৈষয়িক ও ম্যাটেরিয়াল শর্তাদি পূরণ করছে, তেমন অমন শিল্প অর্থনীতির সৃষ্ট বিজ্ঞানী আইনষ্টান-হকিংসরা নিজেরাই বলেন যে, তারা ঈশ্বরের বিশ্বাসী নয়। এমনকি, প্রচলিত সুযোগ-সুবিধায় তারা কেবলই অর্জিত বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ, ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নিখুঁত পরীক্ষণ এবং নৈব্যক্তিক পর্যালোচনায় নিবীড় অভিনিবেশে ক্রমাগতভাবে ও উপর্যপুরি শ্রম প্রদানে একান্ত নিষ্ঠার সহিত শ্রম শক্তি প্রয়োগ করেই তাদের বৈজ্ঞানিক কর্মাদির সৃষ্টি বা তদানুরূপ আবিস্কার-উদ্ভাবন করেছেন।

অর্থাৎ, যান্ত্রিক উৎপাদনী প্রক্রিয়াই, ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিভার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির, বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির সমূহ সুযোগ-সুবিধাদির অবসান ঘটিয়ে, সমাজ থেকে উর্দ্ধতন ও অধ:স্তন ব্যক্তির মধ্যেকার তফাত দুরীভূত করে,কেবলমাত্র শ্রম এবং শ্রমই, মুল্য স্রষ্টা, বলে বেঁচে থাকার সকল মৌলিক ও আবিশ্যীক উপকরণাদি উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সমাজের সকলেই শ্রম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, আবশ্যকীয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে বলে শ্রম আর কোন বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম তথা কর্ম হিসাবে গণ্য হওয়ার মতো অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজ থেকে শ্রম শক্তি বিক্রেতা ও ক্রেতার অর্থাৎ মজুরি প্রথার অবসান ঘটিয়ে সমাজের সকল মানুষের মধ্যেকার, সকল অসাম্য-বৈষম্য বিলীন-বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শ্রেণীহীন-প্রাচুর্যময়, দুশ্চিন্তামুক্ত ও এভার লাস্টিং শান্তির-সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সৃষ্টি করেছে বলেই একদা মানবজাতির একাংশ কর্তৃক অপরাংশকে, শোষণ-পীড়ন ও বঞ্চনার নিমিত্তে এবং জগত ও জীব সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞানাভাবে কেবলমাত্র বাহ্যিক দৃষ্টিতে জগত-জীবনকে দেখে, স্বীয় বদমতলবের স্বপক্ষে ও স্বীয় কর্তৃত্ব বলবত ও বহাল রাখার দুরভিসন্ধিতে, জগত-জীবনের স্রষ্টা হিসাবে বিশেষ বিশেষ ঈশ্বর ও বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অংশীদার বা আত্মজ বা ঐশ্বিরিক ক্ষমতা প্রাপ্ত, বলেই ঐ সকল চালাক-চতুর ও পরজীবী ব্যক্তিবর্গই, কেবলই বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের রক্ষক-সংরক্ষক হিসাবে বিশেষ বিশেষ মেধা-প্রতিভার অধিকারী বলেই অপরাপর দাস বা শ্রম শক্তি প্রয়োগকারী কেবলই বুদ্ধিহীন, প্রতিভাহীন, মেধাহীন ব্যক্তিরা, কেবলই গায়ে-গতরে খেটে মেধাবী-প্রতিভাধরদের, আহার-বস্ত্রাদি সমেত জীবন ধারণের সকল উপকরণ সহ বিলাসী উপকরণ যোগানো ও সরবরাহ করা সমেত নিজেরাই, আমৃত্যু মেধাবীদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতার নির্বোধ উপকরণ হওয়া ও সেমতো, দাসত্বমুলক ধারণা পোষণ ও অনুরূপ ধারণা স্থায়ী করার নিমিত্তে, বিশেষ বিশেষ প্রতিভাবান-মেধাবানদেরকে চিরকালীন ও অমর গণ্যে ও মান্যে- সেই সকল বিশেষ প্রতিভার ব্যক্তিবিশেষরূপী দেবতা- ওস্তাদদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতে তো বটেই, এমনকি দৈনন্দিন কাজ-কর্মেও এহেন পরজীবী বিশেষ প্রতিভার ব্যক্তিদেরকে পুঁজন-ভজন করার

সকল কুসংস্কার ও কুরীতি-নীতি এবং কুপ্রথা সমেত এমতধরণের সকল ঘৃণ্য কর্মাদি করার আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তাও যান্ত্রিক-বৃহদায়ন শিল্প অর্থনীতিই ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজন করে থাকে বলেই পুঁজিবাদী সমাজের বিলুপ্তির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজই মানুষে মানুষে বিদ্যমান সকল বৈষম্য-অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে, সমগ্র বিশ্বকে সকল রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক বেষ্টনী ও গন্ডীর আওতামুক্ত করে, সমগ্র ধরিত্রীর সকল সুযোগ-সুবিধার সমানুপাতিক অধিকার বিশ্বের সকলের, বলেই সাম্যবাদী সমাজে শোষণ-বঞ্চনার কোন অবকাশ থাকছে না বা তদানুরূপ চিন্তাও অবান্তর হেতু সাম্যবাদী সমাজে- যেমন বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তি বিশেষ সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন নাই তাই সাম্যবাদী সমাজে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কেবল অনাবশ্যকই নয়, বরং অকল্পনীয়ও বটে।

অত:পর, জীবন ধারণের উপকরণাদির অভাব হতে যেমন মানব সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, তেমন ঈশ্বর সমেত ঈশ্বরতন্ত্রের আবির্ভাব হয়ে প্রভু-দাস রূপী সমাজই প্রভু রূপী বিশেষ প্রতিভাবান-মেধাবী ও ক্ষমতাবানদের জন্ম দিয়েছে; সামন্ততন্ত্র -তা লালন-পালন করেছে। কিন্তু, পুঁজিবাদ ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, চার্চকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হতে উৎখাত করে পুঁজিপতিদের স্বার্থানুগ ইহলৌকিকতার রাজনীতি তথা গণতন্ত্রের জন্ম দিয়ে বিশেষ প্রতিভার প্রভুর স্থলে মেধাবী-ক্ষমতাবান নেতার জন্ম দেওয়ার কাহিনী প্রচার করেছে।

পুঁজিবাদই উৎপাদনী ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অতি প্রাচুর্য ঘটিয়ে, সেই প্রাচুর্যের তোড়ে বিপন্ন ও বিপদাপন্ন হয়ে পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে জন্ম দিবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সকল পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই উৎপাদনী উপকরণই নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। তবু, এই প্রথম, আধুনিক উৎপাদনী উপকরণের ব্যবহারকারী শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় ব্যাপক-বিশাল ও বিপুল সংখ্যক মানুষ হিসাবে স্বল্প সংখ্যক মানুষের শ্রেণী আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লব করছে।

কাজেই, এক্ষেত্রে, বিশেষ প্রতিভার মহান শিক্ষক, চিরন্তন ক্ষমতার পীর-পুরোহীত ইত্যকার ব্যক্তির আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা নাই; এবং সাম্য তথা দায়িত্ব ও কর্তব্যের নিরিখে অধিকার-এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত এক বৈশ্বিক পার্টির কার্যকর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও কার্যকরতার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে একই ধাঁচে গড়া পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত হবে বলেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ প্রতিভার বিশেষ মেধাবী বা তথাকথিত ক্ষমতাবান-যোগ্য নেতা বিশেষ নয়, কেবলই প্রয়োজন শ্রেণী চেতনায় সমৃদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক-সংরক্ষক মানুষ।

সুতরাং, মানব জাতির ইতিহাসে ' অভাব' জন্ম দিয়েছে, অলৌকিক ক্ষমতার বিশেষ প্রতিভার মেধাবী মহান শিক্ষক রূপী প্রভু, অবশিষ্ট মানুষকে করেছে প্রভুর গোলাম-সেবক। আর, প্রাচুর্য, পৃথিবী হতে বিদায় করছে সকল প্রভুর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব হেতু মানুষ কেবল মানুষ হিসাবে স্বীকৃত হবে। কাজেই, সাম্যবাদী আন্দোলনে বিশেষ প্রতিভার বিশেষ মেধার বিশেষ ক্ষমতাবান নবী বা পীর-পুরোহীতবিশেষ নয়, কেবলই শ্রেণী বিলুপ্তির শ্রেণীবোধ সম্পন্ন মানুষের- সংগঠন প্রয়োজন; এবং অনুরূপ সংগঠন পরিচালনা -সমন্বয়েও কেবলই মানুষ এবং মানুষ দরকার, যিনি, প্রতিনিয়ত কেবলই শ্রেণী বিলুপ্তির

শর্তে সক্রিয়ভাবে নিত্যই মানুষ হওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখবেন। কাজেই, দাস হওয়াটা ছিল মানবজাতির ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা, আর মানুষ হওয়াটা- **মানবজাতির ঐতিহাসিক অনিবার্যতা; এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার শর্ত এবং পরিণতি।**

উল্লেখ্য- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিণতিতে সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্রের মৌলনীতি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর কার্যত মানবজাতির মুক্তির সনদ তথা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালেই, আর ইংরেজ পুঁজিপতি শ্রেণীর সহযোগী ও সুবিধাভোগী বংগীয় জমিদার-কবি রবীবাবুর পিতা দেবন্দ্রনাথও পুঁজিবাদের সংরক্ষায় ঐ একই সাল অর্থাৎ ১৮৪৮ সালেই জন্ম দিয়েছেন ব্রক্ষ্ম ধর্মের এবং ভারত-বাংলাদেশের লেনিনবাদীদের শ্রদ্ধাভাজন-প্রিয়ভাজন রবিবাবু ছিলেন বটে ব্রক্ষ্ম সংঘের পুরোহিত। অত:পর, পতন-পরাজয় ও নিচিহ্ন হওয়ার ভয়ে ভীত-শংকিত ও আতংকিত এবং অধ:পতিত বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের আবিস্কৃত-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক ব্যবস্থার তথ্য-তত্ত্ব কার্যত, অস্বীকার ও অকার্যকর করে ইতিহাসের গতিকে বাঁধা প্রদানে স্বীয় আধিপত্যের পতনশীল অবস্থার সংরক্ষায় বুর্জোয়া শ্রেণী -বর্তমান নয়, আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে অতীতে অর্থাৎ একদা তাদেরই দ্বারা পরাজিত-পরিত্যাক্ত ধর্ম ও ধর্মীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির নিকট। সেজন্য-এমনকি, বিজ্ঞানকেও তারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে আদি ভাববাদী দর্শন তথা ধর্মীয় মুল্যবোধ ও সংস্কৃতি দ্বারা।

উপরন্ত, আদি দাসত্বের পারিবারিক বিষয়াদি ও সম্পর্ককেও তথাকথিত নারী স্বাধীনতা, আধুনিকতা ও নারী মুক্তির ছলনায়, কার্যত মেইল শ্যাভনিজমের সমার্থক- ফ্যামিনিজমের আবরণে, কার্যত পারিবারিক দাসত্ব বহাল ও বজায় রাখতে- ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠার প্রতি অত্যাধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। এমন ধরণের স্ববিরোধীতা ও মিথ্যাচার বজায় রাখতে- অধ:পতনের চরম সীমায় উপনীত, তবে, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত বুর্জোয়ারা, ধর্মবিশেষকে- 'রাষ্ট্র ধর্ম', হিসাবে চিহ্নিত ও সাব্যস্ত করে, ঐ একই রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ -আধুনিক রাষ্ট্র,হিসাবে প্রতিপন্নে অনুরূপ তাবৎ পরস্পর-বিরোধী ও বৈরীতাপূর্ণ স্ববিরোধী ও সাংঘর্ষিক বক্তব্য ও নীতিগুচ্ছ লিখে দিচ্ছে রাষ্ট্রিক সংবিধানে।

তবে, দাসত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বৃহদায়তনের শিল্প ও ফিনান্স পুঁজির সিন্ডিকেটের পচনশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদনী উপকরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতো, আর এক হতেই পারে না। অথচ, পুঁজিবাদী উৎপাদনী উপকরণের উপর ধর্মীয় আবরণ দিয়ে ব্যবহার করতে গিয়ে, দাসত্বের ধর্মীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারছে না বলেই ধমীয় রাজনীতিকেও গণতন্ত্রের আবরণ পরানোর নিত্য অপচেষ্টা করেও রেহাই পাচ্ছে না স্বার্থান্ধ পুঁজিপতি শ্রেণী। অথবা, ধর্মের নামে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতেও ব্যর্থ হচ্ছে বলেই অতি সম্প্রতিও পরাজিত হয়েছে আরব দুনিয়ার বহু অধিপতি। তৎসত্ত্বেও , ইস্তাহার রচনাকালীন সময়ে যেমন ভন্ড বুর্জোয়ারা আশ্রয় নিয়েছিল সাবেকী ইউরোপের পরাজিত শক্তি- পোপ এবং জার, মেট্রেরনিখ ও গিজোতে, তেমন আজকের যুগেও সমগ্র দুনিয়ার বুর্জোয়ারা কম-বেশ আশ্রয় নিচ্ছে অতীতের সকল মতাদর্শ-ইত্যাদিতে। **এটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরাজয়।**

অত:পর, সাম্প্রতিককালে বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল তেমন অতীতের সমাজের সুবিধাভোগী-প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীও ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তবু, ইতিহাসের গতিপথে প্রাক বুর্জোয়া সমাজের শোষক- প্রতিক্রিয়াশীলদের তুলনায় ঐতিহাসিক

বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল প্রগতিশীল। বর্তমান যুগে শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় বুর্জোয়া শ্রেণী যে, চরম প্রতিক্রিয়াশীল তাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমন শ্রেণী স্বার্থ জনিত কারণেই প্রতিক্রিয়াশীলরা সর্বকালেই প্রগতিশীলদের জাত শত্রু ও বৈরী পক্ষ। সুতরাং, সামন্ত সমাজ ভেংগে-চুরমার করে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য অর্জনের ইতিহাস মানে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির নিরত লড়াই করারও ইতিহাস।

সুতরাং, প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেংগে-চুরমার করে বিলীন ও বিলুপ্তকারী প্রগতিশীল বুর্জোয়া সমাজই যে, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিলোপ-বিলীন করছে সে কথাই নিশ্চিত করে কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত এই:

" প্রলেতারীয় জীবনব্যবস্থাতে পুরনো সমাজের সাধারণ অবস্থাগুলি কার্যত প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়েতের সম্পত্তি নেই; স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংগে তার সম্পর্ক সেটার সংগে বুর্জোয়া পরিবারগত সম্পর্ক মেলে না; আধুনিক শিল্প-শ্রম, পুঁজির কাছে এখনকার বশ্যতা স্বীকার-ইংলন্ড বা ফ্রান্স আমেরিকা অথবা জার্মানীতে সর্বত্র এই একই ব্যাপার ঘটেছে, যাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোপ পেয়েছে। তার কাছে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হল কয়েকটা বুর্জোয়া পক্ষপাতমূলক ধারণা, যার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে অনেকগুলি বুর্জোয়া স্বার্থ।"

কাজেই, রবীন্দ্র পরিবারে ধর্ম সংস্কার সমেত দুনিয়ার পচনধরা-পতনোন্মুখ বুর্জোয়া শ্রেণীর তাবৎ সদস্য যে, জাত-জাতি সমেত নানান ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে, তা যে কেবলই তাদের নিছক বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষার অপচেষ্টা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য দুস্কর্ম ও ক্ষতিকর তাওতো নিশ্চিত করে ইস্তাহার।

উল্লেখ্য- শ্রম শক্তি বিক্রেতা শ্রমিক শ্রেণী শ্রম শক্তি বিক্রি করে জীবন ধারণ করার প্রয়োজনে স্থান হতে স্থানান্তরে বা দেশ হতে দেশান্তর গমনাগমনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মতোই যেমন বাধ্য, তেমন বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন শ্রমিকের জাত-ধর্ম বাচ-বিচার করে শ্রম শক্তি ক্রয় করার সুযোগ নাই, তেমন শ্রম শক্তির বিক্রেতারও অনুরূপভাবে শ্রম শক্তি ক্রেতার, জাত-ধর্ম বিবেচনা করার বা আমলে নেওয়ার সুযোগ নাই। আর দশটা পণ্যের মতোই শ্রমও পণ্যই এবং এই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সরবরাহ ও যোগানের সূত্র-নিয়মই কার্যকর বৈ আর কোন জাতপাত-বর্ণ বা ধর্ম-অধর্মের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে-অবান্তর।আবার, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার বা পণ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীর জাতপাত-বর্ণ বা ধর্ম-অধর্ম দেখার সুযোগ নাই বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণী অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভোক্তা কারোই পণ্য উৎপাদন ও বিপননে যুক্ত-জড়িতদের জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-লিংগ ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়ার অবকাশ নাই।

ভাষা, ধর্ম বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জাত-জাতি বা ভারতীয় অনঢ় বৃক্ষসুলব জীবন ব্যবস্থাসহ প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের পরস্পরের ছায়া মাড়ানোর দোষণয়তায় অস্পৃশ্য ও অচ্ছুত জাত-পাতের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের সকল প্রথা-রীতি-নীতি,সংস্কার-কুসংস্কার ভাংগা-বিনাশ করা ছাড়া যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর গত্যান্তর ছিল না, তেমন হাড়-মাংসের মিলনে বিচ্ছেদের সুযোগহীন হিন্দু বৈবাহিক সম্পর্কও রাজনৈতিক অজ্ঞান হতে তিরোহীত হওয়া ছাড়াও বিকল্প ছিল না। আবার বিচ্ছেদের অধিকার সম্পন্ন হলেও কার্যত দাসত্বের বুর্জোয়া বিবাহের সকল রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার ইত্যাদিও মান্য ও পালন করার

সুযোগ ও আবশ্যকতা নাই এবং তা শোভন নয় ও যুক্তিপুর্ণও নয় বা সর্বসময়ের অভাব-অনটনের দুর্দশাজনিত মজুরি দাসত্বের জন্যই ঐ সব করা সম্ভব নয় শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে। উপর্যপুরি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমেত তদ্বিষয়ে বুর্জোয়াদের আইন-নিদান ইত্যকার বিষয়াদিও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ বিক্রির জন্য শ্রম শক্তি ছাড়া যে, শ্রমিকের আর কোন সম্পত্তি নাই। তাই উত্তরাধিকারের যাবতীয় বাধ্যবাদকতা বা তদানুরুপ আচার-আচরণের প্রথা-রীতি-নীতিও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য প্রয়োগযোগ্য নয়, বলেই বুর্জোয়া পরিবারের যেটুকু ভংড়ং সেরূপ ভংড়ং বা ভন্ডামির সুযোগ শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে রাখেনি খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীই।

নানান দেশ-স্থানে পুঁজিপতিরা ঘুরে বেড়ায়, গেড়ে বসে, এবং বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রিক স্বার্থ রক্ষণ-সংরক্ষণে নিয়োজিত-নিযুক্ত বহু ব্যক্তিও যারা পারিবারিক জীবন হতে দুর-দুরান্তে বসবাসে বাধ্য হয় তারা বিশেষত, সেনা-পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যারাকজীবনেও যৌন সম্ভোগ নিশ্চিত করার জন্য আইনানুগ বেশ্যাবৃত্তির বিধি-ব্যবস্থা যথারীতি বহাল-বজায় রাখছেই কেবল নয়, বরং বুর্জোয়ারা পরস্পরের স্ত্রী জাতীয় দাসীদের ভোগ-সম্ভোগে অনীহা দেখায় না।

কিন্তু, সম্পত্তিহীনদের পক্ষে বুর্জোয়াদের মতো ভন্ডামি করা সম্ভব নয়। অত:পর, বুর্জোয়ারাই যেমন জাত-জাতি ও ধর্ম ইত্যাদিকে নির্বাসিত করেছে, তেমন বুর্জোয়াদের সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীরও জাত-জাতি,ধর্ম ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই। তবে, মজুরি দাসত্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থায়ী অনিশ্চয়তা সমেত পুঁজিবাদী সমাজের কারণেই শ্রমিক শ্রেণী নিত্যই দুর্ভোগ, দু:খ ও দুরাবস্থায় নিপতিত-নিমজ্জিত বিধায় অনুরূপ দুর্যোগ-দুর্দশার যন্ত্রণাময় জীবন হতে মুক্তি লাভে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানে সচেতনভাবে কাজ করে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষায় নিজস্ব শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটানো ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর আর অন্য কোন ধর্ম বা জাত-জাতি বা দেশ ইত্যাদি নাই । তাই ইংরেজী ভার্ষাণের কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত এই: "The workers have no country." অর্থাৎ " শ্রমিকদের কোন দেশ নাই। "

এবং- ক-ই (ম) তে বিবৃত এই: " বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীন ভাব- এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতি বিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।" এবং

" যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে যাবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণী বিরোধ অন্তর্হিত হবে,সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হবে।"

কাজেই, ইতো:পূর্বে বুর্জোয়াদের কর্তৃক তত্ত্বায়িত ও সূত্রায়িত- জাতিয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদির নামে উপনিবেশিকতার বিরোধীতা বা উপনিবেশ হতে মুক্ত হয়ে দেশ বিশেষে, বিশেষ বিশেষ জাতির নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বিশেষের মাধ্যমে যে, কথিত জাতিগত মুক্তি অর্জিত হবে না বা তদানুরূপ জাতিগত মুক্তির সুযোগ খোদ বুর্জোয়া অর্থনীতিই অবশিষ্ট রাখেনি বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতীত ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ বন্ধ না হলে, অর্থাৎ মজুরি দাসত্বের অবসান না হলে বা ব্যক্তিমালিকানার

অবসানের মাধ্যমে জাতির মধ্যেকার বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতা ও শত্রুতার অবসান না হলে জাতিগত বিরোধ বা শত্রুতাও শেষ হবে না।

পণ্যের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের অব্যাহত ধারায় উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্তে ও পুঁজির বিকাশের শর্ত হিসাবেই যে পুঁজিপতি শ্রেণী ধরিত্রীর সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিল,গেড়ে বসেছিল এবং সর্বত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিজের ধাঁছে জগতকে গড়ে নিয়েছিল বলেই কতিপয় শিল্পোন্নত দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক দখলকৃত উপনিবেশও ছিল মুলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতাধীন ভূখন্ড বিশেষ; অর্থাৎ উপনিবেশ ও উপনিবেশের দখলদার দেশ-রাষ্ট্র মিলিয়েই সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী- ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত আর্থিক ব্যবস্থাই- পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মর্মে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ ও পতন ছাড়া, কেবলই উপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পরিবর্তন বা অনুরূপ প্রভুদের একদা সহযোগী ও সেবক এবং উপনিবেশিক প্রভুদের সহযোগে-সমর্থনে ও উপনিবেশিকতার সুবিধাভোগীদের নিজেদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পুঁজি-পণ্যের বাজার দখল-বেদখলের পারস্পারিক প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বি, বিশেষ বিশেষ উপনিবেশিক শক্তির গোপন-প্রকাশ্য সহযোগ-সমর্থনে, পুরানো প্রভু পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হতে অব্যাহতি লাভের সাময়িক সুযোগ থাকলেও পুঁজিবাদ হতে মুক্তির সুযোগ পুর্বাপর ছিল না কোন জাতিরই।

তাছাড়া, ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী দুনিয়াব্যাপী হত্যা-খুন, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, লোভ-প্রলোভনসহ নানান ঘৃণ্য ও জঘন্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নতুন দুনিয়া-আমেরিকা সমেত ভারত ইত্যাদি সহ সমগ্র বিশ্বকে দখল করে স্থানীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেংগে চুরমার করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায়ও স্থানীয় একশ্রেণীর ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিল। পুঁজিবাদের বিশ্বজয়ের সহযোগী স্থানীয়রা উপনিবেশিক বা দখলদার প্রভুদের সহযোগী হিসাবেই পুঁজিবাদেরই সহযোগী হিসাবে নিজেরাও পর্যায়ক্রমে পুঁজিপতি শ্রেণীতে রূপান্তরিত-পরিণত হয়েছে। উপরন্ত, উপনিবেশিক শক্তি, উপনিবেশকে পুঁজির উপযোগী ও উপযুক্ত স্থানে পরিণত করতে উপনিবেশের কাঁচামাল, উপনিবেশিক দেশে রপ্তানী করা ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিল্পজাত পণ্য, উপনিবেশে বিক্রি করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা, তথা রেল প্রতিষ্ঠাসহ নৌ-পথের ব্যাপক উন্নয়ন, পণ্য বিপনন ও আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক-বীমা ও কোম্পানীসহ নানান প্রতিষ্ঠান -সংগঠন পত্তন, স্থানীয় কাঁচামালের অনুকুল সুবিধায় উপনিবেশিক দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন উপনিবেশে নানান ধরণের কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিল, তেমন স্থানীয় সহযোগীরাও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও অবকাঠামোগত কার্যাদিতে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেরাও পুঁজির মালিক হওয়ার সুযোগ-সুবিধা হাসিল করেছিল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন সংঘটনে ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে এবং পুঁজির পুনরুৎপাদনে উপযুক্ত ও উপযোগি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা আধুনিক বা ইহলৌকিক রাষ্ট্র-পুঁজিপতি শ্রেণী, যেমন ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করেছিল হুবুহু সেরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা না হলেও বা নানান জাতীয় পশ্চাৎপদ পরজীবীতার কম-বেশ সুযোগ-সুবিধা রেখে কিন্তু উপনিবেশেও আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো স্থাপন করেছিল। রাজকীয় বিধান বা চার্চের কর্তৃত্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বে প্রণীত আইন-কানুন সমেত

সেই সকল আইন-কানুন কার্যকরণে উপযুক্ত ও যোগ্য কোর্ট-কাচারী সমেত পুঁজিবাদের উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল উপনিবেশিক পুঁজিপতি শ্রেণীই।

এমনকি, ভারত শাসনের জন্য আবশ্যকীয় রাষ্ট্রিয় কর্মচারী তথা স্থায়ী আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই। অনুরূপ স্থায়ী আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতা ও উপযোগিতার নিরিখে লাভজনক বিবেচনায় খোদ ইংলন্ড-আমেরিকাও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলাতন্ত্রকে আমদানী করতে কার্পণ্য করেনি।

কোর্ট-কাচারী সমেত আমলাতন্ত্রের চাকরী-বাকরী যেমন লাভজনক ও লোভনীয় ছিল তেমন অনুরূপ লাভ-লোভের চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যাও উপনিবেশিক পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা হতেই নিত্যই উৎপন্ন হচ্ছিল। দোকানদারী,ঠিকাদারী, আমদানি-রপ্তানী ইত্যকার ক্রিয়া কর্মের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত স্থানীয়রা ব্যাংক-বীমা ও শিল্প-কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সহ পরিবহন ব্যবসায়ও নেমেছিল।

পুঁজির বিকাশ-প্রসারে ইউরোপীয় বুর্জোয়া যেমন দুনিয়া দখল করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমন উপনিবেশিক বুর্জোয়াদের সহযোগী ও আনুকুল্যে স্থানীয়ভাবে গজিয়ে উঠা বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজির উপযুক্ত বিকাশ ও প্রসারে বা নিদেনপক্ষে আমেরিকার পুঁজিপতিদের পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষা ও সংরক্ষণে একদা " পিতা" বা প্রভু তথা ইংলন্ডের উপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত অনিবার্য বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হওয়াই কেবল নয়, বরং যুদ্ধেও লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল আমেরিকার পুঁজিপতি শ্রেণী। ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া অর্থনীতির উপযোগী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তেমন উপনিবেশিক পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজিবাদী কার্যকলাপের অনিবার্য ফলশ্রুতি-উপনিবেশের নব্য ধনীক বা পুঁজিপতি শ্রেণীরও স্বদেশী পণ্য ভোগ-ব্যবহারে স্বদেশী ভোক্তার উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন ও রাষ্ট্রিক পদ-পদবী সমেত চাকুরী ইত্যাদি সহ পুঁজিবাদী পরজীবীতার অপরাপর সকল সুযোগ-সুবিধা কেবলই নিজেদের দখলে রাখা সহ স্বীয়-পুঁজি-পণ্যের বিনিয়োগ ও বিপনন সমেত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ক্ষমতার আবশ্যকতা হেতু বিকাশের শেষ প্রান্তে উপনীত বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র মতোই উপনিবেশের পুঁজিপতি শ্রেণীও প্রায় ক্ষেত্রেই অতীত আশ্রিত হয়ে উপনিবেশিকতা পূর্ব স্বদেশের ভুয়া প্রাচুর্যের ভুয়া গাল-গল্প, মিথ ও মাইথলোজী নির্ভর অন্ধাশ্রিত মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে উপনিবেশের বুর্জোয়ারা জাতিপ্রেম, দেশপ্রেম, জাতি মুক্তি ইত্যকার নানান সস্তা-মুখরোচক রাজনীতির মনমোহনী অথচ ভুয়া কাগজী তত্ত্ব নির্মাণ করেছিল।

ইউরোপীয় আদি পুঁজিপতি শ্রেণীর সহযোগে-আনুকুল্যে ও সহযোগিতায় সৃষ্ট উপনিবেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত আদি বা দখলদারদের বিরোধ-বৈরীতায় উপনিবেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর পরিবর্তে স্থানীয় ক্ষমতা লিপ্সু পুঁজিপতি শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর কিঞ্চিত অসুবিধা হলেও স্থানীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সমূহ সুবিধা হয়েছিল বলে তা কার্যত বিশ্ব পুঁজিবাদেরই লাভ হয়েছে। তাছাড়া, উপনিবেশের নব্য ধনী ও স্বাধীনতার দাবীদার পুঁজিপতি শ্রেণী কথিত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও বহুল প্রতিশ্রুত -অতীতের স্বদেশী স্বয়ং সম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর অর্থনীতি পুন:প্রতিষ্ঠার দাবী-দাওয়া উত্থাপন ও তদানুরূপ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অসংখ্য অংগীকার - প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন বা ভাগ-বিভাজিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে, তারা কখনো সেরকম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেনি বা সেরকম

স্বাধীন-জাতীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সামান্যতম চেষ্টাও করেনি বা প্রুতিশ্রুত-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আদৌ কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না, এবং প্রতারণামূলে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির দুরভিসন্ধি ছাড়া অমন গালভরা-আবেগী ও মোহনীয় প্রতিশ্রুতি যেমন তারা দেয়নি, তেমনি কার্যত তথাকথিত স্বাধীন-স্বনির্ভর বা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ আদৌ ছিল না; বরং যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধারা যুদ্ধ জয়ে সহযোগিতা পেয়েছিল-শত্রু ইংলন্ডের পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষ ফ্রান্স-স্পেনের বুর্জোয়াদের তেমন প্রায় প্রতিটি তথাকথিত স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতা পন্থীরা প্রকাশ্যে বা গোপনে অস্ত্র-অর্থ সমেত নানান ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিল অপরাপর উপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর। এমনকি, পাকিস্তানের জন্মকালীন প্রতিপক্ষ ভারত পাকিস্তানকে দুর্বল করতে দেশটাকে ভেংগে দিতে নানান ষড়যন্ত্র করেনি বা পাকিস্তানও সুযোগ পেলেই ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এখনো মদদ দিচ্ছে না, এমন নয়। উভয় রাষ্ট্রই উভয় দেশের ছোট ছোট বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে কসুর করেনি। "আগরতলা ষড়যন্ত্র " নামে অনুরূপ একটি চক্রান্তমূলক দেশদ্রোহী কর্মে জড়িত থাকার দায়ে আরো অনেকের সাথে অভিযুক্ত জনৈক ব্যক্তি হালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার হিসাবে ২০১০ সালে নিজেই সগৌরবে ঘোষণা করেছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে দায়েরী পাকিস্তানীদের অভিযোগ সত্য ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেমন ভারত-বাংলা মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর ভারতের ফেভারড ন্যাশন হিসাবে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছিল, আবার একদা প্রভু ব্রিটিশ রানীর কমনওয়েথেরও সদস্য হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং বাংলাদেশের সংবিধানে " সমাজতন্ত্র" ও " ধর্ম নিরপেক্ষতা" যুক্ত করা সত্ত্বেও কথিত ইসলামী অর্থনীতি কার্যকরণে গঠিত ও.আই.সি'র জন্মকালীন কনফারেন্সে যোগ দিতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন স্বয়ং শেখ মুজিব। পূর্বাপর, প্রায় সকল তথাকথিত স্বাধীন বা ভাগ-বিভাজিত রাষ্ট্রগুলো একটি উপনিবেশের নিকট হতে জাতীয় মুক্তির নামে অপরাপর উপনিবেশিক শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বা পরবর্তীতে একদা শত্রু গণ্য রাষ্ট্রের সহিতও সকল বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, কার্যত, বিশ্ব পুঁজিবাদের শৃংখলেই আবদ্ধ থেকেছে এবং সম্প্রতি- অধীন, থাকছে বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ সহ এজাতীয় নানান বৈশ্বিক সংগঠনের ।

কাজেই, উপনিবেশ হতে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যকার নানান মুখরোচক ও মনোমোহনী রাজনৈতিক বুলি, যতই বলা হোক না কেন, কার্যত পুঁজিবাদী জামানায় পুঁজি ছাড়া আর কেউ স্বাধীন নয় বলেই পুঁজিপতি বিশেষ, যেমন পুঁজির গোলাম বৈ স্বাধীন নয়, তেমন পুঁজির নিজের ধাঁছে গড়ে নেওয়া ধরিত্রীতে- স্বাধীন বা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী বা তদানুরূপ বক্তব্য কেবল অবান্তর-অযৌক্তিকই নয়, বরং অসম্ভবতো বটেই,উপরন্ত চরম ধোকাবাজি-প্রতারণা,ভন্ডামি, চালবাজি ও জালিয়াতির নামান্তর।

সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পুকুর বানিয়ে মুক্তভাবে মাছ চাষ করা যদি সম্ভব হয়, তবেই, পুঁজি-পণ্যের বৈশ্বিক জালে আবদ্ধ বৈশ্বিক ধনবাদী ব্যবস্থার মধ্যে জাতি বিশেষের মুক্তি সাধন বা অর্জন করা অসম্ভব নয়।

তাছাড়া, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে যথার্থভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, বুর্জোয়া অর্থনীতি কেবল বৈশ্বিক যোগাযোগ ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতাই তৈরী

করেনি, একই সাথে অনুরূপ বৈশ্বিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাক পুঁজিবাদী তথা অসভ্য-বর্বরাবস্থা হতেও অসভ্য জাতিদেরও সভ্যতার আওতায় এনেছে। অত:পর, উপনিবেশের বিরোধীতাকারী স্থানীয় পুঁজিপতি শ্রেণী যে, স্বাধীন রাষ্ট্র বা আধুনিক রাজনৈতিক বা কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাজাধিরাজের মতো উত্তরাধিকারসূত্রের বর্বর ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং জনপ্রতিনিধিদের প্রণীত আইনের শাসনের দাবী করে তাতেও কিন্তু তারা প্রমাণ করে বিশ্বজোড়া বুর্জোয়া ব্যবস্থাই সাবেকী বর্বরতা-জংলীপনা ইত্যাকার মধ্যযুগীয় অসভ্যতা হতে সভ্যতায় উত্তীর্ণ জাতিগুলো যে, আর স্বদেশী-সাবেকী বর্বরতায় ফিরে যেতে পারবে না তাওতো জাতীয় মুক্তিকামি ও উপনিবেশ হতে স্বাধীনতা প্রত্যাশী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দাবী-দাওয়া বা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিও প্রমাণ করে যে, তারা আর স্বদেশীয় বর্বরাবস্থায় ফিরে যাবে না; তবু তারা কেবলমাত্র স্বীয় সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থ হাসিলে স্বদেশের অতীতের তথাকথিত সমৃদ্ধি-প্রাচুর্যের গাল-গল্প বানিয়ে যা প্রচার করছে তা যে, সম্পূর্ণত মিথ্যা, তা- যেমন তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে তেমন জাতীয় মুক্তির অনুরূপ দাবী যে, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বর্ণিত এতদসংক্রান্ত বক্তব্যের সহিত সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাওতো নিশ্চিত হয়।

সুতরাং, উপনিবেশ হতে মুক্তির ছুতায় কার্যত, স্থানীয় পুঁজিপতিদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির রাজনীতি যা জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার হিসাবে ইতিহাসে খ্যাত তা- দ্বারা জাতিয় মুক্তি যে সম্ভব নয়,বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন-পরাজয়ের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের সমাজতান্ত্রিক সমাজের মাধ্যমেই যে সকল জাতিগত বিরোধ-বৈরীতার চূড়ান্ত অবসান হবে তাওতো কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা নিশ্চিত হয়।

তবু, স্বভাবজাত ভন্ড-প্রতারক এবং কার্যতই জাতি বিনাশী বুর্জোয়াদের অতিরিক্ত পণ্যের বাজার নিশ্চিতকরণার্থে পরস্পরের বাজার তথা উপনিবেশ দখল-বেদখলে নিজ নিজ দেশীয় শ্রমিক শ্রেণীকে স্ব-স্ব পক্ষে আনতে বা স্বপক্ষীয়ভুক্তকরণে ভিনরাজ্যগ্রাসী ও উপনিবেশ স্থাপনকারী বুর্জোয়ারা যে, কথিত জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনীতি তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে উত্থাপন ও তা কার্যকর করার নামে উপনিবেশ দখলকারী বুর্জোয়ারা পরস্পরের দখলাধীন উপনিবেশে অনুরূপ জাতিয় মুক্তির ভুয়া শ্লোগান দিয়েছিল, তা যে কার্যতই বুর্জোয়াদের স্বার্থান্ধতা প্রসূত ভন্ডামি ও প্রতারণা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ক্ষতিকর তাও কিন্তু উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা নিশ্চিত হয়।

উপনিবেশ হতে মুক্তি লাভ বা স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ গঠন- এসবের অর্থ কিন্তু পুঁজিবাদ হতে মুক্তি নয়। আবার উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন মানে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন নয়। অধিকন্ত, নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষে ক্ষমতাধর পুঁজিপতিদের শোষণের সুযোগ অধিকতর প্রসারিত হয়, এবং এযাবৎ অনুরূপ সকল রাষ্ট্রই এরূপ বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে। কাজেই, উপনিবেশ হতে মুক্ত বা স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ শ্রমিক শ্রেণীর বহুবিধ ক্ষতির কারণ । সুতরাং, বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিলুপ্তির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণী মুক্তি অর্জনের আন্দোলন স্থগিত রেখে-জাতীয় মুক্তি, ইত্যকার অজুহাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অটুট-অক্ষুন্ন রেখে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীকে শোষণ-পীড়নে অধিকতর সুবিধা প্রদানের রাজনৈতিক নীতি-কৌশল কোনোক্রমেই কমিউনিস্ট নয়, কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের দালালরাই বা বর্ণচোরা বুর্জোয়ারাই গ্রহণ করতে পারে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল ও বলবৎ রেখেই যদি জাতীয় মুক্তি অর্জিত হয়, তবেতো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে বা বুর্জোয়াদের কারণেই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিগত বিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে খাটে না বলেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুরূপ বক্তব্য ভুল বা মিথ্য প্রমাণিত হয় । অথবা, কমিউনিস্ট ইস্ত াহারের মতে- ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ বন্ধ হলে অর্থাৎ মজুরি দাসত্বের অবসান হলে জাতিগত বৈরীতার অবসান হবে এবং ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ অবসান তথা বুর্জোয়া সমাজের চলমান শ্রেণী সংগ্রামের অন্তর্ধান হলেই জাতিগত শত্রুতার অন্তর্ধান হবে রূপ বক্তব্য ভ্রান্ত ও ভুয়া হিসাবে নিশ্চিত হয়। আর যদি, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক ও যথার্থ হয়, তবে সন্দেহাতীতভাবে জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার বিষয়াদি যুক্তিসংগতভাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের সহিত বৈরী-সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপুর্ণ বক্তব্য হিসাবে নিশ্চিত হয়।

তবু, ২য় আন্তর্জাতিকের ১৮৯৬ সালে গৃহীত "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক নীতি যা -লেনিন আরো বিশদ ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় মুক্তির বিপ্লব সংঘটনের দায়-দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তাহাই করে চলেছে লেনিনবাদীরা। যদিও, অনুরূপ বক্তব্য কমিউনিস্ট ইস্তাহারে উপরোল্খিত বক্তব্যাংশের সহিত বৈরীতা ও বৈষম্যপুর্ণ ছাড়া মোটেই সাযুজ্যপুর্ণ নয়। তবু, লেনিনবাদীরা কখনো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি যে, তারা কমিউনিস্ট ইস্তাহার মানেন না বা অস্বীকার করেন। বরং যতোটা সম্ভব খুব জোরে শোরে নিজেদেরকে মার্কসের একান্ত অনুগামী মর্মে খাঁটি রুশি " মার্কসবাদী" হিসাবে সকল সময়েই নিজেকে জাহির করেছেন বটে খোদ লেনিন।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী,১৯১৬ সালে লিখিত ও Vorbote, পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল,১৯১৬ সালে প্রকাশিত "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (থিথিস)", এ- লেনিন লিখেন- " বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে অবশ্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে, সুতরাং জাতিসমুহের পরিপূর্ণ সমতা স্থাপনই নয়, কার্যকরী করতে হবে নিপীড়ত জাতিসমুহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, অর্থাৎ অবাধ রাজনৈতিক বিচ্ছেদের অধিকার।" অর্থাৎ লেনিননীয় সমাজতন্ত্র জাতি সমুহের রাজনৈতিক বিচ্ছেদের অবাধ স্বাধীনতা তথা নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কার্যকর করবে। তবে, তাতে যে, খোদ লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ভেংগে টুকরো টুকরো হবে, এবং সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেংগে যেমনটা হয়েছে। কিন্তু, তাতে কি লেনিননীয় সমাজতন্ত্র টিকলো, নাকি একদা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত জাতিসমুহ, যাদের রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব অর্থনীতির সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সক্রিয় অংশীদার সেই সকল জাতি -সত্যিকার অর্থে আদৌ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ বা জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হলো?

ঐ একই নিবন্ধে " আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের তাৎপর্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তার সম্পর্ক" অংশে লেনিন আবারো লিখেন-" জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অর্থ একান্তরূপে রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার অধিকার, নিপীড়ক জাতিটি থেকে স্বাধীন রাজনৈতিক বিচ্ছেদের অধিকার।" এবং

একই নিবন্ধে " আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দেশ" শিরোনামে লেনিন লেখেন- " সমাজতন্ত্রীরা যে শুধু বিনাসর্তে, বিনা ক্ষতিপূরণে, অবিলম্বে উপনিবেশের মুক্তি দাবী করবে তাই নয়-আর এ দাবীটির রাজনৈতিক অভিব্যক্তি আর কিছু নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানা; সমাজতন্ত্রীদের উচিত অতি দৃঢ়রূপে এইসব দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যস্থ সর্বাধিক বিপ্লবী উপাদানগুলিকে সমর্থন করা এবং তাদের নিপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তাদের অভ্যুত্থানে-এবং তেমন কিছু ঘটলে তাদের বৈপ্লবিক যুদ্ধে সাহায্য করা।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যত জাত-জাতি পৃথিবীতে আছে তারা যদি সকলেই রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন বা অবাধ বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করে তবে পৃথিবীতে মোট কতটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে? পুঁজিপতি শ্রেণী স্ব -স্ব পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পরস্পরের সহিত বিরোধ বৈরীতায় ক্রমাগত ও ধারাবাহিক এবং বিরতিহীনভাবে লিপ্ত বলেই নানান দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত নানান দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী, যেমন বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হয়, তেমন একই দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীও আন্তঃপ্রতিযোগিতা, আন্তঃবিরোধ ও আন্তঃযুদ্ধে জড়িত হয়।আবার, উপনিবেশিক পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ বিশেষের সহযোগে একদা সহযোগী উপনিবেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর অংশ বিশেষও পারস্পারিক বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হয়। পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার নানান অংশের নানান স্বার্থগত টানাপোড়নে- ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মান, ইত্যকার দেশগুলোতে অতীতেও যেমন এখনো, প্রায় সকল দেশেই রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে থাকে। ইংলন্ডের অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা দীর্ঘ লড়াই করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সত্ত্বা বিলোপে সক্ষম হয়েছিল ১৮৩০ এর দশকে এবং ১৮৫৮ সালে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেউলিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমুদয় সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্রিটিশ রানী তথা যুক্তরাজ্য সরকার ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইন করে, ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। স্পেন হতে ন্যাদারল্যান্ডের স্বাধীনতা, বা যুক্তরাজ্য হতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা, বা ইংলন্ড হতে ভারতের স্বাধীনতা-এই সবই যে, বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার আন্তঃবিরোধ ও আন্তঃপ্রতিযোগিতা হতে উদ্ভুত তাওতো নিশ্চিত।

কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র যেমন সুযোগ পেয়েই উপনিবেশ সহ অপরাপর জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্রয় করার মাধ্যমে অপরাপর রাষ্ট্র বা রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত করেছে, তেমন ভারত বিভক্ত হয়ে কেবল ভারত-পাকিস্তানই নয়, পরবর্তীকালে ভুটান-বাংলাদেশও স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু, কেউ কি সাবেক প্রভু জাত বা উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে সত্যি সত্যি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, না কি কমনওয়েলথ -জাতিসংঘ, ও.আই.সি, বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ ইত্যকার নানান সংস্থা-সংগঠন ও নানান ধরনের চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে পরস্পর, পরস্পরের নিকট আবদ্ধ ও দায়বদ্ধ থাকছে?

অথবা, শেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী পুঁজিপতিগোষ্ঠী বিশ্ব পরিসরে তাদের আধিপত্য কায়েম সহ সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শান্তি রক্ষায় অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার যুদ্ধ -বিগ্রহ ঠেকাতে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র, একটি বা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা, পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ বা হালের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন ও প্রতিষ্ঠা করে, বিশ্ব পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না? এমন কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেও

পুঁজিবাদ কি স্বীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য মুক্ত অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী কি স্বীয় আন্ত:বিরোধ ও পারস্পারিক বিরোধ-বৈরীতা হতে মুক্ত থাকতে পেরেছে?
উল্লেখ্য- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫, এখন প্রায় দু'শ, আর অবাধ বিচ্ছেদের লেনিনীয় নিদানের ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় খোদ ইউরোপসহ আফ্রিকা-এশিয়ায় অন্তত আরো একশতটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বশস্ত্র লড়াইসহ রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিয়োজিত আছে অন্যূন ২ শতাধিক রাজনৈতিক দল। এমনকি খোদ যুক্তরাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এসকটল্যান্ড, এমন আশংকায় বৃটেনের রানীও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যদিচ, অপরদিকে বুর্জোয়াদের একটি অংশ একটি একক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার জন্য একই আইন, একই মুদ্রা, একই বিনিময় প্রথা চালু ও কার্যকরণে একটিমাত্র বিশ্ব গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ একটিমাত্র সংবিধান, একটিমাত্র পার্লামেন্ট এবং একটিমাত্র নির্বাহী বিভাগ সহ একটাই সেনাবাহিনী, একটাই পুলিশবাহিনী সমেত একটাই বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজির সর্বাত্মক স্বার্থ সংরক্ষণ ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে ১৯২১ সাল হতে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেউ কেউ এমন প্রচেষ্টায় ইন্দন দিয়ে যাচ্ছে বলে নানান মাধ্যমে সংবাদাদি প্রকাশিত হচ্ছে।

৭০টি রাষ্ট্রের ৪২০টি ব্যাংক ও ফিনান্স প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে গঠিত- The Institute of International Finance, এর পক্ষ থেকে জি-২০,'র- সিউল কনফারেন্সের পূর্বে দাবী তোলা হয়েছে-একটি মাত্র গ্লোবাল কারেন্সির।

দুনিয়ার বিদ্যমান অবস্থায় - জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীন রাষ্ট্র ইত্যাদি যে, ভুয়া বা মিথ, তা রাখ-ঢাক না করে খুব পরিস্কারভাবে বিগত নভেম্বর-২০১০ সালে সিউলে অনুষ্ঠিত জি-২০, সম্মেলনে বলেছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান -Herman Van Rompuy. Published by Associated Newspapers Ltd, Part of the Daily Mail, The Mail on Sunday & Metro Media GroupGi " Mail Online," এ ৩০, নভেম্বর,২০১০ সালে- প্র কাশিত তার বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ তার ছবি ও সংবাদের শিরোনাম সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

. " Nation states are dead: EU chief says the belief that countries can stand alone is a 'lie and an illusion'

By Daniel Martin
Last updated at 8:46 AM on 11th November 2010,

The age of the nation state is over and the idea that countries can stand alone is an 'illusion' and a 'lie', the EU president believes."

Nation state is dead: Herman Van Rompuy, President of the European Council, at the G20 Summit in Seoul, South Korea, today."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - লেনিনের ফতোয়া মতো উপনিবেশ হতে মুক্তি বা জাতীয় মুক্তি ইত্যকার অজুহাতে যে সকল রাষ্ট্র ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা যদি সত্যি সত্যিই স্বাধীন বা মুক্ত হতো পারতো, তবে মিঃ হারমেন কি করে বলতে পারেন " জাতীয় রাষ্ট্র মৃত"? অবশ্য তার পদ-পদবীইতো প্রমাণ করে তার বক্তব্যের সত্যতা। তা-হলে একদা যারা অন্যদেশের দখলদার ছিল বলে সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হতো, এখন তারাও উপনিবেশ হতে বেদখল হওয়াসহ নিজেরাও পরাধীন হয়েছে ! অত:পর, সকল রাষ্ট্রকে অধীন করার মতো অমন শক্তিশালী কর্তৃত্বকারী কে? পুঁজি । পুঁজি সমস্ত ধরিত্রীকে আষ্টে-পৃষ্টে এমনভাবে বেঁধেছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন পুঁজি-পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জালে আবদ্ধ; এবং প্রতিটি রাষ্ট্রই পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াতের সুনিশ্চয়তা বিধানকারী; এবং পুঁজি-পণ্যের স্বার্থবাহী নানান আঞ্চলিক-বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আধিপত্যে-কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এবং ক্রিয়াশীল বলেই বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন, ইন্টার-কানেক্টেড, ইন্টার-রিলেটেড, এবং ইন্টার-ডিপেন্ডেড হেতু সমগ্র দুনিয়াই এখন প্রত্যক্ষভাবে পুঁজির নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত এক কসমোপলিটান ভিলেজ।

অত:পর, মিঃ হারমেন দুনিয়ার এমন অবস্থা দেখলেও স্বার্থান্ধ ও সুবিধাবাদী লেনিনবাদীরা কেন, এখনো জাতীয় মুক্তি, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জাতীয় পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা ইত্যকার ভুয়া বুলিশবাগীতা হতে মুক্ত হতে পারছেন না? বিশ্ব

পুঁজিবাদের সংরক্ষক হারমেনরা বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে বৈশ্বিকভাবে রক্ষার চেষ্টা করছে বলে আই.এম.এফ বা বিশ্বব্যাংকের কর্তাব্যক্তিরা যেমন বিশ্বের সকল দেশের পুঁজির হিসাব নিকাশ করে, মোট বৈশ্বিক পুঁজির সংকট-সমস্যা নিরূপন-চিহ্নিত ও নির্ধারণ করে, তৎসমাধানে বৈশ্বিক নীতি বা নীতিমালা গ্রহণ করে।

কিন্তু, জাতি প্রেম- দেশপ্রেমের সোল এজেন্ট এন্ড চ্যাম্পিয়ন- লেনিনবাদীরা কেবলই জাতীয় বা নিছক রাষ্ট্রীক গন্ডীতে আবদ্ধ বলেই দাবী করা সত্ত্বেও তারা কাল্পনিক বৈ বৈজ্ঞানিক বা দ্বান্দিক বস্তুবাদী নয়। তাই, বিশ্বকে- বিশ্বদৃষ্টিভংগি দ্বারা দেখতে অযোগ্য ও অক্ষম হেতু তাদের কর্মতৎপরতা দ্বারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতি বৈ কল্যাণ হওয়ার রেকর্ড নাই । লেনিনবাদীরা কেউ কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির নামে এতো যে রাষ্ট্র গঠিত হলো, তাতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি নষ্ট-ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া এমনকি, মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামান্যতম উন্নতি হয়েছে? নতুন-পুরাতন রাষ্ট্রসহ রাষ্ট্র রক্ষক- সংরক্ষক ও সমর্থক বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদির ব্যয়ভার বহন করা হয়- দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উৎপন্ন মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে নয় কি? অত:পর, দুনিয়াময় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের হার বাড়া বৈ কমার সুযোগ নাই। তাই দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী অতীতের তুলনায় অধিকতরহারে শোষিত হচ্ছে।

কিন্তু, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি অত্র নিবন্ধে বিবৃত হলো, তাতে- কি এমন বক্তব্য লিখিত আছে, না কি, তাতে বিবৃত হয়েছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীই পুঁজি-পণ্যের বাজার নিশ্চিত করতে গিয়ে বিশ্বজোড়া আন্ত:নির্ভরতার সম্পর্কে প্রতিটি জাতিকে আবদ্ধ করে জাতিগত সংকীর্ণতাকে অসম্ভব করেছিল? ইস্তাহার রচিত হওয়ার কালে, পুঁজির-বিশ্ব জয় ও দখল সম্পর্কে যা বিবৃত হয়েছে,তারই যথার্থ পরিণতি কি-বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের একক কর্তৃত্ব সমেত পুঁজিবাদের একক বিশ্ব ,এবং অনুরূপ বিশ্ব ব্যবস্থা বহাল রাখতে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে সৃষ্ট রাষ্ট্র গুলো সমেত জাতিসংঘ ইত্যকার নানান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান গড়েও শংকামুক্ত হতে না পেরে, তথা পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার বা একটি বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা করছে স্বয়ং পুঁজিপতি শ্রেণীই?

সুতরাং, লেনিনের বক্তব্যটি - কমিউনিস্ট ইস্তাহারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক বলেই তদ্বারা লেনিন কার্যত ও প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে অস্বীকার ও অকার্যকর করেছেন। লেনিনবাদীরাও খোলাচোখে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে না দেখে, কেবলই লেনিনের চোখে অন্ধের মতো দুনিয়াকে দেখছে বলেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের কার্যকর ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সমেত দৃশ্যমান উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্যক্তিমালিকানা সমেত উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানাদি বিলোপ-বিনাশে আবশ্যকীয় কর্মসূচি গ্রহণ না করে বরং ভুয়া সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদ হতে জাতীয় মুক্তির শ্লোগান দিয়ে কথিত উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশভুক্ত দেশগুলোর লেনিনবাদীরা স্বীয় রাষ্ট্রের সদস্যপদও আমলে না নিয়ে হাস্যকরভাবে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফকেও বিদেশী ডোনার বা দাতা সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করে; এবং উল্লেখিত বৈশ্বিক সংগঠন-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির ক্ষমতা-এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত এবং অসত্য ধারণা ছড়িয়ে-একদিকে, যেমন বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার দৃশ্যমান এককেন্দ্রীক, তবে অসংখ্য আন্ত:বিরোধে জড়িত ও মরণব্যধিতে আক্রান্ত- জর্জরিত বয়োবৃদ্ধ -অতীত আশ্রিত এবং

দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ভীষণরকমের ক্ষতিকর,এমনকি মানবজাতির জন্য ভয়ানক বিপজ্জনক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যথার্থভাবে দেখতে অপরাগ, তেমন কমিউনিস্ট ইস্ত াহারকেও আমলে নিতে অযোগ্য ও অক্ষম।

প্রগতি প্রকাশন, মস্কো হতে বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত "পুঁজি, ১ম, ২য় অংশ, অষ্টম ভাগ।-তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন, অধ্যায় ৩১।- শিল্প-পুঁজিপতির উৎপত্তি " এ মার্কস লিখেন- " উপনিবেশগুলি উঠতি শিল্পসমূহের জন্য বাজারের যোগান দিত এবং একচেটিয়া বাজারের মারফত পুঁজির সঞ্চয়ন বাড়িয়ে তুলত। নগ্ন লুণ্ঠন, দাসত্ববন্ধনারোপ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বাইরে যে সম্পদ আহরিত হত, তা স্বদেশে প্রেরিত হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত। " এবং একই অংশে মার্কস আরো লিখেন- "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, গুরু কর-ভার, সংরক্ষণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি, প্রকৃত ম্যানুফ্যাকচারিং যুগের এই সন্তানসন্ততিরা আধুনিক শিল্পের শৈশবে প্রচন্ড হারে বৃদ্ধি লাভ করে।" কাজেই, মার্কসের বিবরণে আধুনিক শিল্পের "সন্তানসন্ততি"- উপনিবেশ ছিল পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের অপরিহার্য ও বিকল্পহীন শর্ত। সুতরাং, উপনিবেশের মুক্তি উপনিবেশস্ত বুর্জোয়াদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলেও উপনিবেশিক পুঁজিপতিদের জন্য কিঞ্চিত ক্ষতির কারণ বটে। কিন্তু, এই মুক্তি ইত্যাদি সামগ্রীকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদের তেমন ক্ষতির কারণ নয়। বরং কখনো কখনো পুঁজি প্রবাহ সচল ও পুঁজির অস্থিত্ব সংরক্ষায় আবশ্যক ছিল বলেই 'পিতা' যুক্তরাজ্য হতে " বিচ্ছিন্ন" হতে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিল-'সন্তান' যুক্তরাষ্ট্র। তাই বলে- '১৩ কলোনী' মুক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার যেমন উন্নতি হয়নি, তেমন দাসপ্রথা বজায় রাখা , না-রাখা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগরাজ্যের পুঁজিপতিরা দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং, উপনিবেশের মুক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষের ক্ষয়-ক্ষতি এবং লাভালাভের কারণ হলেও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কারণ নয়,বলেই বুর্জোয়ারা অনুরূপ মুক্তির জন্য ইতিহাসখ্যাত ৮০,৩০,৭ বর্ষী যুদ্ধ সংঘটিত করাসহ পুর্বাপর অসংখ্য যুদ্ধ সংগঠিত ও সংঘটিত করেছে। কাজেই, বুর্জোয়া ব্যবস্থার দুর্দশা ও অভিশাপ হতে মুক্তি লাভে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিলোপ-বিনাশ করা, আর বুর্জোয়া ব্যবস্থা বহাল রেখে কেবলমাত্র উপনিবেশ হতে মুক্ত হওয়া সমার্থক নয়। দ্বিতীয় কর্মটি অর্থাৎ উপনিবেশ হতে মুক্তি স্বয়ং পুঁজিপতিরা করেই আসছে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর কাজ হচ্ছে স্বীয় শ্রেণীর মুক্তি হাসিলের মাধ্যমে কার্যত মানবজাতির সার্বিক মুক্তি অর্জনে খোদ বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ-বিনাশ ও বিলোপ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার বহু পুর্বে ৮০ ও ৩০ বর্ষী যুদ্ধ সমাপ্তিতে ১৬৪৮ সালে সম্পাদিত-ওয়েস্টপাল্লা চুক্তি দ্বারা যেমন জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ,ইত্যকার বিষয়াদি নীতি হিসাবে স্বীকৃত, তেমন স্পেনের কলোনী- বলিবিয়া সহ দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধেও অনুরূপ নীতি ঘোষিত হয়েছিল।

২য় আন্তর্জাতিকের নেতা লেনিনের পর, ১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসনের কংগ্রেসে প্রদত্ত ইতিহাসখ্যাত ১৪ দফা বক্তব্যের ৫ নং দফায় ঐ একই নীতি ঘোষিত হয়।

ট্রটস্কির রচিত এবং লেনিনের অনুমোদন ও সমর্থনে - গৃহীত ৩য় আন্তর্জাতিকের ইস্ত াহারে, বর্ণিত ১৪ দফা সম্পর্কে বলা আছে- " hypocritical points of the Wilsonian program." অথচ মার্চ, ১৯১৯ সালে, লেনিনদের প্রতিষ্ঠিত উক্ত ৩য়

আন্তর্জাতিকের সদস্যপদের শর্তাবলীর ৮ নং দফায়ও 'উপনিবেশ হতে মুক্তি' তথা জাতীয় মুক্তির বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহ স্থান পেয়েছে।

৩য় আন্তর্জাতিকের মেনিফেস্টতে বর্ণিত আছে- "The state-ization of economic life, against which capitalist liberalism used to protest so much, has become an accomplished fact. There is no turning back from this fact – it is impossible to return not only to free competition but even to the domination of trusts, syndicates and other economic octopuses. Today the one and only issue is: Who shall henceforth be the bearer of state-ized production – the imperialist state or the state of the victorious proletariat?

In other words: Is all toiling mankind to become the bond slaves of victorious world cliques who, under the firm-name of the League of Nations [5] and aided by an "international" army and "international" navy, will here plunder and strangle some peoples and there cast crumbs to others, while everywhere and always shackling the proletariat – with the sole object of maintaining their own rule? Or shall the working class of Europe and of the advanced countries in other parts of the world take in hand the disrupted and ruined economy in order to assure its regeneration upon socialist principles?"

উক্ত ইস্তাহার রচিয়তা ও গ্রহীতাদের মতে- তৎকালে এক এবং একমাত্র গুরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের ভাষায় বিজয়ী প্রলেতারীয় রাষ্ট্র অথবা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র -কে, উপযুক্ততা ও যোগ্যতার সাথে রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের দায়-দায়িত্ব বহন করবে? অর্থাৎ,তখন অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়করণ একটা সুসম্পন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা দিয়েছিল; এবং এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দায়-দায়িত্ব পালনে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অপেক্ষা লেনিন-ট্রটস্কিদের স্থায়ী সেনা বাহিনীর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণাধীন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র- রাশিয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং দক্ষতা বহুগুণ বেশী বলেই তাদের দাবী। কাজেই, পুঁজিবাদের বিলোপ নয়, বরং যে- রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইতো:মধ্যে দুনিয়ায় ভালোভাবে উদ্ভুত হয়েছে এবং বুর্জোয়ারাও, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে; এবং ঐ রাষ্ট্রিয় অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কর্তাদের সাথে কার্যকর প্রতিযোগীতা বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে-তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিকের ঘোষণায়। তৎসত্ত্বেও, লেনিনবাদী-মাও চিন্তা পন্থীরা ৩য় আন্ত র্জাতিককে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বলে এতবছর পর্যন্ত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকা-ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখিত ঘোষণা দ্বারা এটা সুনিশ্চিতভাবে নিশ্চিত হয়েছে যে , পুন: পুন অতি উৎপাদন সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদ যে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছে

সে সম্পর্কে লেনিন-ট্রটস্কিরা পরিপূর্ণ জ্ঞাত ছিল । তাছাড়া এ বিষয়ে মার্কস নিজে যেমন লিখেছেন, তেমন এ্যাংগেলসও তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"- এ,বিস্তারিত আলোচনা করে সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের শেষ ভরসাস্থল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাসংগিক বিধায় ঐ গ্রন্থ হতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল যা এই: " বস্তুতপক্ষে,১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয় তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্য জগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে ভেংগে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজার জাম, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রিত ততই তা স্তুপাকার, নগদ টাকা অদৃশ্য হয়, ঋণ দান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরী আর শ্রমিক জনগণের জীবিকা যায়, কারণ অতিমাত্রায় জীবিকোপকরণ উৎপন্ন করেছে তারা; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর ক্রোক। অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে; উৎপাদন শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় হতে থাকে, পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তুপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে।একটু একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে উঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্পে, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পড়ি-মড়ি লম্ফঝম্পের পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটেছে। এ সব সংকটের চরিত্র এতই পরিস্কার যে ফুরিয়ে crise plethorique বা রক্তাতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এ সব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্য সঞ্চালন কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চলনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্যোৎপাদন ও পণ্য সঞ্চলনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। **উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।**

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দুর বিকশিত হয়েছে যে, সহবিদ্যমান ও প্রাধান্যকারী সামাজিক উৎপাদন-নৈরাজ্যের সংগে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এ ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে সংকট কালে পুঁজির প্রচন্ড পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংস। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেংগে পড়ে উৎপাদন-শক্তির চাপেই, তারই সৃষ্টির চাপে। এই সমস্ত উৎপাদ-উপায়কে তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেই হেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ, কর্মেচ্ছু শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে অজস্র। কিন্তু ' অজস্রতা হয়ে দাঁড়ায় দৈন্য ও দুর্দশার উৎস'(ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবিকার উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই অজস্রতাই।

কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় সচল থাকতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মনুষ্য শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই উপায়ের মধ্যে দন্ডায়মান। কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিক কারিকার সম্মিলন ব্যাহত হয়; কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদন-উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন শক্তিকে আর পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন -পদ্ধতি নিজেই আত্ম-অভিযুক্ত; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন শক্তি নিজেরাই ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তা বিলোপের দিকে, **সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।**

পুঁজি হিসাবে তাদের যে গুণ তার বিরুদ্ধেই ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিসাবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। শিল্পের অতি চাপের পর্যায়ে ঋণ ব্যবস্থার অসীম স্ফীতির মারফত যতটা, বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাংগন মারফত ধ্বস দ্বারাও ততটাই বিপুল উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সামাজীকরণ ঘটাতে চায়, যা আমরা বিভিন্ন জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বন্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যবিদ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশের এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় ' ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদ্যের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং এই ভাবে আগে থেকেই বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই এই ধরনের ট্রাস্টের সাধারণভাবে ভেংগে পড়ার সম্ভাবনা, সেই কারণেই আরো বেশী পরিমাণ সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন তা জাগায়। এক একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় অতিকায় জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীতে; আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে-

(বি:দ্রঃ এ গ্রন্থটি এ্যাংগেলস লিখেছেন-১৮৭৭ সালে, তবে ১৮৯২ সালের প্রামাণ্য ইংরেজী সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে বলে বা অন্যকোন কারণে- "১৮৯০" বিবৃত হয়েছে। কিন্তু, ১৮৭৭ সালে যে '১৮৯০' এর হিসাব-পত্র দেওয়ার সুযোগ নাই, তাতো নিশ্চিত। তাই এটি উল্লেখ করা হল। কাজেই, **বন্ধনীকৃত এই মন্তব্য, মুল বইয়ের অংশ নয়। -লেখক)**

ইংলন্ডের অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সমস্ত ৪৮ টি প্রতিষ্ঠানের একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউন্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক

পরিকল্পনার ভিত্তিতে। ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে-একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী-সমাজসুলব বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নতি-স্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক-সমাজসুলব নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেংগে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন পরিচালনা, ক্ষুদে একদল ডিভিডেন্ট-লিপ্সু কর্তৃক সমাজকে এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে* নিজের হাতে। { * বলছি 'করতে হবে' কেননা, উৎপাদন ও বন্টনের উপায় যখন সত্য করেই জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালন ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাবে, এবং সেই হেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন অনিবার্যভাবে অনিবার্য হবে, কেবল তখনই একটা অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটবে-যদি সে কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও,-ঘটবে সমস্ত উৎপাদন শক্তির সমাজীকরণের প্রাথমিক একটা পদক্ষেপ। কিন্তু, ইদানিং বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন, তখন থেকে এক ধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই একধরনের স্বেচ্ছাকৃত পদলেহনে অধ:পতিত হচ্ছে, এমনকি বিসমার্কী ধরনের রাষ্ট্রীয় সমেত যে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেই তারা ঘোষণা করেছে সমাজতন্ত্র বলে। তামাক শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি সমাজতন্ত্র হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেত্তেরনিখকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে; কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যতার ফলে নয়, নিতান্তই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদায়ী গড্ডলিকারূপে রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে পার্লামেন্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরীর উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় নৌ কোম্পানি, রাজকীয় চীনামাটি কারখানা, তথা সৈন্যবাহিনীর দর্জি-পোষাক প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ভিলহেলমের রাজত্বকালে এক ধূর্ত যা গুরত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এ্যাংগেলেসের টীকা।) }

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদান প্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে-ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে তবে উৎপাদন ও বন্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েন্ট-ষ্টোক কোম্পানি, ট্রাস্ট ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কি পরিমাণে অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটি নির্বাহ হয় বেতনভোগী

কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেন্ট পকেটস্ত করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই ষ্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোন সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি বা ট্রাস্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি ও ট্রাষ্টে তা স্বত:ই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাহাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রীক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ রূপমূর্তি। উৎপাদন শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে উঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন শক্তির রাষ্ট্র মালিকানা সংঘাতের সমাধান করে না, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল সর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেই হেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সংগে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তির ওপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দখল স্থাপন করেই কেবল তা সম্ভব।"
কাজেই, উৎপাদন শক্তির উপর সামাজিক দখল তথা সামাজিক মালিকানা বৈ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে, সমাজতন্ত্র নয়, এবং বুর্জোয়ারাই উৎপাদন উপকরণের পুন:পুন বিদ্রোহের অভিঘাতে জর্জরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আশ্রয় নেয় এবং নিবে, তাওতো- এ্যাংগেলস তার এই ঐতিহাসিক এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে সুনিশ্চিত করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের পরিণতিতে- শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপিত না হলে, ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উপর সম্পত্তির মালিকানা চাপিয়ে দেয় এবং এটাই পুঁজিবাদী সমাজের বেশিষ্ট্য; এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী যে অধিকতর হারে শোষিত-পীড়ত হয়, সে চিত্রও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করছেনে এ্যাংগেলস। তবু, এ্যাংগেলসের উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশের ৩৮ বছর পরে ১৯১৮ সালের ৫ই মে এ লিখিত " 'বামপন্থী' ছেলেমানুষী ও পেটি বুর্জোয়াপনা" নিবন্ধে লেনিন লিখেন – " অথচ এইটে তারা বোঝে নি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হবে একটি অগ্রপদক্ষেপ। যদি মোটের ওপর আধ-বছরের মধ্যে আমাদের এখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে

একটা প্রকান্ড সাফল্য এবং এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে যে সমাজতন্ত্র পাকা ও অপরাজেয় হয়ে উঠবে তার নিশ্চিত গ্যারিন্টি।"

সমাজতন্ত্রীদের বা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমন বক্তব্য এ্যাংগেলস তার উল্লেখিত গ্রন্থে লিখেননি এবং মার্কসের জীবৎ দশায় এ্যাংগেলসের উল্লেখিত পুস্তকে, পুঁজিবাদের পুন:পুন সংকট-নৈরাজ্য এবং ট্রাস্ট ইত্যাদির আশ্রয়েও পুঁজিবাদ টিকে থাকার ব্যর্থতায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আশ্রয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার বিবরণ সমেত পুঁজিবাদী উৎপাদনী ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক রূপান্তর তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিজ্ঞান তথা তদার্থে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সূত্র, উভয়ের পূর্বাপর লিখিত ও ব্যাখ্যাত নিয়ম-সূত্রের ধারাবাহিকতায় বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। লেনিনের এমন সূত্রের অনুমোদক নন অথবা মার্কস-এ্যাংগেলস এক্ষেত্রে ভুল, এমন কথা কস্মিণকালেও না বললেও উপরোক্ত নিবন্ধে কয়েক দফায় লেনিন আরো লিখলেন- " রাশিয়ার বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদেরই প্রাধান্য, তা থেকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ে পৌঁছবার রাস্তাটা একই." এবং "সমাজতন্ত্র আর কিছুরই নয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী একচেটিয়া থেকে সামনের দিকে অশু পদক্ষেপ মাত্র।" এবং " রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণতম বৈষয়িক প্রস্তুতি," এবং তিনি ঐ নিবন্ধে আরো লিখেন -" কিন্তু উৎক্রমণ কথাটার মানে কি? অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার অর্থ কি এমন নয় যে বর্তমান ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই উপাদান, অংশ ও টুকরো বর্তমান? সবাই স্বীকার করবেন, হ্যাঁ। "।

অত:পর,সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদ্যমানতায় বিশ্বময় লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের এমন বৈষয়িক প্রস্তুতির হাতিয়ার প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে লেনিনের অমন স্বয়ং বিশ্বাসী প্রত্যয়ের ভিত্তিতে ৩য় আন্তর্জাতিকের ইস্তাহারেও ১ম বিশ্বযুদ্ধ জয়ী লীগ অব ন্যাশন্স প্রতিষ্ঠাকারী বুর্জোয়াদেরকে তদ্বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কিন্তু,লেনিনদের কর্তৃত্ব না মানলে দুনিয়াবাসী ১ম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী খুনি বুর্জোয়াদের স্থায়ী দাসত্ব বরণ করবে রূপ ভয়-ভীতি প্রদর্শণকারী উক্ত ইস্তাহার রচয়িতা-গ্রহীতা এবং অনুমোদক ও সমর্থক লেনিন-ট্রটস্কি ও ষ্ট্যালিনরা যে, কেবলমাত্র পরম কর্তৃত্বের চরম ক্ষমতাধর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কার্যত একক ব্যক্তি কর্তৃত্বের একদলীয় ব্যবস্থা ও জারের সেনা-পুলিশের সহায়তায়ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ব্যবস্থাপনায় ওদের (সাম্রাজ্যবাদীদের) মতো দক্ষ-যোগ্য নয়, তাওতো নিশ্চিত হয়-একদিকে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নসহ তদার্থে গঠিত ৩য় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তি-বিনাশ, অন্যদিকে লেনিনদের প্রতিপক্ষদের বিদ্যমানতা ও একচ্ছত্র বৈশ্বিক কর্তৃত্ব দ্বারা ।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ৬ মাসের মাথায়- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী এক বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই লেনিনের সমাজতন্ত্র রাশিয়ায় অপরাজেয় হয়েছিল, খোদ লেনিনের দাবী মতো। কিন্তু, স্বয়ং লেনিন-১৯২১ সালে চালু করলেন "নয়া আর্থনৈতিক নীতি"। ফলে, নিজেই নিজের কাছে পরাজিত হয়ে লেনিন আমদানী-রপ্তানীসমেত ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমাসমেত শিল্প কল কারখানা এবং কৃষিতেও ব্যক্তিমালিকানা কবুল করে রুশ ফেডারেটেড সোস্যালিষ্ট রাশিয়ার জন্য স্বরচিত -১৯১৮ সালের সংবিধানখানি এক গুরুত্বহীন ও অকার্যকর কাগুজে বস্তুতে পরিণত করেছিলেন।

সেই থেকে রাশিয়ায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। লীগ প্রতিষ্ঠাকারী বুর্জোয়াদেরকে পরাজিত করাতো দুরে থাক, বরং এতদসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্বলিত ৩য় আন্তর্জাতিকের ইস্তাহার রচয়িতা স্বয়ং ট্রটস্কি পরাজিত হলেন, তারই সহকর্মী ষ্ট্যালিনের নিকট এবং দেশান্তরী হয়েও নিহত হয়েছেন। আবার, দুনিয়াবাসীর দাসত্ব নিশ্চিতকরণার্থে হোক বা না হোক, তবে নিজের সহ সোভিয়েতের জনগণের দাসত্ব নিশ্চিতিতে স্বীয় রাজনৈতিক হীনতম স্বার্থ চরিতার্থকরণে স্বয়ং ষ্ট্রালিন ৩য় আন্তর্জাতিককে কেবল অকার্যকর ও বিলুপ্তই করেনি, উপরন্ত ৩য় আন্তর্জাতিকের প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগি এবং প্রতিদ্বন্দ্বি লীগ অব ন্যাশন্সে যোগ দিয়েছিলেন –১৯৩৫ সালে।

ষ্ট্যালিনই উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তিগত মালিকানার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের সংবিধান দ্বারা। কাজেই, লীগ অব ন্যাশন্সওয়ালাদের প্রতি লেনিন-ট্রটস্কির চ্যালেঞ্জ যেমন ব্যর্থ হল, তেমন লেনিনের "অপরাজেয় সমাজতন্ত্র"ও পরাজিত হল অবলীলায় এবং তারই উপযুক্ত শিষ্য ষ্ট্যালিনের হাত ধরেই। অত:পর, রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ ভেংগে যেতে বাধ্য বলে এ্যাংগেলস যে মুল্যায়ন করেছিলেন-১৮৭৭ সালে, তাহাই নিশ্চিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে। তবে, যারা মার্কসদের নাম করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে "সমাজতন্ত্র" বলে চালিয়েছেন তারা রাষ্ট্রায়ত্ত বেশ্যাবাড়ীর দালাল না হলেও ঐ রূপ বিসমার্কীয় সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শী ও রাষ্ট্রীক বা রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির রাজনীতিক না হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি?

লীগ অব ন্যাশন্সপন্থীরা ২য় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়লাভের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিতন্ত্রকে একটিমাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার জন্য কেন্দ্রীভূত পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যের যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব মোড়লীপনার কর্তৃত্ব কবুল করে, লেনিনবাদী ষ্ট্যালিনের সহযোগে ১৯৪৫ সালে গড়ে তোলে আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকসহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা ও সংগঠন। ফলে- কেন্দ্রীভূত পুঁজির বৈশ্বিক কর্তৃত্বে বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিকতার নীতির আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা গুরত্বহীন ও অকার্যকর হয়ে যায়।

কারণ- জাতিসংঘ ও বিশ্ব ব্যাংক ইত্যকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যতো বটে খোদ রাষ্ট্রগুলোই। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই নিজ নিজ সীমানায় অবস্থিত পুঁজির পরিমাণ মতো আই.এম.এফের এস.ডি.আরের মালিক ও অংশীদার বিধায় দুনিয়ার সর্বত্র স্ব-স্ব অংশহারে প্রতিটি রাষ্ট্র পুঁজির হিস্যা লাভের সুযোগ হাসিল করেছে। তাই, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে দুনিয়ার সকল পুঁজির দেখ-ভাল করার নিমিত্তে পুঁজিপতিদের বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলতে সক্ষম হয়েছে পুঁজিবাদেরই পুন:পুন সংকট-মহাসংকট হতে সৃষ্ট ১৯৩০ এর মহামন্দার সংকটোত্তরণে ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে, ইতো:পূর্বেকার প্রতিদ্বন্দ্বি শিবিরে বিভক্ত- মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তির মধ্যে সহযোগি সমেত অক্ষশক্তির মোড়ল জার্মানকে, ভয়ানকভাবে পরাজিত করে দুনিয়ার কেন্দ্রীভূত পুঁজির প্রধান ৩ অংশীদার- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন; বিজয়ী শক্তি। ফলে-পুঁজি বিকাশের যুগে পুঁজিরই বদৌলতে- হল্যান্ড, স্পেন, ইংলন্ড, ফ্রান্স যেমন সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশিক দেশে পরিণত হয়ে অবশিষ্ট দুনিয়াকে দখল-বেদখল করার জন্য বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করেছে এবং পরবর্তীতে জার্মান, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান এবং ইটালীও স্ব-স্ব পণ্য-পুঁজির, বিপনন ও সঞ্চালন করতে গিয়ে পারস্পারিক যুদ্ধ-বিগ্রহ যেমন করেছে তেমন জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির

নামে পরস্পরের উপনিবেশে স্ব-পক্ষীয় বুর্জোয়া ভাড়াটিয়া-সহযোগিদের নিয়েও বহু ছোট-বড় যুদ্ধ সংঘটিত করেছে।

কিন্তু, বিশ্বের তাবৎ পুঁজির সঞ্চলন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই ১৯০০ ও ১৯৩০ সালের মহা সংকটে নিপতিত হয়ে বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণী পরস্পরের বিরুদ্ধে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করতে গিয়ে,কোনো কোনো উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র,যেমন পূর্বাপর পক্ষ বা জোট পরিবর্তন করেছিল, তেমন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রাধান্যে এককেন্দ্রীক, চরম ও পরম ক্ষমতাধর একক ব্যক্তির একদলীয় সেনা-পুলিশী স্বৈরশাসনে সোভিয়েত ইউনিয়নও হয়ে উঠলো বিশ্ব পুঁজির ৩য় বৃহৎ অংশীদার।

তবে, যেহেতু অক্ষ শক্তি ভয়ানকভাবে পরাজিত-পরাস্থ ও বিধ্বস্ত হয়েছে এবং কেন্দ্রীভূত পুঁজির প্রাধান্যে যুক্তরাষ্ট্র একক শক্তি হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সমর শক্তিতেও বৈশ্বিকভাবে আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে জাতিসংঘের নানান প্রতিষ্ঠান সহ বিশেষত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একক ক্ষমতাধর পরিচালকের দায়িত্ব লাভ করে সমগ্র বিশ্বের পুঁজির শান্তি রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দাবী মতো ও অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব পুলিশ রাষ্ট্রত্রয়ের মুল পান্ডা তথা বিশ্ব পুলিশ বাহিনীর সুপ্রিম আধিকারিক এর স্থান করায়ত্ত করেছিল । ফলে- ১৯৩০, এর পূর্ববর্তী দুনিয়ায় যেমন বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণী পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হিসাবে স্ব-স্ব অবস্থান রক্ষা করার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারতো, ১৯৪৫ সালের পরে সেইরূপ সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে সমগ্র দুনিয়ার বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রী হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াত সুযোগ লাভ করায় **একদা অপরিহার্য উপনিবেশের প্রয়োজন ও আবশ্যকতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নি:শেষ হয়ে উঠে।**

পুঁজিবাদের পরিণতি-বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযুক্ত বৈষয়িক শর্ত সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মার্কস-এ্যাংগেলসদের যুগেই ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে অক্ষম-অযোগ্য হয়ে বার্ধক্য দশায় উপনীত হয়েছিল। অথচ, ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক চক্র ও লেনিনবাদের বদৌলতে অতিবৃদ্ধ ও চরম প্রতিক্রিয়শীল পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়ে বিপন্ন পুঁজিবাদী মালিকানা রক্ষার স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও শোষণমূলক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার স্ববিরোধী চরিত্র ও আন্ত:বিরোধ-বৈরীতার অবসানের সুযোগ নাই বলেই অন্ত:দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কলহ হতে মুক্তি পায়নি দুনিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী।

কারণ, দুনিয়ার সকল পুঁজিপতি বা তাদের ট্রাষ্ট, সিন্ডিকেট বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, সকলেই স্ব-স্ব মালিকানাধীন পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদনে ও সঞ্চলনে বাধ্য বিধায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সন্দেহভাজন ও কঠোর সার্ভিলেন্সে- অধীন ও নিয়ন্ত্রণে থেকে উল্লেখিত নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্বকে যেমন ফাঁকি-জুঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, তেমন পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত উৎপাদন সংঘটন করে বলেই বিশ্ব ব্যাংকের জন্মের পর এ পর্যন্ত কয়েকবার সংকট-সমস্যা ও মন্দায় নিপতিত হয়েছে- বিশ্ব পুঁজিবাদ। তবে, অনুরূপ মন্দা হতে রেহাই পেতে উপনিবেশিক আমলের মতো বিশ্ব যুদ্ধ তথা ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ করতে হয়নি। বরং, বিশ্ব নিয়ন্ত্রকদের নিয়ন্ত্রণ অমান্য-অকার্যকরকারীদের কঠোর হস্তে দমন-নিয়ন্ত্রণ

করার জন্য তারা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো দন্ড বিধানকারী প্রতিষ্ঠান। একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে পুঁজি-পণ্যের অবাধ বিচরণ ভূমি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমিক ধাপ সহ রূপকল্পও প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে।

ফলে- যুক্তরাষ্ট্রও স্বীয় অতীতের ২য় স্বাধীনতার নীতি তথা " সংরক্ষণ নীতি" বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই কেন্দ্রীভূত পুঁজির প্রাধান্যে ও আধিক্যে, অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রেই পুঁজি-পণ্যের অত্যাধিক মজুত সৃষ্টি হয়ে আসছে বলেই মজুত ও মন্দা সংকট হতে রেহাই পেতে সংরক্ষণ নীতি পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না যুক্তরাষ্ট্রেরও । অত:পর, স্বীয় মজুত সংকট হতে রেহাই পেতেই উপনিবেশিক নীতির মতোই বৃদ্ধ পুঁজিবাদ স্বীয় রক্ষক খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাধ্য করেছে " সংরক্ষণ নীতি" বাতিল ও অকার্যকর করতে।

তবে, এসকল কাজ করতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি ও ব্যবহার করার মাধ্যমে পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন দ্রুততর ও সহজতর করার আবশ্যকতায় বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ মোবাইল-ইন্টারনেট সমেত নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং বৈপ্লবিক রূপান্তর ও উন্নয়নের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণী সমগ্র দুনিয়ার বাজার ও ভোগ্য ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধন করে বিশ্ব বাজারকে সরাসরি সম্পর্কাধীন করে, তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে বা দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করেছে। ফলে, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তথ্য-প্রযুক্তির জালে আটক-আবদ্ধ দুনিয়ায় বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বিশেষ কর্তৃক পরিত্যাক্ত উপনিবেশিক নীতির মতোই সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করার সুযোগ নাই। তাই,পুঁজির বিকাশে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী উপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করেছিল, তেমন পুঁজির মরণদশায় খোদ পুঁজিবাদই স্বয়ং উপনিবেশিক নীতির অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে বলেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী ছোট-বড় পুলিশী রাষ্ট্রের সংগঠন জি-২০ এর কনফারেন্সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান 'জাতীয় রাষ্ট্র'সম্পর্কে অমন ভয়ানক সত্য বক্তব্য দিতে পারলেন। পুঁজির জন্মদোষেই পুঁজিপতি শ্রেণী স্বার্থান্ধ, ভন্ড ও প্রতারক। তাই, উপনিবেশিকতার পরিসমাপ্তির কথা সরাসরি না বলে অথচ পরিসমাপ্তির নীতি কার্যকরণে ২য় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি যারা কার্যত সকল জাত-জাতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ সমেত নানাবিধ বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল, সেই বিজয়ীরাই লেনিনীয় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও জাতীয় মুক্তি ইত্যকার শব্দরাজি জাতিসংঘের সনদভুক্ত করে; রুশী কমিউনিস্ট লেনিন যেমন তাঁর "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ২য় কংগ্রেস" নিবন্ধে লিখেছিলেন - " কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের উপনিবেশের বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করা উচিৎ" তেমন লেনিনীয় উচিৎ কর্মটি সম্পাদনে লেনিনবাদীদের বৈশ্বিক কর্তব্যের দায়-ভার কাঁধে নিয়ে বিজয়ীদের মধ্যে ষ্ট্যালিন ছাড়া আর কেউ লেনিনবাদী কমিউনিস্ট না হলেও ভুয়া সমাজতন্ত্রী লেনিনের মতোই বিশ্বের জাতি সমূহের ভুয়া মুক্তির ভুয়া সনদ রচনা করেছিল সকল জাত-জাতির অধীনতা নিশ্চিতকারী জাতিসংঘের সনদ প্রণেতারা।

ফলে- ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই সমগ্র দুনিয়ায় মহামারির মতো শুরু হয় তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক প্রবাহ ও প্রভাব। এবং পুঁজিবাদীদের প্রয়াশ-প্রচেষ্টায় দুনিয়ায় পত্তন হয় অনেক অনেক তথাকথিত "স্বাধীন" ও " সার্বভৌম" রাষ্ট্র। যদিও নব্য স্বাধীনরা

কমবেশ প্রতেকেই জাতিসংঘের সদস্যসহ বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করেছিল বা তা লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে যারপর নাই চেষ্টা-তদবির করেছিল বলে তারা সকলেই মেনে নিয়েছিল বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ।

বিগত শতকে মুসলিম অধ্যুসিত দেশসমুহের বহু দেশেই সেনা অভ্যুত্থানের হোতাগণ ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেও তাতে পুঁজিতন্ত্রের যেমন ক্ষতি হয়নি, তেমনি ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত হলেও লেনিনীয় জাতীয় মুক্তির রাজনীতির অনুকুলে অনেক - উপনিবেশ "জাতীয় মুক্তি"অর্জন করেছে রূপ দাবী করে, নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ও যোগাযোগ ও ভারী শিল্প কল-কারখানা সহ নানান ধরনের প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কায়েম করে রাষ্ট্রীক কর্তৃত্বকারীদের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের সুযোগে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে জনজীবনে ভয়ানক দুর্ভোগ-দুর্দশা বাড়ানো সত্ত্বেও অনুরূপ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে 'সমাজতন্ত্র ' লিখে দিয়েছে।

ফ্রান্স প্লেবিয়ান বিপ্লবীদের চরমপন্থী নেতা শহীদ বাবেউফেরও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সরাসরি ধারক-বাহক ৩য় আন্তর্জাতিকের ইস্তাহার এবং লেনিনের নিদান মতো সদ্য স্বাধীন এই সকল রাষ্ট্রগুলো নি:সন্দেহে সমাজতান্ত্রিক ছিল। লিবিয়ার সামরিক স্বৈরতন্ত্রী গাদ্দাফীও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ১৯৬৯ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদে-২ দ্বারা রাষ্ট্র ধর্ম-ইসলাম ঘোষণা করে, অনুচ্ছেদ-৮ দ্বারা ইসলামি শরীয়া মতো উত্তরাধিকার সহ শোষণমুক্ত ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপর সমাজের অগ্রগতির ভিত্তি ঘোষণা দিয়ে, অনুচ্ছেদ-৭ দ্বারা রাষ্ট্রিক খাতের গুরত্বারোপ করে, অনুচ্ছেদ-৬ দ্বারা লিবিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

নব্য স্বাধীন ইন্দোনিশিয়ার সুকর্ণ সরকারের ছোট তরফের পার্টনার লেনিনবাদী আইদিতদের কমিউনিস্ট পার্টি - সুকর্ণের ১৯৬০ সালের ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসুচী- "নাসাকম" অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও সাম্যবাদ' সমর্থন করেছিল।

ফলে- বুর্জোয়া নেতা সুকর্ণ ও আইদিতের মধ্যে যেমন ফারাক থাকে না, তেমন গাদ্দাফির সাথে লেনিনের তফাত বা ফারাক থাকার কারণ নাই। একজন 'ইসলাম ও জনগণ' এর নামে, আরেকজন- 'সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক-কৃষক ও সেনাবাহিনী'র নামে রাষ্ট্রিক পুঁজিতন্ত্র কায়েম করেছিল। তবে, নাম যাহাই হোক না কেন, এদের ক্রিয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি, বা জনদুর্ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমেছিল কি?

লেনিনের সমাজতন্ত্রের সাথে তফাতহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে শ্রম শক্তির একচ্ছত্র ক্রেতা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বে শ্রম শক্তির মজুরি নির্ধারিত হতো ও হয়। অথচ, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে ইংরেজীতে বর্ণিত এই: " There can no longer be any wage labor when there is no longer any capital." And-

" But if selling and buying disappears, free selling and buying disapperas also." And –

" In this sense, the theory of the Communist may be summed up in the single sentence: Abolition of private property."

যথাক্রমে বাক্য ৩টির বঙ্গানুবাদ মস্কো হতে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যা আছে –
"যখন পুঁজি থাকবে না তখন মজুরি শ্রমও আর থাকতে পারে না।" এবং
" কিন্তু বেচাকেনাই লোপ পায় , তবে অবাধ বেচাকেনাও থাকবে না।" এবং
" এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।"
তবে, 'লোপ' আর 'অদৃশ্য'; 'উচ্ছেদ' আর 'বিলোপ সাধন' নিকটতম অর্থ প্রকাশক শব্দ হলেও সম্পূর্ণত একই রকম মর্মার্থ প্রকাশক নয় । কাজেই, শব্দগুলোর যথার্থ অনুবাদ ব্যবহার করা হলে বিবৃত বিষয়টি আরো সহজ ও স্পষ্ট হতো। উপরন্ত, হুবুহু বাক্য বিবৃত নাই কলকতা হতে অনুদিত ইস্তাহারে।
বেচাকেনার লোপ মানে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থার তথা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও বিলোপ সাধন । ফলে–সমাজে শ্রম শক্তির বিক্রেতা–শ্রমিক ও শ্রম শক্তির ক্রেতা– মালিক, এই দুই শ্রেণীর কেউই অবশিষ্ট থাকছে না বলে শোষণ–শাসন মুক্ত সমাজের সকল সদস্য কেবলই মুক্ত–স্বাধীন মানব জাতির সদস্য ছাড়া জাত–জাতি, ধর্ম–বর্ণ ও লিংগ পরিচয়ের সকল সংকীর্ণতা–সীমাবদ্ধতা ও পশ্চাৎপদতা মুক্ত মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।
কাজেই, সামাজিক প্রয়োজনে পরিকল্পিত উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিকানা– বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর বা রাষ্ট্রের নয়, বরং সমাজের সকল মানুষের মালিকানা তথা সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে; এবং সমাজের সকলের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কর্মক্ষম সকল মানুষের সম্মিলিত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে, সকল মানুষের কার্যকর ও প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বে ও কর্তৃত্বে জনগণের একটি সামাজিক সংস্থা কর্তৃক সকল ধরনের সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে বিধায় সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত কোন উৎপাদন হবে না, বলে সমাজতন্ত্রে– বেচাকেনার জন্য কোন পণ্য উৎপাদিত হওয়ার যেমন সুযোগ নাই, তেমন প্রয়োজনও নাই হেতু সমাজ হতে বেচাকেনা অদৃশ্য হবে।
সুতরাং, সমাজতন্ত্রে –শ্রম শক্তি বিক্রি হবে না, পণ্য উৎপাদিত হবে না, মুদ্রা বা মুদ্রা তুল্য কিছু থাকবে না, মালিকানার রূপ হবে– ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত নয়, সামাজিক বা সাধারণ, শ্রেণী শোষণ থাকবে না, তাই শোষণ–শাসনের জন্য আমলাতন্ত্র ,সেনা–পুলিশ, আইন–আদালত তথা রাষ্ট্র থাকবে না বা পুঁজিবাদের বয়োবৃদ্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদীতা–ব্যভিচারীতার দায়ে অন্তিম দশায় উপনীতি হয়ে স্বীয় এখতিয়ারে স্বীয় কর্ম সংঘটনে অক্ষম–অযোগ্য রাষ্ট্র রক্ষায় গঠিত হালের বিশ্বব্যাংক–আই.এম.এফ ইত্যকার প্রতিষ্ঠান সমেত ব্যক্তিমালিকানার সমর্থক ও স্বপক্ষীয় সংগঠন–প্রতিষ্ঠান থাকার সুযোগ থাকবে না। ফলে– রাষ্ট্রিক বাউন্ডারি মুক্ত সমগ্র বিশ্ব হবে ধরিত্রীর সকল মানুষের।
অথচ, লেনিনের রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে যেমন শ্রম শক্তি বেচাকেনার পণ্য ছিল, তেমন ব্যক্তি মালিকানাসমেত বেচাকেনা যথারীতি জারী ও বহাল ছিল এবং গান্দাফী, সুকর্ণ, ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিব,জেড.ভুট্রোদের সাংবিধানিক সমাজতন্ত্র সহ সকল রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রেও এসবের কোন কিছুই বিলুপ্ত বা অদৃশ্য হয়নি। কাজেই, এক্ষেত্রেও লেনিন ও লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট ইস্তাহার অকার্যকর–অস্বীকার করা বৈ মান্য ও কার্যকর করেছে?

লেনিনবাদী নীতিতে এবং ২য় আন্তর্জাতিক ও খোদ লেনিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জার্মান রাজার ভারতীয় সহযোগি- বন্ধুদের কয়েকজন সমেত কতিপয় ভারতীয়কে নিয়ে গঠিত ১৯২০ সালে, রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে সংগঠিত হওয়ার সূচনাকাল হতেই বৃটিশ উপনিবেশ হতে ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা লাভের রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি' রক্ষার স্বার্থে রুশ অধিপতি ষ্ট্যালিনের দেয় নির্দেশ ও ফতোয়ামতো অন্যান্য উপনিবেশের মতো ভারতের লেনিনবাদীরাও তাদের এতদিনকার শত্রু বৃটিশ এবং 'মিত্র শক্তির' বিরুদ্ধে লড়াই করার নীতির বিপরীতে ও পরিবর্তে মিত্রশক্তিকে সহযোগিতা করার নীতি তামিল করেছিল। তবু, তারা উপনিবেশ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির ধ্বজাদারী!

কলকতা হতে কমিউনিস্ট ইস্তাহার বাংলায় প্রকাশকারী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর সাধারণ সম্পাদক মি: প্রকাশ কারাতও রুশ লেনিনবাদীদের মতোই নিজেদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন কার্ল মার্কসকে জাতীয় মুক্তি তথা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শিখন্ডী বানাতে। তদার্থে একটি উৎকৃষ্ট নজির স্থাপন করেছেন তিনি তার দলীয় সাপ্তাহিক " পিপল'স ডেমোক্রেসি" র, ৩১ ভলিয়ম, নং-১৯, মে-১৩,২০০৭ সালে-

"1857: In The Hearts And Minds Of People" শিরোনামে লিখেন-

"THE significance of 1857 is that it was the first major national revolt against British colonialism. All through the 18th and 19th centuries, there were a series of uprisings against the British. These began with the Sanyasi rebellions which took place in the last three decades of the 18th century. These revolts punctuated the early efforts of the East India Company to extend its domination all over the country. On the eve of the 1857 revolt by the Bengal Army, there took place the great Santhal rebellion of 1854-55. 15,000 Santhalis were slaughtered by the British in putting down the uprising.

NATIONAL REVOLT

As against these uprisings, the 1857 revolt assumed the character of a national revolt. It is a remarkable coincidence of history that the founder of scientific socialism who began his studies on India in 1853 got drawn to the revolt in India

which he termed "not a military mutiny, but a national revolt". In a series of articles in the New York Daily Tribune, Karl Marx wrote with sympathy for the people of India suffering under the rapacious loot of the East India Company." And – " The 1857 revolt can be called the first war of independence because it covered a huge area stretching from Bengal to the Punjab, involving lakhs of people."

And-" It was the ordinary people, both Hindus and Muslims, who fought valiantly and bore the brunt of the British repression."

And-

" The 1857 revolt bore the hallmark of such rebellions. Though fought by "peasants in uniform", they relied on traditional leaders and religious symbols. India was still in the pre-capitalist stage, where only such feudal princes and talukdars could provide the leadership. It was "national in character" neither in the sense of a movement for a nation state nor of the nationalism of the 20th century, but because of the way classes came together from the feudals to the peasants and the artisans, all of whom experienced the rapacity of the colonial rule." And-

"It is necessary to talk about this legacy because the ruling classes and the official ideologues want to observe 1857 by making it devoid of its "anti-imperialist" content. It reduces the revolt to "heroes" and "heroines" who fought the oppressor without the context of what India is experiencing 150 years later. At a time the Indian ruling classes are espousing collaboration and surrender to the descendents of

the marauding colonial powers, it is time to remind them that the ordinary people of India still carry with them the spirit and essence of 1857 in their hearts and minds."

উল্লেখ্য- অত্র নিবন্ধে মার্কস-এ্যাংগেলসের " উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকের প্রকাশকের 'ভূমিকা'য়, বিবৃত এতদসংক্রান্ত ভুয়া ও বানোয়াটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে ঐ সকল উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য বিষয়ে আমরা ঐ বইয়েই মার্কসরা যে সকল মতামত লিখেছিলেন, মার্কসদের সে সকল মতামত ও বক্তব্য দ্বারা প্রকাশকের ভূমিকাস্ত বিবৃতি যথার্থভাবে খন্ডন ও মিথ্যা হিসাবে প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করেছি। কিন্তু, জনাব প্রকাশ কারাত তার উল্লিখিত নিবন্ধে আমরা যা খন্ডন করেছি ঐ সকল অসত্য বক্তব্যও যথাযথ সূত্র উল্লেখ না করেই মার্কসের জবানী হিসাবে বিবৃত করেছেন এবং সে মোতাবেক মার্কসের নামেই নিজস্ব দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্ত হাজির করেছেন।

দলীয় ঘোষণামূলে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের পাহারাদার ও প্রতিনিধি হলেও দলীয় মুখপত্রের নাম যেমন "পিপল'স ডেমোক্রেসি" তেমনি- ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী নয়, "জনগণ" এর " হার্ট" ও "মাইন্ড"- এ, ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে'র বীরত্বগাঁথা ও স্মৃতি কতটামাত্রায় জাগরুক আছে তা প্রমাণ, সে বিষয়ে দলীয় মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভংগি প্রকাশ এবং ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামিদের প্রতি ভারতীয় বুর্জোয়াদের বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মাদি অর্থাৎ ভারতীয় বুর্জোয়ারা ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামের "এন্টি-ইম্পেরিয়েলিস্ট" কন্টেন্ট পরিহার করা সহ সেই পুরানো লুণ্ঠনকারী উপনিবেশিক শক্তির বংশধরদের নিকট আত্ম-সমর্পন ও তাদের সাথে সহযোগিতা করছে বলেই ঐ ঘটনার ১৫০ বছর পরেও ভারতে কেবলমাত্র সি.পি.আই (এম) এবং সি.পি.আই(এম) পন্থীরাই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতার সোল এজেন্ট, তা প্রতিপন্ন করা।

যদিও তারই মূল্যায়িত নতুন-পুরাতন, কি ভারতীয় বা ইংলন্ডীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পারস্পারিক যোগসাজসী হয়ে এখনো ভারতের জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠন করছে বলেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণী নয়, ভারতীয় 'জনগণে'র মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণে তারাই একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত দল ও নেতা। তবে, তিনি দাবী করেছেন যে, সাবেক উপনিবেশিক শক্তি, রাজনৈতিকভাবে ভারত ছেড়ে গেলেও কার্যত, তারা ভারতে উপস্থিত এবং এখানকার বুর্জোয়ারাও তাদেরই ছোট তরফের পার্টনার।

অত:পর, উপনিবেশ হতে মুক্তি বা জাতীয় মুক্তির নামে ইত্যকার লেনিনীয় রাজনীতি ও জাতি সংঘের সনদ যতই প্রণীত হোক কার্যত, পুঁজিবাদী শোষণ হতে যেমন মুক্তি পায়নি ভারত, তেমন জাতিগত মুক্তিও অর্জিত হয়নি বরং সকল জাতির সকল বুর্জোয়ার স্বার্থ চরিতার্থ ও সংরক্ষণে বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠন-বিশ্বব্যাংক-আই.এ.এফ ইত্যাদির কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো বলেই জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির নামে গঠিত ও সৃষ্ট অপরাপর নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো কেবলই দেশী-বিদেশী সকল বুর্জোয়ার স্বার্থের পাহাদার ও রক্ষক বৈ অন্য কিছুই নয়। কাজেই, উপনিবেশিক প্রভুদের সহিত ভারতীয় বুর্জোয়াদের যোগসাজসীতার উল্লেখ করে অবচেতনভাবে হলেও কারাত বাবু স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশ্বিক চরিত্র ও এখতিয়ার এবং সকল জাতির জাত-জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। ফলে- জাতীয় মুক্তি যেমন অর্জিত হয়নি, তেমন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ

অধিকার ইত্যকার শব্দরাজি কেবলই ভুয়া বা কাগজী বিষয় বলেই প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন হয়েছে বিধায় জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত সকল বক্তব্য কেবলই বানোয়াটি ও মিথ্যাচার হিসাবে নিশ্চিত হয়েছে বলেই যথার্থ ও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে মার্কসদের রচিত ইস্তাহারের এতদ্বিষয়ক বক্তব্য।

মহাভারত, রামায়ন, শ্রী কৃষ্ণ সাংকীর্তন, ইত্যাদিতে প্রেম-ভালোবাসা, দু:খ-বেদনা, অনুভুতি-স্মৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে " হার্ট" এর মহিমা ও গুরত্ব , গুরুত্বসহ বিবৃত আছে, কিন্তু এনাটমি- হার্টকে অমন কর্মাদির দৈহিক উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। তবু, ভারতের স্বাধীনতা পন্থী ও জনগণের অন্তর্যামি, জনগণের হৃদয় পুঁজারি এবং হৃদয়ের কারবারী ও ব্যবসায়ী - 'বস্তুবাদী' কারাত বাবুরা হৃদয় দ্বারা রাজনীতি ও ইতিহাস অনুধাবন করবেন এবং বিচার্য বিষয়ে বস্তুত কি হয়েছিল তার অনুসন্ধান না করে বা খোলা চোখে বর্তমান দুনিয়ার এককেন্দ্রীক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈশ্বিক সমাজতন্ত্র না দেখে বরং পুঁজিবাদ বিষয়ে হৃদয় ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার ঘটাবেন, এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শান্তি ইত্যাদির মতো হৃদয়গ্রাহী বিষয়াদি আজগুবিভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মরণোত্তর দেবতা হবেন, জীবন্ত দাসদের হৃদয়ে স্থায়ী ঠাঁই করে নিতে শ্রী রাম-শ্রী কৃষ্ণদের অনুকরণে মাটির মুর্তির আদলেই নানান বৈচিত্রে ও চাকচিক্যে নানান ভাবে নানান স্থানে ও নানান মিডিয়ায় প্রদর্শিত ও স্থাপিত হবেন এবং দুর্ভাগা ভক্তকুলের হৃদয়ে চির জাগরুক থেকে তাদের পুঁজন-ভজনে চির মহিমান্বিত ও চির স্মরিত হতেই থাকবেন।

মি:প্রকাশ কারাতের বক্তব্য যে, মার্কসদের বক্তব্যের বিকৃতি, তাতো অত্র নিবন্ধে ইতো:পূর্বে "উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তক হতে উদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারাই নিশ্চিত হয় বলেই ভারত বা উপনিবেশিকতা বিষয়ে মার্কসের বক্তব্যের সহিত কারাত বাবুদের বক্তব্য কেবল অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, সাংঘর্ষিকও বটে এবং সন্দেহাতীতভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বানোয়াটি। তবু, আমরা উদ্ধৃত বক্তব্য বিষয়ে আপাত:ত কোন মন্তব্য না করে বরং এই বিষয়ে কারাত বাবুদের গুরু কীর্তিমান মস্কোওয়ালাদের যতকিঞ্চিত কীর্তি দেখতে পারি: সম্পাদনা ও প্রকাশের সাল-তারিখ নাই, তবে প্রগতি প্রকাশন, মস্কো কর্তৃক প্রকাশিত "উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকের কতিপয় নিবন্ধ বিযুক্ত ও নতুন কয়েকটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করে- "ভূমিকা" এর নীচে " সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট" মুদ্রিত " প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ" নামে একটি পুস্তক মার্ক্সিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ-এ রক্ষিত আছে। তাতে যে ভূমিকাটি আছে তা হতে নিম্নে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল:

" ভারতে ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি বিদ্রোহের ওপর কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস (New York Daliy Tribune) পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন," এবং

" ১৮৫০ এর দশকের শুরু থেকেই মার্কস-এ্যাংগেলস পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশিক কর্মনীতি ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সর্বদাই খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।" এবং সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে -

" তাঁদের মতে-১৮৫০ এর দশকে প্রায় সারা এশিয়ায় নিপীড়িত জাতিগুলির যে সাধারণ উপনিবেশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম আত্ম প্রকাশ করেছিল, তারই একটা অংশ হল এ

অভ্যুত্থান।" এবং নির্দিষ্ট কোনো নিবন্ধের উল্লেখ না করে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ঢালাওভাবে মার্কসের জবানী রূপ বক্তব্য এই:

" ভারতীয় অর্থনীতির এক একটা সমগ্র শাখা ভেংগে পড়ে, চূড়ান্ত রকমের দরিদ্র হয়ে পড়ে এই সুবিশাল, সমৃদ্ধ ও প্রাচীন দেশটির জনগণ।" এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সিপাহীদের ভূমিকা বিষয়ে এই:

" মার্কস কিন্তু দেখান যে, সিপাহীরা হাতিয়ারের বেশী কিছু নয়, (ভারত প্রশ্ন) অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ভারতীয় জনগণ, অসহনীয় উপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে নামে। বৃটিশ শাসক শ্রেণীরা অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহ রূপে দেখাতে চায়,তার সংগে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা-লুকাতে চায় তারা- এদের এই মিথ্যা দাবির খন্ডন করেন মার্কস ও এ্যাংগেলস।" এবং

" ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামে মার্কস ও এ্যাংগেলসের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ছিল । তাঁদের আশা ছিল বিপ্লব বিজয়ী হবে। " এবং ভারতীয় মুক্তি সংগ্রাম সহ সামগ্রীকভাবে উপনিবেশের বিরুদ্ধে মার্কসদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য এই:

"মার্কস ও এ্যাংগেলস ছিলেন উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অবিচল যোদ্ধা, উপনিবেশিক দাসত্ব থেকে ভারতীয় জনগণের মুক্তিতে তাঁদের দৃঢ় আস্থা ছিল।"

অথচ এহেন "অবিচল" যুদ্ধারা আমৃত্যু তদ্বিষয়ে ন্যূনতম একখানি পুস্তকও লিখার তাগিদ বোধ করেনি! বরং, উল্লেখিত নিবন্ধাদি প্রকাশের বেশ কয়েক বছর পর মার্কসের পুঁজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রগতি প্রকাশন, মস্কো হতে ১৯৮৮ সালে বাংলায় প্রকাশিত পুঁজির "১ম খন্ড, ২য় অংশ. অধ্যায় ৩৩। উপনিবেশ স্থাপনের আধুনিক তত্ত্ব", পৃষ্ঠা-৩৩৯ এ বিবৃত এই: " যাই হোক, এখানে আমরা উপনিবেশগুলির অবস্থা নিয়ে চিন্তিত নই। এখানে একমাত্র যে জিনিষটা আমাদের কৌতূহলের বিষয় তা হল পুরনো জগতের অর্থশাস্ত্র নতুন জগতে যে গুপ্ত তত্ত্ব আবিস্কার করেছে এবং তারস্বরে যা ঘোষণা করেছে: উৎপাদন ও সঞ্চয়নের পুঁজিবাদী প্রণালী, এবং সেই হেতু, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মুল শর্ত হল স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ:"

একই পুস্তকে পুঁজিবাদী সমাজের নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তত্ত্বটি মার্কস লিপিবদ্ধ করলেও এমনকি অত্র " উপনিবেশ-স্থাপনের তত্ত্ব"-এ, ভুল করে হলেও উপনিবেশ হতে মুক্তি বা জাতীয় মুক্তি বা উপনিবেশের জনগণের মুক্তি ইত্যকার একটি শব্দও খরচ করেননি। তৎসত্ত্বেও, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, মস্কোর লেনিনবাদীদের উপরোল্লেখিত দাবী মতো "উপনিবেশিক দাসত্ব থেকে ভারতীয় জনগণের মুক্তিতে তাঁদের দৃঢ় আস্থা ছিল।" অর্থাৎ মার্কসদের? (!!!)

প্রকাশ কারাত বাবু তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন ১৮৫৩ সাল হতে মার্কস ভারত বিষয়ে ষ্ট্যাডি শুরু করেছেন; আর মস্কোর লেনিনবাদী ইনষ্টিটিউট বলছে -১৮৫০ দশকে হতে উপনিবেশিক কর্মনীতি ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি বিষয়ে মার্কসরা আগ্রহী হয়ে উঠেন। যদি, তাদের উভয়ের দাবী সত্য হয়, তবেতো ভারত বা ভারতের মতো উপনিবেশ সমূহের অবস্থা-ব্যবস্থা না জেনেই মার্কসরা বিশ্ব পুঁজিবাদ সম্পর্কে ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে অসম্পূর্ণ ও ভুল বিবৃতি প্রদান করা সহ পুঁজিবাদ হতে

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বানোয়াটি বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন বলেই খুবই সংগত ও যুক্তিযুক্ত কারণে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিবরণ অসত্য ও বানোয়াটি।

যদি-তাই হয়, তবে আর এমন আনাড়ি এবং ভারত-চীন সমেত তাবৎ বিশ্ব ও পুঁজিবাদ বিষয়ে অজ্ঞ মার্কসদের রচিত এবং " উপনিবেশিকতা বিরোধী ও নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তির" নীতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচি বিহীন বা তদ্রুপ নীতির স্বীকৃতি বিহীন বা অনুমোদনহীন , নিদেনপক্ষে তদ্বিষয়ে উল্লেখবিহীন উক্ত ইস্তাহারখানিকে অসত্য-বানোয়াটি বক্তব্যের এক সারবস্তুহীন পুস্তক হিসাবে ঘোষণা করে তা সরাসরি প্রত্যাখান না করে বরং উভয় পার্টিই মার্কসদের প্রণীত ইস্তাহারখানি বাংলাও অনুবাদ করেছেন, কেন ? অথবা, মার্কস-এ্যাংগেলস তাদের জীবৎদর্শায় বহুবার কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ভূমিকা লিখেছেন,তবু কারাত বাবুদের এদ্বিষয়ক বক্তব্য বা দাবী সত্য হয়ে থাকলে মার্কসরা তাদের এহেন নবাবিস্কৃত {(!), (?) } ও উপনিবেশের জনগণের মুক্তির "জাতীয় মুক্তির"-এমন অতীব গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্বখানি, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেননি কেন, বা নিদেনপক্ষে ইস্তাহারের এতগুলো সংস্করণের কোনো একটি ভূমিকায়ও সে বিষয়ে সামান্যতম উল্লেখ করেননি কেন? অথবা এমনকি ভারত বিষয়ে পড়াশুনা না করে পুঁজিবাদের বিশ্ব জয় ও বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয় ও বিনাশ বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে অসত্য ও বানোয়াটি বক্তব্য প্রদানের দায়ে নিতান্ত দু:খ প্রকাশও করেননি কেন? আবার মার্কস-এ্যাংগেলস যদি পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী ক্রিয়া কর্ম এবং উপনিবেশের নিপীড়ত জাতিগুলোর সামগ্রীক অবস্থা না জেনেই কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত থেকে উপনিবেশের নিপীড়ত পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা অস্বীকার করে কমিউনিস্ট ইস্তাহার খানি রচনা করে থাকেন, এবং পরবর্তীতে তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে পড়া-শুনা করা সহ "অবিচল" যুদ্ধাও হয়ে থাকেন, তবু, এই নব উপলব্ধির নতুন তত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কোন সংস্করণে অন্ত:ত ভূমিকায়ও তা উল্লেখ করার তাগিদ বোধ না করেন , তা-হলেতো তাদের উপলব্ধি নিয়ে যেমন সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি তাদের দৃষ্টিভংগি, একাগ্রতা ও সততা নিয়েও ঘোরতর সন্দেহ না জন্মানোর কারণ নাই।

অত:পর, মার্কসদের পড়াশুনা বা আগ্রহ বিষয়ে কারাত বাবুদের দাবী যদি সত্যিই, সত্য হয়, তবে এহেন অজ্ঞ, বা দুরন্ধর মার্কসদের তত্ত্ব বিষয়ে সন্দিহান না হয়ে কারাত বাবুদের মতো যারা নিজেদেরকে "মার্কসবাদী" হিসাবে ঘোষণা করে, তাদের ঘোষণার বদ উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ না থাকার কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। তবে, মানুষ ও বিজ্ঞানী মার্কসকে দেবতা বানিয়ে যারা নিজেদেরকে মার্কসবাদী মোড়ল-ব্রাক্ষণ সাজায়, তারা শ্রমিক শ্রেণীর দুশমন না হয়ে মিত্র হওয়ার সামান্যতম যোগ্যতা রাখে কি?

মার্কস ও এ্যাংগেলসের মতামতের নিরিখে সি.পি.এস. ইউ এবং সি. পি. আই (এম) এর উপরোল্লেখিত বক্তব্য পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করার পুর্বে এতদ্বিষয়ে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রাসংগিক বলেই নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ-

ভারতীয় আর্য সমাজ পন্থী ও লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের অন্যতম প্রোডাক্ট এবং ১৯০৬ সালে লন্ডনে ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় হিন্দু মহাসভার ১৯৩৭ হতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সভাপতি- মি: ভি.ডি. সাভারকার লিখেছিলেন " দি

গোল্ডেন পিরিয়ডস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী" এবং " ১৮৫৭-দি ফার্ষ্ট ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স" ।

২য় বইটি ১৯০৯ সালে হলান্ড,জার্মানী ও ফ্রান্স হতে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘনীভূত পুঁজির চরিত্র দোষে দেশ ৩টি ছিল ইংলন্ডের প্রতিপক্ষ বা শত্রু পক্ষ। অত:পর, মার্কসদের বিষয়ে কারাত বাবুদের জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব বা সূত্র যদি সত্যি হয়, তবেতো মি: সাভারকার যেমন মার্কসদের যথার্থ অনুগামি ও অনুসারী হিসাবে স্বীকৃত না হওয়ার কারণ নাই, তেমন কারাত বাবুদের সাথে হিন্দু মহাসভা বা ভারতীয় জনতা পার্টির অন্তত এক্ষেত্রে বিরোধ নাই।

কারাত বাবুরা, যখন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৫০ বছর উদযাপনে রচিত আলোচিত নিবন্ধে ঐ সংগ্রামে জীবনদায়ী অর্ডিনারী সিপাহী মংগল পান্ডের নাম উল্লেখ না করলেও ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাই বা নানা সাহিবকে স্মরণ করতে কসুর করেননি, তেমন ভারত সরকারও বেশ ঝাঁক-জমকভাবেই পালন করেছে দেড়শততম বছর পূর্তি। আচার-অনুষ্ঠান ও পূঁজন-ভজনে বাদ যায়নি বাংলাদেশের নানান ঘরানার লেনিনবাদী-মাওপন্থীরাও।তবেতো ভারতের সরকারে অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া, হিন্দুত্ববাদী মহাসভা ও সি.পি.আই (এম) এবং বাংলাদেশের লেনিনবাদী-মাওপন্থী সকলেই এই বিষয়ে সহমত পোষণকারী বলেই সকলেই, মার্কসদের কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির ধারক-বাহক বলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত যেমন শ্রমিক শ্রেণীর ফারাক থাকে না বলেই কারাত বাবুরা পিপলস ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাসী হতে অসুবিধা হয় না। আবার, পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর এহেন রাজনৈতিক মিতালীর তাত্ত্বিক গুরু যদি হয়ে থাকেন মার্কস-এ্যাংগেলস,তবেতো মার্কসদের পরিচয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানী নয়,বরং শ্রমিক শ্রেণীর শোষক-শত্রু পুঁজিপতি শ্রেণীর বন্ধু হওয়াই শ্রেয় নয় কি ? মস্কোর লেনিনবাদীরাতো তাই মনে করে বলেই নেহেরু-জিন্নাহকে মার্কসদের স্বপ্নের রূপকার ও কারিগর হিসাবে স্বীকার করে উল্লেখিত বইয়ের ভূমিকার শেষ প্যারায় লিখেছে- " ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের শতবার্ষিকী ভারতীয় জনগণ উদ্‌যাপন করেন যে পরিস্থিতিতে তখন উপনিবেশিকতা থেকে ভারত মুক্তি বিষয়ে মহান প্রলেতারীয় নেতার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে গেছে। উপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও দীর্ঘায়িত সংগ্রামে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভারত, অটল হয়ে পা দিয়েছে স্বাধীন জাতীয় বিকাশের রাস্তায়।"

অথচ, গোয়াসহ ভারতে পুর্তগালের উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলো ১৯৬১ সালের পূর্বে ভারতভুক্ত হয়নি বলে ভারতের সকল অংশ যেমন ১৯৪৭ সালে ভারতভুক্ত হয়নি, তেমন পাকিস্তান ও ভুটান ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলেই ভারত -অখন্ডও থাকেনি। তাছাড়া- ১৯৪৫ সালেই ভারত আই.এম.এফের সদস্য পদ লাভ করেছিল বিধায় সাভারকারদের উত্তরসূরি ভারতের জনতা পার্টির মি: অটল বিহারি বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের রাস্তায় ভারতের "অটল হয়ে পা" দেওয়াটা নিছকই বানোয়াটি গাল-গল্প ও মিথ্যাচার ।

উপরন্ত, ভারত বিষয়ে এমন স্বপ্নই যদি দেখে থাকেন মার্কস, তবে তিনি জননেতা না হয়ে " মহান প্রলেতারীয় নেতা" হতে গেলেন কেন? অথবা, আমেরিকা-ভারত ইত্যকার দখল তথা উপনিবেশিকতা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে বিশ্বকে পুঁজিবাদী বাজারভুক্ত করে,

বিশ্বের প্রতিটি জাতিকে একই বিশ্বজোড়া সম্পর্কের আওতায় নিপতিত করে, প্রত্যেককে আন্ত:নির্ভরশীলতায় নির্ভরশীল করার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদী ধাঁছে গড়ে নেওয়ায় অর্ধ সভ্য ও অর্ধ বর্বর জাতিগুলোকে সভ্যতার পথে নিয়ে এসে সমগ্র দুনিয়া হতে প্রকৃতি শোভন সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পুঁজিপতি শ্রেণী, যুদ্ধ, হত্যা-খুন, লুণ্ঠন ইত্যকার যাবতীয় দুস্কর্ম করা সত্ত্বেও 'ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে' বলে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কসরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তা কি যথার্থ ও সঠিক হওয়ার কোন যুক্তি থাকে, না কি পুঁজিবাদের প্রকৃত চিত্র অংকন না করে তারা, কেবলই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলে অমন বক্তব্য দিয়েছিলেন? অথবা, পুঁজিবাদের সূচনা ও বিকাশকারী দেশগুলোর বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলই চেংগিস-বাবরদের মতো পররাজ্য গ্রাস ও দখল করেই ক্ষান্ত ছিল, নাকি নিজ নিজ দেশেও প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিনাশ ঘটানো সমেত প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাভোগী অধিপতি-শোষক শ্রেণীকে পরাজিত-পরাস্ত করেছিল?

যে যুক্তিতে ভারত দখল ও ভারতের প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাভোগীদের পরাজিত ও পরাস্ত বা বশীকরণ করেছিল একই যুক্তি ও হেতুবাদে ইংলন্ড-ফ্রান্সের পুঁজিপতি শ্রেণী নিজ নিজ দেশেও একই কার্যাদি কম-বেশ সম্পন্ন করেছিল কি ? নিজ নিজ দেশেও চার্চ ও সামন্তীয় রাজার কর্তৃত্ব -শাসন আর নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রণীত আইন-বিধান ও বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক কাঠামো সমেত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার-বিকাশ সাধন করে পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে আবশ্যকীয় কাজগুলোও বুর্জোয়ারা করেছিল বলেই উপনিবেশিক শক্তি নিজেদের হীন স্বার্থবোধ হতেই ভারতেও ১৭৬০ সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা সহ পরবর্তীতে ভারতীয় দন্ডবিধি-১৮৬০, ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮, এবং দেওয়ানী কার্যবিধি ইত্যকার আইন-বিধি জারী ও বহাল করে যা-আজো ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে বহাল তবিয়ুতে বহাল আছে; এবং ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা কার্যক্রম চালু ও রেল, ব্যাংক ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে নাই?

উপনিবেশিক ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপনিবেশিক শক্তির স্বার্থ চরিতার্থকরণে বৃটিশ আই.সি.এস আধিকারিক হতে চাওয়া অরবিন্দু বাবুরা কেউ কেউ অকৃত কার্য হয়ে বা ব্রিটিশের শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপযুক্ত চাকুরী-নকরী না পাওয়ার ক্ষোভে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভুদের প্রতিযোগিতা না করতে বা উকিল-মোক্তার হিসাবে পেশাগত প্রতিযোগি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে কিঞ্চিত সুযোগ-সুবিধা বেশী মাত্রায় হাসিলে - বিট্রিশ তাড়িয়ে কেবলই হিন্দু মাতা-দেবী কালী ও দুর্গাদের আর্যভারত প্রতিষ্ঠার নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যুগান্তর-অনুশীলন সমিতি ইত্যাকার নানান সংগঠন এবং যথারীতি পুঁজিবাদী আন্ত:বিরোধীতা ও বৈরীতার সহজ-সরল ব্যাকরণের সূত্র মতো -বিশ্ববাজারে ইংলন্ডের প্রতিদ্বন্দ্বি জার্মানদের অর্থ-অস্ত্র সমেত নানান ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, কেবলই ভারতীয় জনগণের স্বার্থে, না কি , লেনিন যেমন রুশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাশিয়ায় কথিত 'জাতীয় পুঁজি'র বিকাশ সাধন সহ মজুত পুঁজির চাপে সংকটাপন্ন জার্মানীর পুঁজি-পণ্যের ডাম্পিং ল্যান্ড হিসাবে রাশিয়াকে ব্যবহারের অবারিত সুযোগ দিয়েছিলেন , তেমনই ভারতীয় পুঁজিপতিদের পুঁজির বহর প্রসারিত করা সমেত ভারতের বাজারকে জার্মানীর অনুকুলে প্রতিস্থাপনের জন্য?

তবে, সাভারকার যেমন লেনিনের উপনিবেশ বিরোধী রাজনীতির অনুচর হয়ে শ্রেণী চরিত্র দোষে দ্বিচারিতায় দুষ্ট ও অভিযুক্ত, তেমন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামি ও বিপ্লবী-এম.এন রায়রা লেনিনের বদান্যতায় ও সহযোগিতায় যেমন লেনিনদের প্রতিষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিকের কর্তা বনেছিলেন তেমন ভারতের লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার গুরুগীরি ও মোড়লগীরির সুযোগ লাভ করেছিলেন। আর ইংরেজের সেবক হিসাবে সরকারী চাকুরি জীবনের ষোলকলা পূর্ণ করে সাভারকার-অরবিন্দদের আদর্শিক গুরু বনে, সন্যাস বিদ্রোহের গুণকীর্তন করে নানান উপন্যাসাদি রচনা করা সমেত " বন্দে মা তরম" নামীয় পদ্যখানিও রচনা করেছিলেন বাংগালী পন্ডিত বঙ্কিম চাটুয্যে মহাশয়।

পুর্তগীজ- ইংরেজ বা ফ্রান্স এর পুঁজিপতিরা ভারত দখল করার পুর্বেতো আর থাক, জনৈক পুর্তগীজ- মানোএল কর্তৃক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা সমেত উপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক চালুকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যিক-নাট্যকারদের নাটক-উপন্যাস ইত্যকার সাহিত্যও সৃষ্টি হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু ও কার্যকরী করতে গিয়ে যা যা করেছিল তাহাই কেবলই মার্কসদের দৃষ্টিতে " খুবই বিপ্লবী" , নাকি পুঁজি বিকাশের আবশ্যকীয় শর্ত-উপনিবেশিক নীতি কার্যকর করে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদী ধাঁছে গড়ে নেওয়াটাও ঐতিহাসিক মানদন্ডেই বিপ্লবী কর্ম বলেই সেই বিপ্লবী কর্ম সম্পাদনকারী ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, সমগ্র জগতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আওতাভুক্ত করে অতীতের অভাব-অনটনের, প্রকৃতি শোভন-পিতৃতান্ত্রিক বা প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিনাশ ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্ব জয় এবং প্রকৃতিকেও জয় করার চেষ্টা করাসহ অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপাদন ঘটিয়ে শেষত পুন:পুন সংকটে পড়ে নিজেই নিজের বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদ- উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধনে পুঁজিপতি শ্রেণীর- অপরিহার্য সৃষ্ট ও শোষণের একমাত্র উপকরণ - শ্রমিক শ্রেণী, বৈশ্বিক ভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সাম্যবাদের ভিত্তি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বস্তুগত শর্ত বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরী করেছিল বলেই তদার্থে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত সমেত উপযুক্ত নীতি-কৌশল ও তত্ত্বাদি সম্পন্ন অত্র কমিউনিস্ট ইস্তাহার মার্কস-এ্যাংগেলসরা রচনা করেছিলেন?

কমিউনিস্ট ইস্তাহারে স্বনির্ভর বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতির অসম্ভাব্যবতা এবং জাত-জাতি ক্রমেই মিলিয়ে যাওয়া সম্পর্কে যে সকল বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তা যে, লেনিন-সাভারকার ও প্রকাশ কারাতদের উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা মিথ্যা ও অসত্য প্রমাণিত হয়। তৎসত্ত্বেও লেনিন-কারাত বাবুরা ইস্তাহার মান্যকারী কমিউনিষ্ট? উল্লেখ্য- দখল-বেদখলে, যুদ্ধ-বিগ্রহ,হত্যা-খুন, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রতারণা-বেঈমানি ইত্যকার যাবতীয় দুস্কর্ম করা সত্ত্বেও পুঁজির বিকাশ ও প্রসারের আবশ্যকতায় পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য একান্ত বাধ্য-বাধকতার উপনিবেশিকতা নীতি কার্যকর করা না হলে পুঁজিপতি শ্রেণী কি নতুন দুনিয়া আবিস্কার করা সহ সমগ্র বিশ্বকে জয় করতে পারতো, এবং যদি বিশ্ব জয়ী পুঁজিবাদ বৈশ্বিক রূপ লাভ করার পরেই কেবলমাত্র স্বীয় অতিরিক্ত উৎপাদন সংকটে পুন:পুন পতিত-নিপতিত না হতো, তবে কি মার্কস-এ্যাংগেলসরা কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনা করতে পারতেন ?

অত:পর, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বিবৃত পুঁজিবাদের বিশ্ব জয় তথা উপনিবেশিকতাও ঐতিহাসিক নিরিখে " খুবই বিপ্লবী" বলেই পুঁজির ঐতিহাসিক ভূমিকা, ও পুঁজিবাদের বৈশ্বিক রূপ, এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বৈশ্বিক জামানায় নানান জাত-জাতি সমেত

জাতিবিশেষের সৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টিও যে দুনিয়ার সকলের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া সমেত বিশ্ব সাহিত্যের উদ্ভব ইত্যাদি বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসরা, যা -ইস্তাহারে লিখেছেন, তা আমরা কমিউনিস্টদের বক্তব্য, তথ্য, তত্ত্ব ও নীতি হিসাবে গ্রহণ করবো, না-কি মস্কোর লেনিনবাদীরা উপরোল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা উপনিবেশিকতা বিরোধী দৃঢ় যোদ্ধা ও জাতীয় মুক্তির প্রবক্তা ইত্যকার রূপে মার্কস-এ্যাংগেলসদেরকে যে পরিচয়ে পরিচিত করতে চেয়েছেন বা যে ভূমিকায় হাজির করেছেন সেই পরিচয়ে ও সেইভাবে, মার্কস-এ্যাংগেলস বা তাদের প্রণীত কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে – কোনো কমিউনিস্ট বিপ্লবী কি গ্রহণ করতে পারে ?

সি.পি.এস.ইউ এবং সি.পি.আই (এম) – নিপীড়িত জাতির মুক্তি ও উপনিবেশিকতা বিরোধী যুদ্ধে লেনিনবাদীদের অনুসৃত ও প্রচারিত নীতির শিখন্ডী হিসাবে মার্কস-এ্যাংগেলসকে উপস্থাপনের নিমিত্তে মার্কসদের কোন বই-পুস্তক নয়, কেবলই ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাদি ও তাদের চিঠিপত্রকে ভিত্তি করেছে।

নিজস্ব মতামত প্রকাশের দলীয় ফোরাম নয়, বরং কেবলই পেশাদার কলামিস্ট হিসাবে মার্কস সন্মানির বিনিময়ে ট্রিবিউনে নিয়মিত লিখেছেন; এবং সময় স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো এ্যাংগেলসও নিজ নামে বা মার্কসের নামেই ট্রিবিউনে লেখালেখি করেছেন। "উপনিবেশিকতা প্রসংগে "-পুস্তকে কমিউনিস্ট ইস্তাহার ও পুঁজির অংশ বিশেষ সহ যে সকল প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ছাপা হয়েছিল সেসকল উদ্ধৃতাংশসহ বহু নিবন্ধ ও চিঠিপত্র উল্লেখিত " প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ" পুস্তকে ঠাঁই পায়নি।

তবে, ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাদির মৌলিকত্ব বা নির্ভেজাল মুদ্রন বা বিকৃতি-অবিকৃতি সম্পর্কে খুব একটা খোঁজখবর নিতে না চাইলেও কেবলমাত্র "উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকের ভূমিকা'র সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ এই: "New York Daily Tribune-এ যে সব প্রবন্ধ বিনা শিরোনামায় প্রকাশ হয়েছিল, তাদের শিরোনাম দিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট। মার্কস ও এ্যাংগেলসের প্রবন্ধের ভেতরে New York daily Tribune-এর সম্পাদকেরা তাদের নিজস্ব যে সব অনুচ্ছেদ ঢুকিয়েছিলেন তা প্রতি ক্ষেত্রেই বাদ দেওয়া হয়েছে, কেননা এ অনুচ্ছেদগুলি রচয়িতাদের লেখা নয়।"

শিরোনামহীন, পত্রিকা সম্পাদকদের ইচ্ছা মাফিক রচিত অনুচ্ছেদও মার্কসদের নামে প্রকাশিত হয়েছিল বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ বটে উপরোল্লেখিত উদ্ধাতাংশই। আবার, যারা, কমিউনিস্ট ইস্তাহার কার্যকরণ ও বাস্তবায়নকারীর দাবীতে- কার্যত, ইস্তাহারকেই এক কাগুজে বস্তুতে পরিণত করে, মার্কসদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কার্যত আড়াল করে বা ক্ষেত্র বিশেষ জাল-জালিয়াতি করেছে বলেই অত্র নিবন্ধেই প্রমাণ আছে, সেই রুশী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের স্বীয় অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে মার্কসদের আলোচ্য লেখাগুলোর মধ্যে নিজেদের পছন্দমতো অনুচ্ছেদ যোগ-বিয়োগ করেনি, এমনটা -হলফ করে বলা চলে কি?

ট্রিবিউন কর্তৃপক্ষ মার্কসদের লেখালেখি নিয়ে এমত জাল-জালিয়াতি বা বিকৃত সাধন যে করতো, তাতো- মার্কসরাও জানতেন। তবু, ঐ পত্রিকাকেই তারা বেছে নিলেন, লেনিনবাদীদের দাবী মোতাবেক মার্কসদের -নবাবিস্কৃত জাতীয় মুক্তির তত্ত্ব যা নাকি লেনিনবাদীদের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণই কেবল নয়, বরং লেনিনের সময়কাল হতে

নিপীড়িত জাতির মুক্তির সমর্থক না হয়ে লেনিনবাদী কমিউনিস্ট হওয়ার সুযোগ নাই, এতোটামাত্রার গুরুত্ববাহী তত্ত্বাদি প্রকাশের দায়-দায়িত্ব মার্কসরা ছেড়ে দিলেন ট্রিবিউন পত্রিকার নকলবাজ-চালবাজ সম্পাদকদের এখতিয়ারে?

অত:পর, দুই দফা নকলবাজ-জালিয়াতদের কবলে পড়ে মার্কসদের উল্লেখিত লেখাগুলির মর্মার্থ বা মৌলিকত্ব কতটামাত্রায় বজায় আছে সে বিষয়ে শয়তানের সন্দেহ না থাকলেও সত্যানুসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই সন্দিগ্ধ না হওয়ার কারণ নাই।

তবু, মস্কোর লেনিনবাদীরা যেভাবে " প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ" , " জাতীয় মুক্তি" , "নিপীড়িত জাতির মুক্তি" ইত্যকার শব্দরাজির উল্লেখ করেছেন বা মি: প্রকাশ কারাত বাবুর " অডির্নারী পিপলের ব্যাপক অংশ গ্রহণ" বা " ন্যাশনাল রিভল্ট" বা " নট এ মিলিটারী বাট এ ন্যাশনাল রিভল্ট" রূপ শব্দরাজিও আমি উল্লেখিত বইদুটোর কোনোটিতেই খুঁজে পাইনি। প্রকৃত অর্থে পুঁজির বিশ্ব জয় ও বিশ্বব্যাপী পুঁজির আধিপত্য ও আধিক্য এবং পুঁজিবাদী ধাঁছে বিশ্বকে গড়ে তোলে,অতিরিক্ত উৎপাদনের হেতুবাদে ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে অক্ষমতা হেতু নিরাকরণের প্রক্রিয়ায় পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদ হবে মর্মে 'পুঁজি' গ্রন্থ সহ নানান পুস্তকাদিতে যেমন এমন তত্ত্ব লিখেছেন তেমন পূর্বাপর ধারাবাহিকতাপূর্ণ কমিউনিস্ট ইস্তাহারেও মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেছেন যে, পুঁজিরই কবলে পড়ে দুনিয়ার জাত-জাতি ক্রমেই লুপ্ত ও বিলুপ্ত হচ্ছে ; সুতরাং তারা কি করে জাতি বিশেষের মুক্তির তত্ত্ব হাজির করতে পারেন?

"উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকে মুদ্রিত, " এ্যাংগেলস সমীপে মার্কস" লন্ডন, ৮ অক্টোবর, ১৮৫৮ বর্ণিত এই: "বুর্জোয়া সমাজের বিশিষ্ট কর্তব্য ছিল অন্তত রূপরেখায় একটি বিশ্ববাজার ও সে বাজারের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীটা গোল তাই মনে হয় এ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশনে এবং চীন ও জাপানের উন্মুক্তিতে।" ভারতের কথাও কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে। ১৮৫৮ সালেতো নিশ্চয়ই নয়, মার্কস ভারত বা উপনিবেশিকতা সম্পর্কে কারাত বাবুদের দাবীমতো ১৮৫০ এর দশকের পুর্বে অজ্ঞ বা শিক্ষানবিশ থাকার সুযোগ নাই, এবং এ্যাংগেলস- তিনিতো পরিপক্ক ছিলেন বলেই ইস্তাহার রচনায় যেমন মার্কসের সহযোগী, তেমন ইস্তাহার রচনার পুর্বেও পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তক-প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

মার্কসতো উদ্ধৃত পত্রেও এ্যাংগেলসকে জানালেন যে, উপনিবেশ স্থাপন তথা পুঁজিবাদের বিশ্ব জয় করা ছিল পুঁজিবাদের বিশেষ কর্তব্য। একই পত্রে উপনিবেশগুলোর পিছিয়ে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেও উপনিবেশিকতা হতে মুক্তি বা স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তি অর্জন নয়, বরং তুলনামূলকভাবে ধরিত্রীর এক বিরাট অংশে তখনো পুঁজিবাদী সমাজের গতি " উর্দ্বগ" থাকায় ইউরোপ খন্ডে আসন্ন " সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব" এর সফলতা বিষয়ে কিঞ্চিত সংশয় প্রকাশ করেছেন।

অত:পর, মার্কসদের জবানীতে উদ্ধৃত বা তদমূলে উপনীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারাত বাবুদের বক্তব্য কতোটামাত্রায় যথার্থ সে সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা " উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তক হতে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত অংশ বিশেষ উল্লেখ করার আবশ্যকতা বোধ করছি।

ট্রিবিউনের ৩৮০৪ সংখ্যা, ২৫ জুন,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত " ভারতে বৃটিশ শাসন" প্রবন্ধে মার্কস লিখেন- " নজির দেবার মতো স্যার চার্লস উডের মতো কুলি খাঁর উল্লেখ না করেও আমি তাঁদের সংগে একমত নই যাঁরা হিন্দুস্থানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাসী।" কেবল এই বাক্যের কারণেই ভারতে সাভারকার বা মস্কোর লেনিনবাদীদের " সমৃদ্ধি"র বক্তব্যের খারিজকারী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন মার্কস। এবং একই নিবন্ধে মার্কস লিখেন-
"কিন্তু ইংলন্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেংগে দিয়েছে, " এবং " বৃটেন শাসিত হিন্দুস্তান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।" এবং " এই সব ছোটো ছোটো বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেংগে গেছে, অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয়, যতটা ইংরেজের বাস্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই।" এবং "ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাংকাশয়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সুতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করেছে এবং এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর ও অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেংগে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এইভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শুনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।" এবং প্রবন্ধটি শেষ করেছেন তিনি এই বলে: " এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থ সাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"
অত:পর, মি: কারাত বাবু যে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতকে "প্রাক-পুঁজিবাদী " সমাজ হিসাবে বিবৃত করে ইংলন্ডের পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা ভারতে সংঘটিত সামাজিক বিপ্লবকে অস্বীকার করেছেন, তা যে কারাত বাবুর দাবীমতো ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত ভারত বিষয়ে অজ্ঞ বা বড়জোর শিক্ষানবিশ মার্কস যে, কি ভারতের সমাজ বিপ্লব বা সে বিপ্লবে ইংলন্ডের পুঁজিপতি শ্রেণীর ভূমিকাকে হৃদয় পুঁজারী কারাত বাবুর মতো দেখেননি তাতো উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারাই নিশ্চিত হয় । সুতরাং, ১৮৫৭ সালে ভারতে 'প্রাক-পুঁজিবাদী' নয়, বরং বৈশ্বিক মানে পিছিয়ে পড়ে থাকা হলেও বা ভারতের প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতি হিসাবে পরিচিত,তবে উপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক পরাজিত ও উপনিবেশিক শক্তির সুযোগ-সুবিধাভোগী বলে রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে স্বীয় ক্ষমতাহীন-অযোগ্য সম্রাট-রাজা, তালুকদার ইত্যকার বহু ধরনের সামাজিক পরগাছা ভারতে বিদ্যমান থকালেও (এদের মতো পরজীবী-পরগাছা জাতীয় রানী, রাজা, সম্রাট বা লর্ড, নাইট ইত্যকার বহু সংখ্যক ইংলন্ডে-সুইডেন ইত্যকার আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এখনো আছে) বা অনুরুপ সীমাবদ্ধতা সমেত বিদ্যমান ভারতে -কার্যত ও প্রকৃতপক্ষে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বা বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত ও বিশ্ব পুঁজিবাদের পরিচালিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মুলতই পুঁজিবাদী সমাজ-ই, বিদ্যমান ছিল।
অথবা, ভারতের মতো বিশাল অঞ্চলে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ বিদ্যমান থাকলে উপনিবেশিক ইংলন্ড বা ফ্রান্স বা পুর্তগীজেরা কি করেছিল ভারতে বা পুঁজিপতি শ্রেণী

কর্তৃক বাজার ও বাণিজ্যের নিমিত্তে ভারত ইত্যাদি দখল করেও যদি প্রাক পুঁজিবাদী সমাজই অটুট-অক্ষুন্ন রাখে, তবে বহিরাগত পুঁজিপতিরা ভারত বা ভারতের মতো দেশগুলি দখল করেছিল কেন? মার্কসবাদী কারাত বাবুরা, ভারত বিষয়ে মার্কস যে উপরোক্ত মুল্যায়ন করে মানব জাতির ভবিতব্যের সুযোগ সৃষ্টিকারী বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে রুশ-ফার্সিদের দখল নয়, ইংলন্ডের ভারত দখলকে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতকেও বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতীয় প্রাক পুঁজিবাদী সমাজকে ভেংগে চুরমার করার জন্য ইংলন্ডকে কার্যত ইতিহাসের অবচেতন কান্ডারী বলেছেন, সেই মার্কসকে -দেবতার মতো গুরুই বা মানেন কেন কারাত বাবুরা ?

ট্রিবিউনের ৩৮৩৮ সংখ্যা,৫ আগষ্ট,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত " ভারত" শিরোনামে মার্কস লিখেন-" জমিদারী ও রায়তোয়ারী- দুই-ই বৃটিশ ফরমানে সংগঠিত কৃষি বিপ্লব এবং পরস্পর বিরোধী; একটি হল আভিজাতিক, অন্যটি গণতান্ত্রিক; একটি- বৃটিশ জমিদারীর প্রহসন, অন্যটি-ফরাসী চাষী-মালিকানার ; কিন্তু বিষাক্ত- দুটিতে অতি বিরোধী দিকের সমাবেশ, দুটির কোনোটিই ভূমিকর্ষক জনগণের জন্য অথবা ভূস্বামি মালিকের জন্য নয়- তৈরী হয়েছে সরকারের জন্য, যা কর আদায় করে তা থেকে।" এবং

"ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" শিরোনামে ট্রিবিউনের ৩৮৪০ সংখ্যা,৮আগষ্ট,১৮৫৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে মার্কস লিখেন- " যত ঘৃণ্যই হোক, জমিদারী ও রায়তোয়ারী হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ-এশীয় সমাজের মহান লুপ্তসূত্র হল এইটে।" তারপরেও লেনিনবাদী কারাত বাবুরা বলবেন যে, ইংলন্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের তথা " এশীয় সমাজ" লুপ্ত করেননি এবং তদার্থে অমন মহান লুপ্তসূত্রের প্রয়োগকারী বা বাস্তবায়নকারী ইংলন্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী - অর্ধ বর্বর "এশীয় সমাজ" বিলুপ্ত করে, অন্তত এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে ন্যুনতম মহান কর্মটি সাধন করেননি?

এই নিবন্ধেই বৃটেনের ভারত দখলকে সমর্থন করে মার্কস লিখেছেন- " কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।" অত:পর, ভারতে -ইংলন্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংঘটিত বিপ্লব অস্বীকারকারী বা ভারতেরও বুর্জোয়া সমাজে রূপান্তর তথা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজে অন্তর্ভুক্তি মানতে না পারা মহা পন্ডিত প্রকাশ কারাত-সাভারকার প্রমুখ- মার্কস বর্ণিত ওই শিক্ষিতদেরই উত্তরসুরি নয় কি?

ট্রিবিউনের ৫০৬৫ সংখ্যা, ১৫ জুলাই,১৮৫৭ সালে প্রকাশিত " ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ" প্রবন্ধে মার্কস লিখেন- " সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থার প্রভুত বদল হয়েছে। এখন আর ভারতের এক অংশের সহায়তায় অন্য অংশকে তা আক্রমন করে না, সে নিজেই এখন সর্ব প্রধান, গোটা ভারত তার পদতলে। আর জয় করার কাজ নেই বলে এ এখন হয়ে উঠেছে একমাত্র বিজয়ী। তার সৈন্যদলের কাজ এখন আর রাজ্য বিস্তার নয়, রাজ্যটাকে কেবল বজায় রাখা। সৈন্য থেকে তারা পরিণত হয়েছে পুলিসে; ২০ কোটি দেশীয়রা দমিত হচ্ছে ২ লাখ লোকের এক দেশীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা, যাদের অফিসাররা সব ইংরেজ; আর এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার সংযত রাখছে মাত্র

৪০,০০০ লোকের এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী।" এবং এই নিবন্ধেই তিনি আরো লিখেন- " এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর কতোটা ভরসা করা যায় তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বিদ্রোহগুলিতে- পারস্যের যুদ্ধের ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে ইউরোপীয় সৈন্য প্রায় শূন্য হবার সংগে সংগে সে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর আগেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিদ্রোহ কতগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক ও মারাত্মক লক্ষণে চিহ্নিত। এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করলো তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পারিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; ' হিন্দুদের মধ্যে থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে;' বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এবং পরিশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সংগে, বেঙ্গাল আর্মির বিদ্রোহ নি:সন্দেহে পারস্য ও চীন যুদ্ধের সঙগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

চার মাস আগে বেঙ্গাল আর্মিতে যে অসন্তোষ ছড়াতে শুরু করে তার তথাকথিত কারণ হল দেশীয়দের মনে এই আশঙ্কা যে, সরকার বুঝি তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে। যে কাতুর্জ বিলি করা হয় তা নাকি ষাঁড় ও শুয়রের চর্বি মাখানো কাগজের তৈরী, সুতরাং তা দাঁতে কাটলে ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে বলে দেশীয়রা মনে করে- এই কাতুর্জ বিলি থেকে আঞ্চলিক হাঙ্গামার সঙ্কেত। ২২ শে জানুয়ারী কলকাতা থেকে কিছু দুরের এক ক্যান্টনমেন্টে অগ্নিপ্রদানের ঘটনা ঘটে। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯ নং দেশীয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বহরমপুরে, কাতুর্জ নিতে আপত্তি করে সৈন্যরা। ৩১শে মার্চ এ রেজিমেন্ট ভেংগে দেওয়া হয়; মার্চের শেষে ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪ নং সিপাহী রেজিমেন্ট এইটে হতে দেয় যে, একটি সৈন্য গুলি ভরা মাস্কেট নিয়ে লাইনের সামনে প্যারেডের ময়দানে এগিয়ে গেল ও সাথীদের বিদ্রোহে আহ্বান করে রেজিমেন্টের অ্যাডজুটেন্ট ও সার্জেন্ট-মেজরকে আক্রমণ ও আহত করতে গেল। এতে যে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়, তাতে শত শত সিপাহী নিস্ক্রিয়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখে আর বাকীরা লড়াইয়ে যোগ দিয়ে বন্ধুকের কুঁদা দিয়ে আক্রমণ করে অফিসারদের।" এবং " দিল্লীর ভূতপুর্ব মোগলের উত্তরাধিকারীকে ঘোষণা করা হয় ভারতের রাজা।" এবং এই নিবন্ধ শেষ করেন এই বলে: " বর্তমান ঋতুতে ভারতের আবহাওয়া-জনিত বাধা ও পরিবহন ব্যবস্থার একান্ত অভাবে বৃটিশ সৈন্যের চলাচল যতই ব্যাহত হোক, দিল্লীর বিদ্রোহীরা খুব সম্ভব কোনো দীর্ঘ প্রতিরোধ না দিয়েই ভেংগে পড়বে। " না- মার্কস বিদ্রোহীদের বিজয়ের আশা পোষণ করেননি; এবং "ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে" , " এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষ" মিলে গেছে লিখলেও তাতে কি উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ নির্ণিত হয়? না কি এক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির সাধারণ অসন্তোষটা যে উপনিবেশিক তথা পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক রূপ-চরিত্রের কারণেই ঘটেছে তা নিশ্চিত করেছেন?

ট্রিবিউন, ৫০৯১ সংখ্যা, ১৪ আগষ্ট,১৮৫৭ সালে প্রকাশিত " ভারত প্রশ্ন" নিবন্ধে মার্কস লিখেন-

" তথাপি, ইংলন্ডের অতি বিখ্যাত অ-পদস্থ রাষ্ট্র-নায়কের অতি বিস্তারিত মতামত হিসাবে মি: ডিজরেলির বক্তৃতায় বিদেশের মনোযোগ আকর্ষণীয়। আমি শুধু তার

ipsissima verba-তেই* ' ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ে ভাবনার' একটা ছোট বিশ্লেষণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

'ভারতের অশান্তি কি সামরিক হাঙ্গামা না কি তা জাতীয় বিদ্রোহ? সৈন্যদের আচরণ কি একটা আকস্মিক আবেগের ফল, না কি তা একটা সংগঠিত চক্রান্তের পরিণতি?'

এই কথার উপরেই গোটা-সমস্যাটা দাঁড়িয়ে আছে বলে মি: ডিজরেলী জোর দেন। তিনি সমর্থন করে বলেন যে গত দশ বছরের আগে পর্যন্ত ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে divide et impera- র প্রাচীন নীতির ওপর– কিন্তু নীতি চালু করা হয় ভারতস্থ বিভিন্ন জাতিসত্তাকে সন্মান করে, তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ পরিহার করে এবং তাদের ভূসম্পত্তি রক্ষা করে। দেশের উদ্দাম প্রেরণাকে ধারণ করার সেফটি-বালব হিসাবে কাজ করেছে সিপাহী আর্মি। কিন্তু ইদানিং কালে ভারত সরকারে গৃহীত হয়েছে একটি নতুন নীতি– জাতিসত্তা নাশের নীতি। এই নীতি কাজে পরিণত করা হয়েছে বলপ্রয়োগে দেশীয় রাজাদের ধ্বংস করে, মালিকানা ব্যবস্থার নড়চড় করে এবং জনগণের ধর্মে হাত দিয়ে।"

এবং

এই নিবন্ধের শেষ প্যারায় মার্কস লিখেন- " মি: ডিজরেলি তারপর দেশীয়দের ধর্মে হাত দেওয়ার কথা বলে– এ পয়েন্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা না করলেও চলে। তাঁর এসব প্রতিপাদন থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান ভারতীয় অশান্তিটা সামরিক হাঙ্গামা নয়, জাতীয় বিদ্রোহ, সিপাহীরা যার ক্রিয়মান হাতিয়ার মাত্র। বর্তমানের আক্রমণাত্মক ধারা অনুসরণ না করে ভারতের অভ্যান্তরীণ উন্নয়নের দিকে সরকারকে দৃষ্টি দেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন।"

উল্লেখ্য- ব্রিটিশের পার্লামেন্টে-"সামরিক হাঙ্গামা নয় , জাতিয় বিদ্রোহ" এবং "সিপাহীরা যার ক্রিয়মান হাতিয়ার মাত্র" তত্ত্ব ও তথ্যের আবিস্কর্তা ও ব্যাখ্যাতা মি: ডিজরেলিই ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে ভারতের জাত-জাতির উন্নয়নেই নিশ্চয়ই ইংলন্ডের রানী ভিক্টোরীয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী হতে এবং সম্ভবত মি: ডিজরেলির জাতিগত মুক্তির সদ্দিচ্ছাজাত পরামর্শ বাস্তবায়নেই ভারতের জাতিগুলোকে পাকাপোক্তভাবে ব্রিটিশ রানীর কবল ও কর্তৃত্বে রাখতেই ১৮৭৭ সালে ইংলন্ডের রানী গ্রহণ করেছিলেন " ভারত সম্রাজ্ঞী" উপাদি। অত:পর, মস্কোর লেনিনবাদী ইনস্টিটিউট এবং সি. পি. আই (এম) এর মহাপন্ডিতগণ বুঝুন বা না বুঝুন বাল্য শিক্ষার শিক্ষার্থীগণও নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, " জাতীয় বিদ্রোহ" বা সিপাহীদেরকে "ক্রিয়মান হাতিয়ার" তত্ত্বের প্রবক্তা বা নির্মাতা-মার্কস নয়, এবং অতি অবশ্যই মি: ডিজরেলি মহোদয়; মার্কস কেবলমাত্র তার এই ঐতিহাসিক বানোয়াটি তত্ত্ব ও তথ্য উল্লেখ করেছেন ।

তবে, এই বিদ্রোহ সংঘটনকারীদের সম্পর্কে মার্কস তার " ভারতীয় বিদ্রোহ" নিবন্ধ, যা, ট্রিবিউন, ৫১১৯ সংখ্যা,১৬ সেপ্টেম্বর,১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়, তাতে লিখেন- "বৃটিশের হাতে নিপীড়িত, অবমানিত ও বিবস্ত্র রায়তদের মধ্যে থেকে ভারতীয় বিদ্রোহ শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে বৃটিশদের হাতে খাওয়া, পরা, পিঠচাপড়ানী, পুষ্টি ও আবদার পাওয়া সিপাহীদের কাছ থেকে।" তৎসত্ত্বেও, ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশের অংশগ্রহণ বা জাতীয় মুক্তি বা উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বা সিপাহীরা 'ক্রিয়মান হাতিয়ার' এমত বক্তব্য যারা মার্কসের জবানীতে উল্লেখ করেছেন, তারা কি বেবুঝ , না

মার্কসের লেখাগুলো ভালোভাবে পড়েননি, বা কোন বক্তব্যটা মি: ডিজরেলীর আর কোনটা মার্কসের, তাও বুঝতে অক্ষম, নাকি কেবলই অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের দুরভিসন্ধিতে মার্কসবাদের পোষাক আবৃত-লেনিনবাদী বলেই উক্তরূপ জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণা করেছেন?

মহাপন্ডিত কারাত বাবুরা " প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ" বা " জাতীয় বিদ্রোহ" ইত্যকার শব্দগুলো ব্যবহার করলেও কেউ কিন্তু ' জাত-জাতি' বা ভারতীয় জাতি ইত্যাদির কোন সংজ্ঞা দেননি। হিন্দী, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, মালে-আলেম, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, অহমিয়া, বাঙ্গালী- এমন জাত-জাতির পরিচয়ে কয়েকশত জনগোষ্ঠী এখনো বিদ্যমান ; এবং সিপাহী বিদ্রোহের কালেও শত শত জাত-জাতি ভারতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা সবাই মিলে ভারতীয় জাতি না কি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক জাতি, তা কিন্তু 'সকল দেশের সেরা' বা 'রানী' রূপী সমৃদ্ধ -ভারতের বানোয়াটি ইতিহাস রচয়িতা ও জাতি মুক্তির প্রবক্তাগণ, যারা প্রকারন্তরে মি: ডিজরেলির শিষ্য হিসাবে উপযুক্তভাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত, তারা কেউই পরিস্কার করে বলেননি।

অথবা, দুধ-গরম বা ঠান্ডা -যাহাই হোক না কেন, দুধ যেমন দুধই, তেমন জাতিয়তাবাদ- তা, ধর্ম-ভাষা ইত্যকার আবরণে হোক, বা হালের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, বা লেনিনীয় জাতিয়তাবাদ বা তদার্থে প্রতিক্রিয়াশীল জাতিয়তাবাদ বা প্রগতিশীল জাতিয়তাবাদ, বা হিটলারী জাতীয়তাবাদ , তা- যাহাই হোক না কেন, তা জাতীয়তাবাদই এবং সকল জাতীয়তাবাদই, ইন-এ্যাকশন, একই বলে, তা-মানুষকে একদিকে যেমন সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ ও সীমিত করে, অন্যদিকে ভুয়া-মেকি শ্রেষ্ঠত্বের কাল্পনিক বোধ ও মোহে মোহান্ধ হয়ে কেবলই জাত-জাতির পরিচয়-পরিচিতিতে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নে অপরাপর জাত-জাতির মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে জাতীয় মোড়লদের হীন স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে, কেবলই নানান জাত-জাতির পরিচয়ে নানান বিরোধ-বিবাদে জড়িয়ে খুনাখুনি করাসহ তদার্থে নানান উস্কানি ও প্রতিহিংসামূলক এবং অপরের জন্য অপমানজনক ও নিন্দুনীয় গীত-সংগীত, নাটক ইত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করে তৎদ্বারা বিমোহিত মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় যেমন ভুলে যায়, অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজিত সমাজের আর্থ-সামাজিক নিয়ম ও সূত্রে আবদ্ধ-আটক মানুষ, নিজ নিজ বন্দীত্ব তথা পুঁজিবাদী সম্পর্কাধীন মানুষ যে, হয়-মালিক, না হয় শ্রমিক, এই প্রকৃত সত্য গ্রাহ্য ও কবুল না করে, কেবলই জাতিগত অন্ধত্বে শ্রমিক শ্রেণীও স্বজাতীয় শোষকদের ভাড়া খাটে ও বিজাতীয় শ্রমিকদেরও ক্ষয়-ক্ষতি করে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় পদদলিত করে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তেমন জাত-জাতির পরিচয়ে বিভাজিত মানুষদের মধ্যে কেবলই জাত-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব ইত্যকার কারণে মানুষের মধ্যে হীনতা-দীনতা,ভয়-ভীতি, হিংসা ও প্রতিশোধ পরায়নতা বাড়া বৈ কমে না ।

ফলে- পুঁজিবাদের বিশ্ব জয়ের এতো বছর পরেও নিদেনপক্ষে বিশ্ববাসী নয়, কেবলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাত-জাতির পরিচয়ে পরিচিত থাকছে । তাতে, ইলেক্ট্রোনিকের বৈশ্বিক জালে আটকা পড়া বিশ্ববাসী, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের আচার-আচরণ বা খেলা-ধূলা সরাসরি দেখা-শুনার সুযোগ লাভ করেও এমনকি খেলা-ধূলার বৈশ্বিক আসরেও খেলার আনন্দ লাভ নয়, বা যথার্থ ভাল খেলার সমজদার নয়, বরং বিমোহিত ও উল্লসিত হয়, বা

রাগান্বিত-ক্ষুব্ধ হয় বা ক্রুদ্ধ হয়, এমনকি মাঠে যারা ভাল খেললো, তাদের উপরও চড়াও হয়, কেবলই নিজ নিজ জাত-জাতির টিমের জয়-পরাজয়ে। সুতরাং, জাতীয়তাবাদ- মানুষকে সংকীর্ণ করে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় ভুলায়, এবং বিশ্ব ও প্রকৃতি চিনতে-জানতে ও বুঝতে যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তেমন মানুষের সাথে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক আড়াল করে।

কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিকতাবাদী বলেই কমিউনিস্ট ইস্তাহার যেমন সমাপ্ত হয়েছে "দুনিয়ার মজুর এক হও" ,এই ধ্বণি দিয়ে তেমন এটিই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তথা সমাজতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান সূত্র ও নিয়ম এবং শর্ত বলেই শ্রমিক শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি কমিউনিস্ট- কোনোক্রমেই জাতীয়তাবাদী নয় বা কোনো অজুহাতেই জাতীয়তাবাদী হওয়ার সুযোগ নাই কমিউনিস্টদের।

জাতি বা বিশেষ বিশেষ জাত-জাতির সদস্য হিসাবে পরিচিত ও চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে শ্রম শক্তি বিক্রেতা- মজুর, আর শ্রম শক্তির ক্রেতা- পুঁজিপতিকে, কৃত্রিমভাবে একই কাতারভুক্ত গণ্যে শ্রমিক-মালিকের শোষণমূলক সম্পর্ককে কল্পিত ও কৃত্রিমভাবে বিলীন ও অস্বীকার করে, বা পরস্পরের বৈরীতা মূলক সম্পর্ককেও স্বীকার করার পরিবর্তে কেবলই উভয় শ্রেণীকে একই জাতি'র সদস্য দাবীতে- বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, তথা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে স্থগিত বা মূলতবী রেখে শনাক্তকৃত নিজ নিজ জাতির পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিপক্ষ-শত্রুপক্ষ বিদেশী-বিজাতীভুক্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হয়ে, এমনকি, ঐ শত্রু পক্ষীয় দেশ-জাতির মধ্যেকার শ্রমিক শ্রেণীকেও শত্রু গণ্য করার অপকৌশলে বুর্জোয়াদের আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় বা শত্রুতা ও যুদ্ধে উভয় জাত-জাতি'র মধ্যেকার শ্রমিক শ্রণী নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী চৈতন্য ভুলে ও জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীয় শ্রেণী সংহতি বা স্বীয় শ্রেণী মুক্তি সমেত মানবজাতির মুক্তির প্রথম শর্ত -'দুনিয়ার মজুর এক হও' ধ্বণি-মুখে মুখে আউড়িয়েও, উক্ত নীতিকে একটি কাগুজে বাক্যে পরিণত করে কার্যত, অস্বীকার ও অকার্যকর করে বুর্জোয়াদেরই স্বপক্ষে বিনা ভাড়ার যোদ্ধা হিসাবে ভিন জাত-জাতি'র মধ্যেকার শ্রমিক শ্রেণীকে যথারীতি - জাতিগত শত্রু বা দেশের শত্রু ,গণ্যেই নানান দেশের শ্রমিক শ্রেণী -জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার নামে এ যাবৎ শত্রুতা-বৈরীতা বা কখনো কখনো হত্যা-খুন করে এসেছে যেমন বুর্জোয়া রাজনৈতিক, তেমন লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের ধারাবাহিক বিমোহিত প্ররোচনা-প্রলোভন এবং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ঘৃণ্য রাজনীতির মায়াজালে বন্দি ও আবদ্ধ হয়ে।

মস্কোর লেনিনবাদীরা বা ভারতের কারাত বাবুরা "কমিউনিস্ট" নাম গ্রহণ করেও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য এহেন ভয়ংকর-ভয়ানক ক্ষতিকর লেনিনীয় জাতিয় মুক্তির রাজনীতির ধারক-বাহক বলেই তথাকথিত ভারতীয় স্বাধীনতা বা ভারতের জাতীয় মুক্তির নেশায় নেশাগ্রস্ত করছে ভারত সহ সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে বলেই শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত আপনজন মার্কস-এ্যাংগেলসকে যেমন জাতীয় মুক্তির প্রবক্তা সাজায়, তেমন প্রতারণা ও জালিয়াতিমুলেই **ডিজরেলির বক্তব্যকে, মার্কসের বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপনে কুণ্ঠিত-লজ্জিত ও বিভ্রত হয় না।**

অথবা, উপনিবেশিক ব্রিটিশকে তাড়িয়ে চেংগিস খানের বংশধর, বিদেশী ও ভারত দখলকারী মোগলদের উত্তরাধিকারকে " রাজা" ঘোষণা পূর্বক, পুঁজিবাদ তথা বিদেশী বৃটিশ পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বার্ষিক-১২০,০০০

আমেরিকান ডলার পারিতোষিক ভোগীর, হৃত রাজ্য পুনোরুদ্ধার করে মোগল ডাইনেষ্টীর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম করা হলে– তাতে ভারত কি স্বাধীনতা অর্জন করে না কি, ভারতের জাতীয় মুক্তি অর্জিত হয় ?

কারাত বাবুরা সেই রকমই দাবী করছেন বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– মি: কারাত বাবুদের "জাতীয় বিদ্রোহ" সফল হলে বিদ্রোহীদের "ঘোষিত রাজা" দিল্লীর বাদশা কি ইতো:মধ্যে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ভারতে সংঘটিত বিপ্লব পুর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে পারতেন?

অথবা, মস্কোর লেনিনবাদীদের দাবীমতো মার্কসের স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস , ১৯৪৭ সালে কথিত স্বাধীনতা হাসিল করলেও বৃটিশ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত কোর্ট–কাছারী, আইন–বিধি, রেলসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা , শিল্প কল–কারখানা , ব্যাংক–বীমা , স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যকার যাবতীয় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে ভারতীয় টোল শিক্ষা বা গান্ধীর 'চরকা'র সুতাকাটুনি তাঁতের শিল্পে বা ১৭৯৭ ও ১৮১৮ সালের ভূমি সংস্কার পুর্ববতী অবস্থা–ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পেরেছে না কি, আদৌ তা সম্ভব?

অত:পর, পুঁজিবাদ তথা বৃটিশ পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট–প্রতিষ্ঠিত ও স্থাপিত পুঁজিবাদী শিল্প–প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা বা ব্যবস্থাদি , যার কিছু কিছু পুঁজিবাদী নিয়মেই ইতো:মধ্যে অপসৃত ও হারিয়ে গেছে; তাছাড়া বাদবাকি সকল বিষয়াদি বা প্রতিষ্ঠানাদি বহাল তবিয়্যতে বহাল রাখা, আর বৃটিশ পুঁজিপতিসহ বিশ্বের অপরাপর পুঁজিপতিদের নানান জাতীয় নানান বৈশ্বিক ক্লাব সদস্য হয়ে, বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে–অনুকুলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত–মূল্য আত্মসাতে রাজনৈতিক মোড়লীপনায় প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় থেকে কেবলমাত্র ইংরেজদের স্থলে ভারতীয়রাই ভারত'র রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ভোগ–দখল করার রাজনৈতিক সুযোগ–সুবিধার নিমিত্তে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা দাবী করা যেমন পুঁজিবাদী প্রতারণা তেমন ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে ভারতকে মোগল আমলে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী কেবল–এমনকি দেশ বিশেষের 'স্বাধীনতা' সম্পর্কেও স্ববিরোধী ও দ্বিচারি নীতিরই বহি:প্রকাশই কেবল নয়, বরং সমাজ বিবর্তন ও পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাক–পুঁজিবাদী সমাজ হতে জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদী সমাজও শোষণমুলক হওয়া সত্ত্বেও পূর্বতম সামন্তসমাজ হতে অগ্রসর ও প্রগতিশীল সমাজ বলেই পুঁজিবাদী সমাজকে বিলুপ্ত করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অতীব আবশ্যকীয় এবং পুঁজিবাদের শোষণমুলক চরিত্র হেতু আন্ত:বিরোধী ও বৈরীতামুলক সম্পর্কের কারণেই শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিপতি শ্রেণী পরাজিত–উচ্ছেদ ও বিলীন হওয়ার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সুত্র ও নিয়ম মার্কসরা আবিস্কার ও ব্যাখ্যা করেছিলেন । তাই পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস–বিনাশ ও বিলুপ্তি ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হলেও পুঁজিবাদী সমাজকে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা ব্যতীত কোনোভাবেই সামন্তবাদে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না বা সেরকম সুযোগ নাই। কাজেই, ভারতীয় সিপাহীদের রাজা দিল্লীর নতুন " সম্রাট", তবে বহিরাগতই এবং স্ব–সাম্রাজ্যের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার অক্ষমতায় আধুনিক শিল্পের 'সন্ত ান' – ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট পরাজিত হবেন,এটাই স্বাভাবিক এবং পরাজিত হয়ে দমন–পীড়নের শিকার হয়েছেন ঘোষিত– দিল্লীর সম্রাট সমেত বিদ্রোহীরা।

সুতরাং, সমাজ বিকাশ ও পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সূত্র আবিস্কারক ও ব্যাখ্যাকারী মার্কস যেমন যুক্তিসংগতভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের বিজয় নিয়ে আশাবাদী হতে পারেন না, তেমন যথার্থভাবেই উল্লেখিত নিবন্ধে বিদ্রোহী সিপাহীদের পরাজয়ের দিক নির্দেশ করেছেন।

ডিজরেলীর মতো লেনিনবাদী কমিউনিস্টরাও বলেন যে, সেনাবাহিনী জাতির গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তবে, জাতির মধ্যে যে, নানান শ্রেণী বিদ্যমান। তাই তা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত এই সত্য কিন্তু অস্বীকার করেন না বুর্জোয়াও। সুতরাং, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তথাকথিত জাতীয় রাষ্ট্রে-জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা জাতির গর্বের সম্পত্তি-সেনাবাহিনী শ্রেণী স্বার্থ বিবর্জিত বা বিমুক্ত নয়। সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিল শ্রেণী শোষকদের স্বার্থে তথা অপরাপর রাজ্য দখল-বেদখল করা সহ পরাজিতদেরকে কব্জাভুক্ত বা অধীনস্ত রাখা সহ তাদের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন ও অধিগ্রহণ করার জন্য। অর্থাৎ দখল-বেদখল, জবর দখল-জবরদস্তি, লুণ্ঠন,-লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ-ভাংচুর, খুন-ধর্ষণ ও সন্ত্রাসের রাজনীতির প্রয়োজনেই সেনাবাহিনীর জন্ম।

পুঁজিবাদী সমাজেও পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ-শাসন রক্ষা ও সংরক্ষণে সেনাবাহিনী ক্রিয়াশীল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও যেমন ভারত দখলে পলাশির যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করেছিল ভারতীয়দেরও নিয়ে গড়া সেনাবাহিনী দিয়েই তেমন ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহীরাও মার্কসের ভাষায় ইংরেজদের আদর খাওয়া,পিঠ চাপড়ানো-প্রকৃতার্থে পেশাগত কারণেই এক খুনিবাহিনীই। ভারতের অপরাপর অংশ বিশেষ এমনকি ১৮৪৯ সালেই মাত্র শিখ রাজাকে পরাজিত করে পাঞ্জাবকে কোম্পানির শাসনভুক্ত করেছিল, ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী দিয়েই। ভারতের বিবাদমান বুর্জোয়াদের কারণে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে ইংলন্ড কর্তৃক গঠিত ভারতের সেনাবাহিনীও ভাগ-বিভাগ হয়ে ভারত-পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হিসাবে পরিচিত পায়। আবার পাক-ভারতের বুর্জোয়াদের বিরোধ-বৈরীতায় সংঘটিত পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে সেই সেনাবাহিনীর সদস্যরাই পরস্পরকে হত্যা-খুন, বন্দী ও পীড়ন করেছিল। আবার পাকিস্তানের দুই অংশের বুর্জোয়াদের বিরোধ-বৈরীতায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ইতিহাসের জঘন্যতম-বর্বরতম ও হিংস্র আক্রমণ-হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে খুন-জখম করেছিল, এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাপক গণহত্যা-খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, লুঠ, বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগ করা সহ ঘৃণ্য কর্মাদি সম্পাদন করেছিল একদম আদি বর্বরদের মতোই।

অত:পর, জন্মশর্তেই এহেন জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজের দায়-দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য , যারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও চিরকালই জাতির অধিপতি শ্রেণী ও অংশের স্বার্থের যেমন সশস্ত্র পাহারাদার , তেমনই জাত-জাতির মধ্যেকার শ্রমিক শ্রেণী সহ মেহনতি মানুষের স্বার্থের ঘোরতর প্রতিবন্ধক এবং এই সেনাবাহিনীই নিতান্তই দেশ-জাতি উদ্ধার নয়, বরং কেবলই স্রেফ নিজের নিজের রুটি-রুজি বা স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রয়োজনে -স্বদেশী ও বিদেশী রাজ-রাজাই কেবল নয়, এমনকি স্বীয় সেনাবাহিনীভুক্ত বিদ্রোহী বা দোষী সৈন্যদেরও হত্যা-খুন করতে কসুর করেনি। তবু তারাই বুঝি জাতীয় চেতনার ধারক-বাহক বা জাতীয় মুক্তির নায়ক হতে পারে ?

পরজীবীতার অংশীদার ও পাহারাদার সেনাবাহিনী, শোষণমুক্তির নায়ক-শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু বৈ মিত্র হওয়ার সুযোগ-অবকাশ নাই বলেই প্যারী কমিউন প্রথম আদেশেই স্থায়ী সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করেছিল। তবে, প্যারী বিপ্লবের শত্রু প্যারিস অবরোধকারী বুর্জোয়াদের হামলা-আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধে প্যারিসের শ্রমিক-জনগণ নিজেরাই সশস্ত্র হয়ে , প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে নিজেদের মধ্য থেকে সাময়িক কালের জন্য নিজেদের কমান্ডার নির্বাচন করাসহ নিজেদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিজেরাই করতো বলে প্যারী কমিউনের দ্বারা গঠিত জনবাহিনী পরজীবীতা দোষে যেমন দুষ্ট নয়, তেমন পরজীবী শ্রেণীর শত্রু বৈ মিত্র নয়।

কিন্তু, পাকিস্তান আমলের ই.পি.আর বাংলাদেশ আমলে বি.ডি.আর হিসাবে পরিচিত হয়ে সম্প্রতি এক বিদ্রোহে জড়িয়েছে বলে নাম পাল্টিয়ে বি.জি.বি রাখা হলেও এই বাহিনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চরিত্র বা কাঠামো যেমন অপরিবর্তিত থেকেছে, তেমন রুশ জারের যুদ্ধ বাণিজ্যের খুনিবাহিনীর নাম পাল্টিয়ে " রেড গার্ড" রাখা হয়েছে বলেই কেবলমাত্র লেনিনের তেলছমতিতে তা- শ্রমিক শ্রেণীর মিত্র হবে, এমনটা যেমন সত্য নয়, তেমন রাশিয়ার ইতিহাস দ্বারাও তা সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়নি; বরং জার আমলের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সমেত সেনাপতিদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রত্যক্ষ অংশীদারীত্বে ও বলশেভিক মোড়ল লেনিনের প্রতিষ্ঠিত- রুশ ফেডারেশনের মতো চরম স্বৈরতান্ত্রিক তথা দমন-পীড়নমুলক রাষ্ট্র , মানব জাতির ইতিহাসে ইতো:পূর্বে কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

কিন্তু, লেনিনবাদীরা অনুরূপ সেনা কর্তৃত্বের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থক বলেই লেনিনবাদী কারাত বাবুরাও ভারতের সিপাহী বিদ্রোহকে " জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম" বা "স্বাধীনতা যুদ্ধ" ইত্যকার বিশেষণে আখ্যায়িত ও চিহ্নিত করতে গিয়ে বৃটিশের সেনাবাহিনীর ক্রিয়া-কর্ম ও চরিত্র সম্পর্কেতো নয়ই, এমনকি সেনাবাহিনী সমেত রাষ্ট্র সম্পর্কেও মার্কসদের ঐতিহাসিক মতামত বিবেচনায় নিতে অক্ষম হয়েছেন।

আমৃত্যু চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অধিপতি- মি: মাও সেতুঙ সহ চীনা কমিউনিস্ট ও সারা দুনিয়ার লেনিনবাদীদের শ্রদ্ধাভাজন-প্রিয়ভাজন ডা: সানয়েত সেনও চীনা জনগণ নয়, বরং চীনা সেনাবাহিনীর ওপরই প্রধানত ও অধিকতর নির্ভর করতেন চীনা জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন সম্পন্নকরণে । সেজন্য, তিনি স্বীয় জন্মস্থান চীন হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের সহযোগিতায় যেমন আমেরিকার জন্মসূত্রের পাসপোর্ট লাভ করেছিলেন, তেমন নানান দেশীয় বুর্জোয়াদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতায় চীনা সেনাবাহিনীর একাংশকে নিজের পক্ষে ভিড়াতে সক্ষম হলেও- ঐ তথাকথিত বিপ্লবী সেনাবাহিনীর জনৈক সেনা প্রধানই পরবর্তীতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে চীনে আবারো ঐ জাতীয়তাবাদী সেনাপতি স্বয়ং নিজ ডাইনেস্টী প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পেশাগত সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য নিরসন বা পেশাগত সুবিধাদি বাড়ানোর জন্য পৃথিবীর বহু দেশেই সেনা-বিদ্রোহ হয়েছে; এখনো দেশে দেশে সেনা বিদ্রোহ হয়, সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কিন্তু কোনো সেনাশাসকই স্বৈরতন্ত্র বৈ জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার অবাধ সুযোগ নয়, বরং এরূপ প্রতিটি সেনা শাসকই নিজ নিজ দেশের শ্রমিক শ্রেণীকেই সর্বাধিক মাত্রায় দমন-পীড়ন করে এবং কার্যত সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ-পীড়নকে অধিকতর হারে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর

শ্রম শক্তি শোষণের হার-মাত্রাকে কেবলই অধিক হতে অধিকতর করে বলেই সেনা শাসনের প্রতিটি দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর দু:খ-দৈন্যতা ও দুর্দশা কেবল বাড়তে থাকে। সুতরাং, আর যে নামেই আখ্যায়িত বা চিহ্নিত করা হোক না কেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কোনো মতেই ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইত্যাদি বলার বা তেমন দাবী করার ন্যূনতম ঐতিহাসিক ভিত্তি যেমন নাই তেমন ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতা মার্কসদের নামে অমন অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নাই।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার হতে উপরোদ্ধৃত অংশবিশেষে বর্ণিত হয়েছে যে, " Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeoise epoch from all earlier ones." অর্থাৎ - " উৎপাদনের অবিরত বৈপ্লবিকীকরণ, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম বিশৃংখলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা- আগেকার সবগুলো থেকে বুর্জোয়া যুগকে পৃথক করেছে।"

অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন করার তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের সুযোগ যেখানেই আছে বা থাকবে, তা হোক ওবামাদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, অথবা, লেনিন-ষ্ট্যালিনদের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের সহিত ফারাকহীন সমাজতন্ত্র, অথবা, লেনিনের ফতোয়াকৃত 'নিপীড়ত বুর্জোয়ার,' জাতীয় মুক্তির ' স্বাধীন' রাষ্ট্র বা মাওসেতুঙের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র , অথবা, নেহেরুদের 'মুক্ত'- ' স্বাধীন' ভারত - সর্বত্রই, পুঁজি- উল্লেখিত রূপ অবস্থা সৃষ্টি করবেই এবং করছে।

অথচ, উৎপাদনের সদা বৈপ্লবীকরণের নিরবচ্ছিন্ন বিশৃংখল সামাজিক অবস্থার স্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতাকে যেন যথার্থভাবে বুঝা না যায় সে জন্য ক-ই (ম) এ বিবৃত এই: " আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন।"

কার্যতই এবং বস্তুতই এমন বিশৃংখলা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার পুঁজিবাদ স্বীয় প্রয়োজনে স্বয়ং যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে বা প্রতিষ্ঠা করে সে সকল প্রতিষ্ঠান খোদ পুঁজিবাদ নিজেই ভাংগে বা ধ্বংস করে থাকে। উল্লেখ্য-ডাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত হয়েছিল ১৮০০ সালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতন-বিলুপ্তিও হয়ে উঠেছিল আসন্ন ও অনিবার্য। নানাবিদ কারণের মধ্যে এটিও অন্যতম যে, খোদ ইংলন্ডেই অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা তাদের বাণিজ্যের স্বার্থে ও প্রয়োজনে ভারতে একচেটিয়া কারবারের মৌরশি পাট্টাদার- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনাশকারী ও ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। সংকটাপন্ন কোম্পানির বেতনভুক সশস্ত্র কর্মচারীরা পুর্বের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কম পাবে, বিক্ষুব্ধ হবে বা আবশ্যক হলে বিদ্রোহ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কাজেই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতনকালে কোম্পানির সেনাবাহিনীর বঞ্চিত-ক্ষুব্ধ অংশ বিশেষ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেই পারে এবং ১৮৫৭ সালে ভারতে বিক্ষুব্দ সিপাহীরা তাই করেছে।

অথচ, মস্কোর লেনিনবাদীদের মতোই মি: প্রকাশ কারাতও সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ, বা স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি তকমায় সিক্ত ও বিশেষায়িত করতে এর কারণ সম্পর্কে কেবলই উপনিবেশিক শাসন-পীড়ন ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেছেন বটে কিন্তু

বৃটেনের পুঁজিওয়ালাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোম্পানির সংকটাপন্ন অবস্থার উল্লেখ পর্যন্ত করতে পারেননি। কিন্ত, মার্কস সেদিকে নজর দিতেও ভুলেননি।

"উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকে মুদ্রিত- " আসন্ন ভারতীয় ঋণ" প্রবন্ধে মার্কস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধারাবাহিক বার্ষিক ঘাটতিসহ মোট ঋণের পরিমাণ-চাহিদা ইত্যাদি বিবৃত করেছেন। এবং ট্রিবিউন, ৫৪৩৩ সংখ্যা, ২০ সেপ্টেম্বর,১৮৫৮ সালে প্রকাশিত "ভারত বিল" এ মার্কস লিখেন- " পিটের ১৭৮৪ সালের বিলে বোর্ড অব কন্ট্রোলের নামে কোম্পানি শাসন আসে মন্ত্রীসভার প্রভাবের আওতায়। ১৮১৩ সালের আইনে চীন বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যের একচেটিয়া তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ১৮৩৪ সালের আইনে তাদের বাণিজ্যিক সত্তা একেবারেই লুপ্ত হয় এবং ১৮৫৪ সালের আইনে চূর্ণ হয় তাদের ক্ষমতার শেষ অবশেষটুকু, যদিও ভারত প্রশাসনের ভার তখনো তাদেরই হাতে থাকে। ১৬১২ সালে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিরূপে গঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইতিহাসের আবর্তনে ফের তার আদিম সাজেই ফিরল, যদিও এখন এ কেবল এমন এক বাণিজ্য অংশীদারী যার কোন বাণিজ্য নাই, এবং এমন এক জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি যার কারবার চালাবার মতো কোনো তহবিল নেই, আছে শুধু পাবার মতো নির্ধারিত ডিভিডেন্ট। " অত:পর, অমন সংকট হতে পরিত্রাণে-" ১৮৪৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে যে-করেই হোক রাজস্ব বাড়ানোর প্রয়োজন হয়" বলে উল্লেখ করেছেন একই পুস্তকের "ভারত প্রশ্ন" নিবন্ধে মার্কস। ইতো:পূর্বে মার্কসের জবানীতেই বিবৃত হয়েছে যে, বিজয় সমাপ্ত হয়েছে বলেই ভারতের সেনাবাহিনী কার্যত হয়ে পড়েছিল- 'পুলিশ'।

সুতরাং, লুঠের বখরা বাবত যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বা অন্যান্য অঞ্চলে পোষ্টিং হলে বিশেষ ভাতা পাওয়ার সুযোগ যেমন কোম্পানির সেনাবাহিনীতে আপনাআপনি বন্ধ -রহিত হয়ে গেল, তেমন ভারতীয় সেনাদের পদোন্নতি প্রদান সহ এমনধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আবশ্যকতাও ফুরিয়ে গেল। কিন্তু, ভারতীয় সেনাবাহিনীস্ত ইংরেজ অফিসারদের পূর্বের মতোই যথারীতি পদোন্নতি, বিদেশ ভাতা ও আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা এবং পারিতোষিক না দিলে, তারাই বা কেন ভারতে এসে কোম্পানির পক্ষে কাজ করবে? তাই, ইংরেজ সেনা কর্মকর্তাদের অব্যাহতভাবে দেয় সুযোগ-সুবিধা ইত্যকার কারণে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ-বিক্ষোভ জন্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তদুপরি, নানা রকম সুযোগ-সুবিধা সংকোচনকারী -ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জারী কৃত- General Service Enlistment Act of 25 July 1856.ও, ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষকে উসকিয়ে দিয়েছিল।

আবার, রাজস্ব বৃধ্বির জন্য " দত্তক পুত্রকে" উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে উত্তরাধিকারহীন দেশীয় রাজন্যদের রাজ্য সরাসরি কোম্পানি প্রশাসনভুক্ত করার নীতি কার্যকরী করেছিলেন ইন্ডিয়ার গভর্ণর জেনারেল- লর্ড ডালহৌসি । এই নীতির কার্যকারতায় ১৮৪৮ সাল হতে ১৮৫৬ সালের মধ্যে সাতরা, জয়পুর, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি ও অযোধ্যা সরাসরি কোম্পানির প্রশাসনভুক্ত হয় এবং কোম্পানির বার্ষিক ৪ মিলিয়ন পাউন্ড আয় বৃদ্ধি হয়েছিল।

মি: কারাত বাবু ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও কবুল করেছেন এবং ট্রিবিউন, ৫৩৪৪ সংখ্যা, ৭ জুন,১৮৫৮ সালে "লর্ড ক্যানিঙের ঘোষণা ও ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত" শিরোনামে

প্রকাশিত নিবন্ধে ভূমি বন্দোবস্তের ফলে কর্তৃত্ব হারানো স্থানীয় তালুকদারদের অসন্তোষ জাগার কথা উল্লেখ করে মার্কসও লিখেছেন- " ঘোষণায় যে মালিকানা স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা শুধু জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব, জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশই তার আওতায় পড়ে, আসল কর্ষকেরা মোটেই তার ভেতর পড়ে না।" অর্থাৎ ক্যানিঙের ভূমি সংস্কারেও চাষীরা নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

অন্যদিকে -ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি -ভারতীয় হিন্দুদের দাসত্বের বর্বর প্রথা-"সতী দাহ" নিষিদ্ধ করেছিল ১৮২৯ সালে এবং "Hindu Widows' Remarriage Act, 1856" জারী করে স্থানীয় ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্ধদের বিরাগ ভাজন হওয়াটাতো অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতিকালেও এল. জি. বি, টি'র অনুকুলে কানাডা -আর্জেন্টিনা সহ যে সকল দেশ সেইম সেক্স মেরেজ বা লিভ টু গেদার বা কো-হ্যাবিটেন্ট ইত্যাদিকে আইনী রূপ দিয়েছে, সে সকল দেশে ক্যাথলিক মোড়লরা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তোলার বিরতিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অত:পর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদি সংকটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত না হত, তবে সংকটোত্তরণে আয় বৃদ্ধি করাসহ তদ্বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ নিত না। ফলে- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুযোগ-সুবিধাভোগী দেশীয় রাজন্যবর্গ, তালুকদার ও সিপাহীরা অসন্তুষ্ট হত না। কাজেই, সুযোগ-সুবিধা হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী ছাড়া আর অন্য কেউ সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, এমনটা যেমন প্রমাণ নাই, তেমন কারাত বাবুর দাবী কৃত "peasants in uniform", যুদ্ধ করার মতো কারণ ঘটেনি। বরং, মি: কারাত বাবুও উল্লেখিত নিবন্ধেই কবুল করেছেন যে, অযোদ্ধার তালুকদারগণ তালুক ফিরে পাওয়ার পর বিদ্রোহী পক্ষ পরিত্যাগ করে পুরানো প্রভু ইংলন্ডের পক্ষভুক্ত হয়েছে।

মি: কারাত বাবু - পেশোয়া বাজিরাওয়ের দত্তকপুত্র ধুন্ধুপন্থ ওরফে নানা সাহেব বা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই প্রমুখদের বীরত্ব গাঁথার উচ্ছ্বসিত তারিফ করে তাদেরেকেই ভারতীয় জাতিয় মুক্তি বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের "নায়ক" , " নায়িকা" স্বীকৃতিতে তাদেরকে ভারতের জনসাধারণের হৃদয় ও মনে চির জাগরুক রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে একই নিবন্ধে তিনি বলেছেন- গোয়ালিয়র, পাতিয়াল ও নেপালের রাজা সহ বহু দেশীয় রাজন্য ও তালুকদার বৃটিশকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন বলেই ইংলন্ড পরাজিত হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- গোয়ালিয়র বা পাতিয়ালের রাজার মতো যদি অক্ষত থাকতো নানা সাহেব বা লক্ষ্মীবাইয়ের রাজ্য-পাট তবে কি লক্ষ্মীবাইরা সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিত? অথবা -এসকল পরজীবী ভারতীয় রাজ-রাজাদের পূর্ব প্রজন্ম কোম্পানির দখলাধীন ভারতে নিজেদের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখার জন্য কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ১৭৫৭-১৭৬৬ সালের মধ্যে ৬০,০০,০০০ পাউন্ড নজরানা দেয়নি? (বি:দ্র- নজরানার এই তথ্যটি -পুঁজি, ১ম খন্ড, ২য় অংশ, অধ্যায় ৩১। শিল্প-পুঁজিপতির উৎপত্তি, ৩১৩ পৃষ্ঠায় , দিয়েছেন মার্কস।)

অথবা, ফ্রান্স- ইংলন্ডেও পরাজিত সামন্ত শক্তি বার বার ক্ষমতায় ফিরে আসতে চেয়েছিল এবং বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে বহুবার যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়েছে, মস্কোর লেনিনবাদীরা সহ কারাত বাবুরা কি সেই সকল প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ-সংঘাতকারী প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত চক্রকে সমর্থন করেন?

অথবা, শিল্প পুঁজির প্রয়োজনেই আমেরিকার দাস প্রথা উচ্ছেদ হওয়াটা খুবই জরুরী ও আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও দাসত্ব রক্ষায় আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের ১১ টি রাষ্ট্রের খোদ আমেরিকা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তথা দাসত্ব প্রথার ঘোরতর সমর্থক ও রক্ষক, অর্থাৎ দাস-দাসী রাখাটা তাদের স্বাধীনতা দাবীকারী ডেভিডদের নেতৃত্বে ১৮৬১-১৮৬৫ পর্যন্ত সংঘটিত আমেরিকার গৃহযুদ্ধে পরাজিত সেই দাসব্যবসায়ী ডেভিডদেরকে 'জাতীয় মুক্তি'র যথার্থ নায়ক গণ্যে সমর্থন করেন কি ? সামন্ত রাজ-রাজারা কি পুঁজিপতি শ্রেণী অপেক্ষা উত্তম, অথবা, তারা কি কৃষকের রক্ত শোষক নয় বা নয় তারা পরজীবী ? অথবা, কৃষক নয় বা সাধারণ করিগরও নয়, বরং যথারীতি কৃষক শোষক-পীড়ক ও পরজীবী এবং কোম্পানির একদা সহযোগী ও অনুগৃহীত বা কৃপা ধন্য- নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাইদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কারাত বাবুরা কি -ইস্তাহারের বক্তব্য অনুয়ায়ী পুঁজিবাদ মাত্র এক শতাব্দি পূর্ণ করার আগেই যে উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করেছে তা পূর্ববর্তী সকল প্রজন্মের উৎপাদন শক্তির চেয়ে আকারে ও পরিধিতে অনেক বড়, এই বক্তব্যকে সমর্থন-স্বীকার ও কবুল করতে পারেন , না কি, ইস্তাহারকে কেবলই এক কাগুজি বস্তুতে পরিণত করেন?

মি: কারাত বাবু সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আখ্যায়িত করলেও, এবং গোয়ালিয়র-পাতিয়াল ও নেপাল রাজার ভূমিকা বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল বলে উল্লেখ করলেও পাঞ্জাবের শিখরা যে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে ছিলেন তার লেশমাত্র উল্লেখ করলেন না। তা-কি এজন্যই যে, বেশ-ভুশায়ও একদম শিখ- মি: হরে কিষাণ সিং সুরজিৎ, বহুদিন পর্যন্ত সি.পি.আই (এম) এর সেক্রেটারী ছিলেন ? ইংরেজ সহযোগি পাঠানদের কথাও উল্লেখিত হয়নি। আবার, বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে বাংলা উল্লেখিত হলেও তদানিন্তন ভারতের সবচাইতে বড় জমিদার তথা বাংলারই বর্ধমান রাজা, বা সি.পি.আই.(এম) এর পশ্চিম বংগীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের প্রিয় ভাজন শ্রদ্ধেয় কবি রবীবাবুদের জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার বা ঢাকার নবাব সহ ভারতের আরো আরো প্রভাবশালী রাজ-রাজাদের ভূমিকা বিষয়ে মি: কারাত বাবু নিশ্চুপ থাকলেন কেন? অথবা, ২ লাখ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে যে বৃহদাংশ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি বা শিখ রেজিমেন্ট, মাদ্রাজ আর্মি ও বোম্বাই আর্মি, যা ছিল কোম্পানির মোট সেনাসংখ্যার ৮০%, এবং তারাই বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল; ইংরেজ পক্ষভুক্ত সেই সিপাহীরা কি ভারতীয় জাতীয় মুক্তির সমর্থক বা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত হবে কি না সে ব্যাপারেও মি: কারাত বাবু ভয়ানকভাবে নীরব কেন? অথবা, এরাই, এই বৃহৎ অংশই যদি ভারতীয় জাতীয় মুক্তির বিরোধী হয়, তবে ' সেনা পোষাকে আবৃত' ভারতীয় চাষী কারা?

তৎসত্ত্বেও, বিদ্রোহের ব্যাপ্তি বুঝাতে কারাত বাবু তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বেঙগল রেজিমেন্টের ১৩৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে ১২৮ হাজার বিদ্রোহে যোগাদান করেছিল।

অথচ, ট্রিবিউন, ৫০৮২ সংখ্যা, ৪ আগষ্ট, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত " ভারত বিদ্রোহ" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- "২৮,০০০ রাজপুত, ২৩,০০০ ব্রাহ্মণ, ১৩,০০০ মুসলমান, ৫,০০০ নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং বাকীটা ইউরোপীয় দিয়ে গড়া ৮০,০০০ সৈন্যের গোটা দেশীয় বেঙ্গাল আর্মি থেকে বিদ্রোহ, দলত্যাগ বা বরখাস্তের দরুন ৩০,০০০ সৈন্যই অদৃশ্য

হয়েছে, আর এ আর্মির বাকীটা থেকে কয়েকটা রেজিমেন্ট খোলাখোলিই ঘোষণা করেছে যে তারা বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ও সমর্থক থাকবে .....:"

অত:পর, সিপাহী বিদ্রোহ, বিদ্রোহের চরিত্র, বিদ্রোহের সাফল্য-ব্যর্থতা এবং বিদ্রোহী ও মোট সৈন্য সংখ্যা বিষয়ে- কারাত বাবু , না কি মার্কসের বক্তব্য , ঠিক বলে ধরে নিব?

মি: কারাত বাবু নিজেই স্বীকার করেছেন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য ছিল না বিদ্রোহীদের; তবু এটি 'জাতীয় চরিত্র' লাভ করেছিল। কারণ-বাংলা হতে পাঞ্জাব পর্যন্ত এটির বিস্তার হয়েছিল।

তা-হলে, আন্দোলনের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তী দ্বারাই যদি জাতিয় চরিত্র নির্ণিত হয়, তবেতো- কারাত বাবুর যুক্তিতেই তুলনামূলক স্বল্প বিস্তৃতির -যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির - বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বা সূর্যসেনদের বিদ্রোহতো, জাতীয় নয়, এবং স্বাধীনতারতো নয়ই। অবশ্য কালী দেবতার ভক্ত সূর্যসেনরা ভারতীয় আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল বলে কোনক্রমেই ভারতীয় স্বাধীনতা নয়, বরং তুলনামূলক বিচারে সভ্য পুঁজিবাদী অবস্থা হতে অসভ্য-বর্বর, প্রকৃতি শোভন সম্পর্কের দাসতন্ত্রের রাজত্ব পুন:প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাই, যুগান্তর-অনুশীলন পন্থীদের আন্দোলন ঐতিহাসিক মুল্যায়নে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে গণ্য না হওয়ার উপযুক্ত কারণ আছে কি?

কারাত বাবু, তার নিবন্ধে সন্যাস বিদ্রোহকেও সমর্থন করেছেন। অথচ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর হতে স্থানীয় জমিদার -হেডম্যানরা হিন্দু সন্যাসীদের ইতো:পূর্বে দেয় "ধর্মীয় কর" দিতে অপারগতায় কারিগর-কৃষকের শোষক-পীড়ক, পরজীবী জমিদারদের পরজীবীতার উচ্ছিষ্টভোগী, ভাগীদার ও সহযোগি হিসাবে সন্যাসীরা নিজেদের পরজীবীতার সুযোগ অব্যাহত রাখতে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল পশ্চিম বংগের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে। বঙ্কিম চট্রোপাধ্যায় " আনন্দমঠ" উপন্যাস লিখে চরম প্রতিক্রিয়াশীল সন্যাস বিদ্রোহকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছিলেন। যুগান্তরীরা ঐটিকে তাদের মহাভারত গণ্য করতো। অত:পর, যুগান্তর-অনুশীলনের মতো মি: কারাত বাবুর পার্টিও অন্তত এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ঋষি বঙ্কিম পন্থী নয়?

কারাত বাবুদের গুরুজী ষ্ট্যালিন যেমন বলেছিলেন- মার্কসরা পুঁজির শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে বসবাস করেছিলেন বলে পুঁজিবাদী অশান্তি দেখেননি, তেমনটা বিশ্বাস করেই হোক বা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের বদ-মতলবেই হোক, ফকির-সন্যাসীসহ ভারতের চাষীদের দমন-পীড়নের জন্য দায়ী কোম্পানিকে যেই উচ্ছেদ করুক তাতেই লেনিনবাদী " কমিউনিস্ট" কারাত বাবুরা বেজায় খুশি।

কিন্তু, ইংলন্ডের পুঁজিপতি শ্রেণী যে, খোদ ইংলন্ডেই চাষীকে ভূমি হতে উৎখাত করা সমেত নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার-অনাচার এবং দমন-পীড়ন করেই পুঁজিবাদের জমিন তৈরী করেছে ; যতোই নিষ্ঠুর ও অশান্তির হোক, তবু পুঁজিবাদের সেই উৎক্রমণকালকে যদি বিপ্লবী ও প্রগতিশীল না বলতে চাইতেন কারাত বাবুরা, তাহলে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা বিবৃত ইস্তাহারের ঐ অংশটুকুও ইস্তাহার হতে হাপিস করে দিতেন, যেমনটা তারা অনুবাদকালে করেছেন।

ষ্ট্যালিন বা কারাত বাবুদের মতো হীনতম স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে নয়, বা তাদের মতো খন্ডিত বা আংশিকভাবেও নয়, মার্কসরা মানবজাতির ইতিহাস এবং পুঁজিবাদকেও

দেখেছেন বটে খোলাখুলি ও পরিপূর্ণভাবে। তাই ঐতিহাসিকভাবে খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালনকারী বুর্জোয়ারা শোষক বলেই তারা যে সকল নিষ্ঠুর-নির্মম দুস্কর্ম সাধন করেছে তার বিশদ বিবরণও দিয়েছেন মার্কস তার পুঁজি গ্রন্থেও।

পুঁজি, ১ম খন্ড, ২য় অংশ, "অষ্টম ভাগ- তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন, অধ্যায় ২৭। - জমি থেকে কৃষিজীবী উচ্ছেদ" ২৮৬ ও ২৮৭,পাতায় বর্ণিত এই: " চার্চ-সম্পত্তির লুণ্ঠন, রাষ্ট্রের হাত থেকে ভূসম্পত্তির প্রতারণামূলক হস্তান্তর, যৌথমালিকানাধীন ভূমির লুণ্ঠন, সামন্ততান্ত্রিক ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তির জবরদখল ও অবাধ সন্ত্রাসের অবস্থায় তাদের আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর, এই গুলি হল আদিম সঞ্চয়নের কয়েকটি রাখালিয়া কাব্যধর্মী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি পুঁজিবাদী কৃষির জন্য ক্ষেত্র জয় করেছিল, জমিকে করেছিল পুঁজির অঙ্গাঙ্গী অংশ, এবং শহরাঞ্চলের শিল্পগুলির জন্য সৃষ্টি করেছিল ' মুক্ত' ও আইন বর্হিভূত প্রলেতারীয়েতের আবশ্যকীয় যোগান।"

এবং একই গ্রন্থের, "অধ্যায় ২৮।-১৫ শ শতাব্দী থেকে দখলচ্যুতদের বিরুদ্ধে অমানুষিক বিধান", ২৮৮ হতে ২৯২ পাতায়, মার্কস লিখেছেন- "অষ্টম হেনরি। ১৫৩০: যেসব ভিক্ষুক বৃদ্ধ এবং কর্মক্ষম নয়, তারা ভিক্ষা করবার অনুমিত পত্র পাবে। অণ্যদিকে, সমর্থ অথচ অলস ব্যক্তিদের জন্য বেত্রাঘাত ও কয়েদ। গোরুর গাড়ীর পশ্চাদভাগে বেঁধে তাদের উপর বেত্রাঘাত চালিয়ে যাওয়া হবে যতক্ষণ না সমস্ত দেহ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে এবং তার পর তাদের দিয়ে এই শপথ করিয়ে নেওয়া হবে যে তারা তাদের জন্মভূমি অথবা গত তিন বছর যাবৎ যেখানে ছিল, সেইখানে ফিরে গিয়ে 'নিজেদের কাজে নিযুক্ত করে রাখবে।' কী নির্মম পরিহাস! অষ্টম হেনরির আমলের, ২৭ নং-এ, পুরনো সংবিধিকে কয়েকটি নতুন ধারার সাহায্যে আরো শক্তিশালী করে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ভবঘুরে জীবনযাপনের অভিযোগে দ্বিতীয় বার ধৃত হলে বেত্রাঘাতের পুনরাবৃত্তি করা হবে এবং অর্ধেক কান ছেদন করা হবে; কিন্তু তৃতীয় অভিযোগের বেলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাপাচরণে অভ্যস্ত এবং সমাজের শত্রু হিসাবে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ড: তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে, ১৫৪৭ সালের একটি সংবিধিতে বলা হয়েছে যে যদি কোনো লোক কাজ করতে অস্বীকার করে তবে যে ব্যক্তি তাকে অলস বলে অভিযুক্ত করেছে সেই ব্যক্তির কাছেই তাকে ক্রীতদাস হিসাবে থাকতে হবে। প্রভু তাঁর ক্রীতদাসকে খাওয়াবেন রুটি, পানীয় জল, পাতলা সুরুয়া এবং মাংসের সেইসব পরিত্যাক্ত ছাঁট যা তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেন। চাবুক ও শিকলের সাহায্যে তিনি তাকে দিয়ে যে কোনো কাজই করিয়ে নিতে পারেন, তা সেকাজ যত ঘৃণ্যই হোক। ক্রীতদাস যদি এক পক্ষকাল অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে যাবজ্জীবন গোলামী করতে হবে এবং তার কপালে অথবা পশ্চাদ্দেশে ' S' অক্ষরটি দাগিয়ে দেওয়া হবে। সে যদি তিন বার পালিয়ে যায় তা হলে তাকে গুরুতর অপরাধী হিসাবে ফাঁসি দেওয়া হবে। গৃহপালিত বলদ বা ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির মতো প্রভু তাকে বিক্রয়, দান অথবা ক্রীতদাস হিসেবে ভাড়া খাটাতে পারবে। ক্রীতদাসেরা যদি প্রভুর বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্র করে তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। খবর পেলে শান্তিরক্ষাকারী বিচারকগণ এই সব দুরাত্মদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিবে। যদি দেখা যায় যে একজন ভবঘুরে তিন-চার দিন ধরে অলস জীবনযাপন করছে তা হলে তাকে তার জন্মস্থানে নিয়ে গিয়ে তার বুকে তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে ' V' অক্ষরটি দেগে দেওয়া হবে এবং শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় রাস্তায়

অথবা অন্য কোনো কাজের জায়গায় তাকে নিয়োগ করা হবে। একজন ভবঘুরে ব্যক্তি তার জন্মস্থান সম্পর্কে যদি মিথ্যা বিবৃতি দেয় তবে তাকে সেই স্থানের বাসিন্ধাদের অথবা কর্পোরেশনের ক্রীতদাস হিসাবে চিরজীবন কাটাতে হবে এবং ‘ S’ অক্ষরটি তার গায়ে চিহ্নিত হবে। প্রত্যেকেই ভবঘুরে লোকের সন্তানাদিদের কেড়ে নিয়ে গিয়ে শিক্ষানবিশের কাজে,– পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত এবং কন্যার ক্ষেত্রে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ,– নিযুক্ত করতে পারবে। যদি তারা পালিয়ে যায় তবে ঐ বয়সকাল পর্যন্ত তারা তাদের প্রভুদের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে এবং প্রভুরা প্রয়োজন হলে তাদের শৃংখলাবদ্ধ অথবা বেত্রাঘাত ইত্যাদি করতে পারেন। যাতে তাকে সহজেই চেনা যায় এবং তার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারা যায় সেই জন্য প্রত্যেক প্রভু তার ক্রীতদাসের গলায়, হাতে অথবা পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে রাখতে পারেন।* এই সংবিধির শেষাংশে নির্ধারিত করা হয়েছে যে খাদ্য, পানীয় এবং কর্ম সংস্থানের পরিবর্তে কোনো এলাকা বা কোনো কোনো ব্যক্তি এক ধরনের প্যারিশ–ক্রীতদাস ১৯ শ শতাব্দীতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংলন্ডে দেখা যেত।

এলিজাবেথ, ১৫৭২: ১৪ বছরের অধিক বয়স্ক অনুমতি পত্র–বিহীন ভিক্ষুকদের প্রচন্ড বেত্রাঘাত করা হবে এবং বাম কানে দেগে দেওয়া হবে যদি কোনো ব্যক্তি তাদের দুই বৎসরের জন্য কর্মে নিয়োগ করতে স্বীকৃত না হন; অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের ফাঁসি দেওয়া হবে যদি কোনো ব্যক্তি তাদের দুবছরের জন্য কর্মে নিয়োগ করতে স্বীকৃত না হন; কিন্তু তৃতীয় বারের অপরাধে কোনো রকম ক্ষমা না দেখিয়ে গুরুতর অপরাধী হিসাবে তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। এই ধরনের অন্যান্য সংবিধির মধ্যে আছে এলিজাবেথের রাজত্বের ১৮তম বছরে জারিকৃত আইন, অধ্যায় ১৩, এবং ১৫৯৭ সালের অপর একটি সংবিধি।*

প্রথম জেম্‌স্‌: কোনো মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলে তাকে ভবঘুরে এবং দুর্জন বলে ঘোষণা করা হবে। শান্তিরক্ষাকারী বিচারকগণ তাদের বিচার সভায় এইসব মানুষকে সর্বসন্মুখে বেত্রাঘাতের হুকুম এবং প্রথম অপরাধে ৬ মাস ও দ্বিতীয় অপরাধে দুই বছরের জন্য কারাদন্ড দিতে পারবেন। জেলখানায় থাকা–কালীন তাদের যে পরিমাণ এবং যত বার বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন বলে শান্তিরক্ষাকারী বিচারকগণ মনে করবেন, তত বার তাঁরা তা করতে পারবেন.....অসংশোধনীয় এবং বিপজ্জনক দুর্বৃত্তদের বাম কাঁধে ‘ R’ অক্ষরটি দাগিয়ে দিয়ে তাদের কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হবে এবং যদি তাদের পুনরায় ভিক্ষা করতে দেখা যায় তবে বিনা কৃপায় ফাঁসি দেওয়া হবে। এই সংবিধিসমূহ যা ১৮শ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত আইনসম্মতভাবে কার্যকর ছিল,তা রদ করা হয় মাত্র অ্যানের দ্বাদশতম বছরে জারীকৃত আইন দ্বারা, অধ্যায় ২৩।

অনুরূপ আইন গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সে, সেখানে প্যারিস শহরে ১৭ শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি ভবঘুরেদের (ত্রুয়ঁদ্‌স্‌) রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এমন কি, ১৬ শ লুই– এর রাজত্বের প্রারম্ভে (১৩ই জুলাই, ১৭৭৭ সালের অধ্যাদেশ) ১৬ থেকে ৬০ বছরের যে কোনো সুস্থ ব্যক্তির যদি অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকে, এবং সে যদি কোনো কাজে লিপ্ত না থাকে তবে তাকে জাহাজে কাজের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একই ধরনের সংবিধি হল নেদারল্যান্ডসে পঞ্চম চার্লসের সংবিধি (অক্টোবর ১৫৩৭), হল্যান্ডের রাজ্য ও

নগরসমূহের ওপর অনুশাসন (১০ মার্চ,১৬১৪), ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ এর 'প্লাকাট' (২৬ জুন,১৬৪৯) ইত্যাদি।

এইভাবে কৃষিজীবীদের প্রথমে জমি থেকে জোর করে উৎখাত, গৃহচ্যুত এবং ভবঘুরেতে পরিণত করা হল; তার পর বীভৎস আইনসমূহের সাহায্যে বেত্রাঘাত ও চিহ্নিত করে তাদের মজুরিবৃত্তির প্রয়োজনীয় নিয়মানুবর্তিতার বেঁধে ফেলা হল। " এবং

একই গ্রন্থের "অষ্টমভাগ।– তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন, অধ্যায় ৩১।– শিল্প-পুঁজিপতির উৎপত্তি" অংশে-৩১১ পাতায় ডাবলিউ. হাউইট- এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন মার্কস, যা এই: " ' পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে, এবং প্রতিটি জাতি যার উপর তারা আধিপত্য বিস্ত ার করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের উপর তথাকথিত খ্রীষ্টান জাতি যে জঘন্য ও চরম অত্যাচার করছে, তত অত্যাচার কোনো যুগে অন্য কোনো জাতি করে নি, তা সে জাতি যতই বর্বর, অসভ্য, নির্লজ্জ ও দয়ামায়াহীন হোক না কেন।*' "

অত্তোদিন আগেও মার্কসের সাক্ষী- হাউইটও দেখেছেন বটে পুঁজিপতি শ্রেণী সমগ্র দুনিয়া দখল করেছে এবং এই দখলদারীত্ব হাসিল ও জারী রাখতে ভয়ানক বর্বরতা সমেত কি জঘন্যতম অত্যাচার করেছে।

অথচ, হালের বৈশ্বিক কর্তা বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফসহ ইন্টারনেটের যুগেও তা দেখতে পারেননি মননীয় ভারত প্রেমিক কারাত বাবুরা! শোষক শ্রেণী বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী শোষণের নিমিত্তে পুঁজি গ্রন্থে বিবৃত উল্লেখিত রূপ অমানবিক ও অমানুষিক এবং নির্মম-নিষ্ঠুর বিধি-বিধান করে নিংড়ে নিয়েছিল শ্রম। এখন, এই শোষকদের শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতন হতে রক্ষা পেতে শোষিত-পীড়ত ও নির্যাতিতরা কি, প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে ফিরে যাওয়া চেষ্টা করবে, না কি দুনিয়া হতে শোষণ-পীড়নকারী খোদ পুঁজিবাদকেই গুডবাই জানাবে?

প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতি-রাজা, বাদশা, তালুকদার-জমিদার প্রভৃতি পরজীবীরা কি শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতন করতো না? অথবা, দেশী বা বিদেশী , যে পরিচয়েরই হোক পুঁজিপতি শ্রেণীকে হটিয়ে রাজা-বাদশা, সম্রাট-সুলতান, জমিদার-তালুকদার, পুরোহীত ও জাজক ইত্যকার পরজীবীদের কর্তৃত্বে প্রত্যাবর্তন করাটা যদি জাতীয় মুক্তি অর্জন , স্বাধীনতা হাসিল ইত্যকার " মহান" কর্ম হিসাবে স্বীকৃত ও গণ্য হয় এবং কারাত বাবুর ফতোয়া মতো – তা যদি চিরদিন, জনগণ মনে ও হৃদয়ে জাগরূক রাখতে হয়, তবে আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বুর্জোয়াদের অপেক্ষা অন্ধকার-মধ্যযুগীয় বর্বর রাজা-বাদশাহদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মাহাত্ব অধিকতর বলে গণ্য হয় না বা রাজা-বাদশাদের সুবিধাভোগী গোলামরা যেমন লিখে থাকে " প্রজা বৎসল, রাজা," বা " প্রজা হৈতষী রাজা" এমন অসত্য ও মিথ্যা-বানোয়াটি রাজ কীর্তণের স্তাবকতাপূর্ণ স্তুতিসমেত রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে বিশেষ ফতোয়া হিসাবে তা চিহ্নিত ও গণ্য হয় না ?

সামগ্রীকভাবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ বা উৎখাত নয়, উপনিবেশ হতে মুক্তি তথা দেশীয় পুঁজিপতি-পুঁজিবাদীদের পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব প্রসার সমেত শাসন-শোষণের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হাসিলকে " জাতীয় মুক্তি", " স্বাধীনতা" ইত্যকার রাজনৈতিক কূট-কৌশলী বোল-চালের আবরণে বিদেশী পুঁজিপতিদের বিতাড়নে পরাজিত ও দেশীয় রাজা-বাদশা বা আদিকালের অন্ধকার জগতের অন্ধত্বের মোড়ল-সর্দ্দারদের

সহযোগিতা নিয়ে হলেও নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেই কি শোষিত-পীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের দু:খ-দুর্ভোগ ও দুর্দশা বাড়া বৈ কমে কি?

উল্লেখ্য- দস্যু-তস্কর বা গুন্ডা-বদমাস দ্বারা নয়, আক্রান্ত যদি ধর্ষিত ও লুন্ঠিত হয় খোদ পরিত্রাতা রূপী নায়ক আসলে ছদ্মবেশী ভন্ড ও দুস্কর্মের হোতা কর্তৃক তখন, নির্যাতিতার কেবলই সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণাই নয়, বরং প্রচলিত বিশ্বাস-ধারণা জনিত কারণেই ঐ ভদ্রবেশী-বিপদের বন্ধু রূপী মহান ব্যক্তির একটি স্বচ্ছ ও মহিমামন্ডিত প্রতিচ্ছবির প্রতি ইতোমধ্যে প্রতিস্থাপিত -আস্থা-বিশ্বাসও নষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার হেতুবাদে মানবজীবনের প্রতিই ঘৃণা-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হওয়ার মতো মনো-দৈহিক যন্ত্রণা বাড়ে না ? খল নায়ক গুন্ডাকে হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু নায়করূপী তস্কর ও দুস্কর্মের হোতা অসভ্য-বর্বর পান্ডাকে মানা যায় কি ?

জেফারসন্স, লেনিন-মাও ও কারাত বাবুদের 'জাতীয় মুক্তি' ও ' স্বাধীনতা'র ফর্মুলায় ইতিমধ্যে জাত-জাতির মুক্তির নামে বা বিদেশী তাড়িয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তি বা স্বাধীনতা হাসিলের ভুয়া-বানোয়াটি দাবীর বদৌলতে দুনিয়ার দেশে দেশে যে সকল জাতীয়-বীর, নায়ক, মহা নায়ক বা জনক ইত্যাদি সাজতে সক্ষম হয়েছেন, সেই সকল বহুরূপীদের তথাকথিত মুক্ত -স্বাধীন রাজত্বের নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণী কি উপনিবেশিক আমলের তুলনায় কম মাত্রায় শোষিত-পীড়ত ও নির্যাতিত না কি অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় পুঁজিবাদ রক্ষণা-বেক্ষণে ব্যয় তথা অমন নায়ক-মহানায়কদের বংশ-গোত্র ও রাজনৈতিক ইয়ার-বন্ধু সমেত তাদের পুঁজিবাদী সুযোগ-সুবিধা বৈশ্বিকভাবে সংরক্ষণে বিশ্বব্যাংকসহ নানান জাতীয় বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান , শান্তি রক্ষার নামে নানান ধরনের সশস্ত্র বাহিনী, মানবাধিকার রক্ষার অজুহাতে সৌম্য চেহারার পীর-পুরোহীত ধরনের বুদ্ধিজীবী নামীয় ভন্ড-প্রতারক সুবিধাভোগী ও পুঁজিবাদের উচ্ছিষ্টভোগী- নানান ঘরনার উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী- মোড়ল, তৎসত্ত্বেও অস্থিত্ব সংকটে বিপন্ন পুঁজিবাদ অতীত আশ্রিত হয়ে অতীতের ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিষ্ঠান-প্রথা লালন-পালন ও পরিপোষণ করতে গিয়ে কার্যত উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার-মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকের শ্রম শক্তি অধিকতর হারে নিংড়ে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে আরো অধিকতর মাত্রায় শোষণ-পীড়ন, নির্যাতন ও নির্মমতার মধ্যে নিক্ষেপ করে নিত্যই শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ভোগ-দুর্দশা বাড়িয়ে যাচ্ছে না ?

লেনিনরা যদি সমাজতন্ত্র -কমিউনিজম ইত্যকার পোষাক আবৃত হয়ে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যকার বুর্জোয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনীতির চোরাবালি ও কানাগলিতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে নিপতিত করার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত না করতো, কারাত বাবুরা যদি বিদেশী মোগল সম্রাটের পক্ষ নিয়ে বিদেশী ইংরেজ তাড়ানোর অজুহাতে পুঁজিবাদ কর্তৃক পরাজিত দিল্লীর সম্রাটকে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার নায়ক বানিয়ে একদিকে পুঁজিবাদ অন্যদিকে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম ও বিকাশ না ঘটাতেন, তবে কি, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় দু:খ-দুর্দশা অনুধাবনে লেনিনীয় কল্পনা বিলাসিতার আশ্রয় না নিয়ে কেবলই বাস্তবতা তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিজেকে সহ দুনিয়াকে যেমন খোলাখোলি দেখতে পারতো, তেমন নিজেদের মুক্তির অজুহাতে মাও-হোচি, কিম-ফিদেলদের মতো এতগুলো পরিত্রাতা, নায়ক-মহানায়ক ইত্যকার পরজীবী জীবের

জন্মে -উত্থানে সহযোগিতা না করে কেবলই নিজের শ্রেণী মুক্তির শর্তে মানব জাতির মুক্তির কাজটিকেও সংগঠিত ও তরান্বিত করতে পারতো না ?

পুঁজিবাদ উৎপাদন উপকরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের বৈপ্লবিক উন্নয়ন ও রূপান্তর সাধন করেছিল, তা কস্মিণকালেও করার সুযোগ ছিল না প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে। পুঁজিবাদই শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী বিভাজনের সমাপ্তি সাধনের বস্তুগত ভিত্তি রচনা করছে বলেই শ্রমিক শ্রেণী- পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত-উচ্ছেদ করে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন -শোষণহীন সমাজের ভিত্তি-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

কাজেই, শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী মুক্তি অর্জনে পুঁজিবাদকেই উচ্ছেদ-বিনাশ করবে বলেই পুঁজিবাদের আপোষহীন বিরোধী পক্ষ বলেই সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন-নিপীড়ন এবং অত্যাচার ইত্যকার সকল ঘৃণ্য কার্যাদি তথা মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ ও অমর্যাদা করা যেতে পারে এমন ধরনের সকল প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, সুযোগ-সুবিধা রহিত-বাতিল করাই শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য ও করণীয় এবং দায়িত্ব।

সুতরাং, উপনিবেশ হতে স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তি ইত্যকার অজুহাতে শ্রমিক শ্রেণী যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ বিশেষের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস-বিঘ্ন করে অপরাংশের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকার মতো কোনো কাজ করতে পারে না, তেমন কখনো কোনো কারণেই প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতি- সম্রাট, রাজা ও তালুকদার-জমিদার ইত্যকার পরজীবী শ্রেণীর পক্ষভুক্ত হতে পারে না বা তেমনটা হওয়ার সুযোগ নাই।

অধিকন্ত, বৈশ্বিক পুঁজিবাদী শৃংখলে আটক-আবদ্ধ বলেই আন্তঃনির্ভরতার সম্পর্কাধীন জাতিসমূহের জাতীয়তাবাদীবোধ বিলীন ও বিলুপ্ত হওয়াই নিয়তি ব্যতীত জাতি বিশেষের স্বনির্ভর হওয়ার কোনো ধরণের সুযোগ বৈশ্বিক পুঁজিবাদ রাখেনি বলেই কোন জাতির পক্ষে একা ও এককভাবে টিকে থাকা অসম্ভব।

সুতরাং, জাতীয় মুক্তি হাসিল ইত্যকার বিষয়গুলো কেবলই আজগুবি গাল-গল্প অথবা, পুঁজিবাদের বৈশ্বিক চরিত্র অনুধাবনে অক্ষমতা বা পুঁজিবাদের সেবা করার অপকৌশল বিশেষ মাত্র নয় কি?

লেনিন এবং লেনিনবাদী মোড়ল কারাত বাবুরা প্রকৃতই পুঁজিবাদের সেবক বলেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে নয়, বরং অসৎ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে লেনিনের প্রণীত " নিপীড়িত জাতির মুক্তির" রাজনৈতিক ফর্মুলার ফর্মেটে দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যত বানোয়াটি মুলে বিবৃত করেন বলেই যেমন মস্কোর লেনিনবাদীরা তেমন কারাত বাবুরা একদিকে পুঁজিবাদের অন্যদিকে ভারতের ইতিহাস বানোয়াটি মুলে প্রস্তুত করেছেন। তাই একদিকে যেমন পুঁজিবাদ ও ভারতের অতীত ও ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখিত রূপ অসত্য-মিথ্যা, বানোয়াট-ভ্রান্ত ও ভুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমন মার্কসদের বক্তব্যও বিকৃত করা সমেত তদ্বিষয়ে জাল-জালিয়াতি করে খোদ মার্কস সম্পর্কে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়ানো সহ অপবাদ রটিয়েছেন।

" উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকে মুদ্রিত , লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর,১৮৯২, " এন.এফ. দানিয়েলসন সমীপে এ্যাংগেলস" -পত্রে প্রকাশিত এই: "পুঁজিবাদী উৎপাদন একটা অস্থায়ী অর্থনৈতিক পর্যায় বলে অন্তর্বিরোধে তা পরিপূর্ণ, পুঁজিবাদ যে পরিমাণে বিকশিত হয়, এগুলিও সেই পরিমাণে গড়ে ওঠে ও প্রত্যক্ষ হয়।"

অত:পর, স্বদেশে ভদ্র পুঁজিবাদ উপনিবেশে যে ভীষমরকম অসভ্য হয়, সেটাওতো পুঁজিবাদেরই অন্ত:র্বিরোধের বৈশিষ্ট্যই বটে। মার্কসরা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই স্ববিরোধীতার চিত্র যথার্থভাবে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু, কারাত বাবুরা কেবলই নিজেদের বদ মতলব হাসিলে মার্কসের অনুরূপ বিবরণ ও বিবৃতিকে ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি বা ভারতের বিদ্রোহের বিজয় তারা আশা করেছিলেন রূপ বক্তব্য দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

উপনিবেশিক শক্তির বিরোধীতা বা উপনিবেশিকতা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যুদ্ধ করা মানে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ-উৎখাত নয় বা পুঁজিবাদের বিরোধীতাও নয়। পুঁজিবাদ বিনাশে কর্মরত কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে– পুঁজিবাদ বিনাশী-বিরোধী ক্রিয়াদি সম্পন্ন ও সম্পাদন করা বৈ উপনিবেশিকতা হতে মুক্তির নামে বুর্জোয়াদের অংশ বিশেষের সাথে সহযোগিতা করে বুর্জোয়া সমাজের পতনকে বিলম্বিত করা নয়।

কিন্তু, লেনিনবাদীরা এ যাবৎ তাই করছে। অথচ, লেনিনবাদীদের নেতৃত্বে হোক, আর বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বে হোক বা জাতিসংঘের সনদমূলে হোক, যে সকল রাষ্ট্র উপনিবেশ হতে মুক্ত বা স্বাধীন হয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেসকল নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তত একটিও কার্যতই বা প্রকৃতই স্বাধীন বা স্বনির্ভর তেমনটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে কি? সারা দুনিয়ায় প্রমাণ নাই,এবং লেনিনের রাষ্ট্রগুলোও আজ নাই। তবু লেনিনবাদী কারাত বাবুরা এখনো ফেরি করছেন জাতীয় মুক্তির রাজনীতি ।

এমন রাজনীতির ফেরিওয়ালা বলেই শ্রমিকশ্রেণীকে দেশবিশেষের গন্ডীতে আবদ্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে কি মস্কো বা কলকাতার লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট ইস্তাহারের এতদসংক্রান্ত বা তৎসংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ অনুবাদেও সুকৌশলে বিকৃতি ঘটিয়েছে।

যেমন- ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " The proletariat of each country, of course, first of all settle matters with its own bourgeoisie."

বংগানুবাদে- " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে বিষয়াদি মিটাতে হবে তার নিজ বুর্জোয়াদের সাথে।" এখানে প্রলেতারিয়েতের দেশ নয়, বা প্রলেতালীয়েতের নিজ দেশীয় বুর্জোয়াও নয়, বরং খুবই পরিস্কার করে বলা হয়েছে - " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েত" ও " নিজ বুর্জোয়াদের"সাথেই অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী যে যেখানে বা যেদেশে শ্রম শক্তি বিক্রয় করতে গিয়ে , যে পুঁজিপতি কর্তৃক শোষিত হয় সেই বুর্জোয়ার সহিতই বিরোধ-বৈরীতার শত্রুতামূলক সম্পর্কাধীন বলেই প্রত্যেক শ্রম শক্তি বিক্রেতা-তার শ্রম শক্তির ক্রেতার সহিত সর্বাগ্রে দেনা-পাওনার হিসাব মেটাবে। তদার্থে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের রূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তাহারেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটি আকারের দিক থেকে জাতীয় হলেও মর্মবস্তুতে তা নয় অর্থাৎ জাতীয় নয় বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক।

অথচ, তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির গ্যাড়াকলে নিপতিত করে এবং দেশ বিশেষের সীমানা ও গন্ডীতে আটক ও বন্দী করার অপকৌশলে শ্রমিক শ্রেণীকে নানান দেশের পরিচয়-পরিচিতিতে চিহ্নিত ও শনাক্ত করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর জাত-জাতি বিমুক্ত পরিচয় বিমোচনে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম সূত্র-আন্তর্জাতিকতাবাদকে অস্বীকার ও অকার্যকর করার দুরভিসন্ধিতে - মস্কো হতে বাংলায় প্রকাশিত ইস্তাহারে বর্ণিত এই:

" প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে নিজেদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে।" এবং

" বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা প্রথম খন্ড, সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি অমিয়কুমার বাগচী," প্রথম প্রকাশ, ৭ ফ্রেব্রুয়ারী,২০০২, প্রকাশক, সলিল কুমার গাঙ্গুলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা হতে প্রকাশিত পুস্তকখানির ৭৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত- "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো: প্রসংগ বিশ্বায়ন জাতি রাষ্ট্র ও শ্রেণী সংগ্রাম", বিপুল ভট্টাচার্য কর্তৃক ভাষান্তরিত নিবন্ধটিতে সি.পি.আই. (এম) এর সাধারণ সম্পাদক মি: প্রকাশ কারাত লিখেন- "প্রতিটি দেশের সর্বহারাকে নিজস্ব দেশের বুর্জোয়াদের সাথে বোঝাপড়ার কাজটা আগে সেরে নিতে হবে।" এবং তার পার্টিরই ঐ প্রকাশনা সংস্থা হতে অর্থাৎ কলকাতা হতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে ফলসালা করতে হবে স্বদেশী বুর্জোয়াদের সংগে।" অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের নিজ দেশ আছে এবং " স্বদেশী" বুর্জোয়াদের সংগে প্রলেতারিয়েত সর্বাগ্রে সংগ্রাম করবে।

অথচ, ইংরেজী বাক্যে প্রলেতারীয়েতের " Own country" or " bourgeoisie of own country" বলে কোনো শব্দ বা শব্দরাজি নাই। তাছাড়া ইংরেজী ভাষার ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " With its birth begins its struggle with the bourgeoisie," অর্থাৎ "বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্মমুহূর্ত থেকে।" কাজেই, সংগ্রামের কারণটা যেমন পরিস্কার তেমন সময়-ক্ষণটাও সুস্পষ্ট এবং বুর্জোয়ার সাথেই যে লড়াইটা করতে হয়, তা সে পেটি কি বিগ, দেশী কি বিদেশী, অথবা, নিপীড়ক বা 'নিপীড়ত বুর্জোয়া', যাহাই হোক, যে-ই শ্রমিকের শ্রম শক্তির ক্রেতা, সে-ই শ্রমিকের শোষক বলেই তার সাথেই অর্থাৎ শ্রম শক্তির ক্রেতা তথা শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিকের সংগ্রাম; এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতের কারণেই এই বিরোধ ও সংগ্রাম শুরু হয় শ্রমিকের জন্মমুহূর্ত থেকেই।

তৎসত্ত্বেও যদি মস্কো বা কলকাতার ইস্তাহার বা প্রকাশ বাবুর বিবৃতি মতো- শ্রমিক শ্রেণীকে, যদি স্বদেশী বুর্জোয়াদের সাথেই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হয়, তবেতো তা আর কেবল আকার নয়, প্রকৃতি বা মর্মবস্তুতেও জাতীয়-ই হয়। অত:পর, অনুরূপ অনুবাদে বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া ইস্তাহারের বক্তব্য বিষয়ে সত্যি সত্যি বিবরণ তথা শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণী তথা বুর্জোয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ চিত্র বিবৃত হয়নি। আসলে নানান দেশে বসবাসকারী শ্রমিক শ্রেণীর নানান অংশকে বুর্জোয়াদের স্বদেশের গন্ডীতে আবদ্ধ ও আটকাতে না পারলে কলোনীর জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করবে কি করে? তবে, তাদের বানোয়াটি অনুবাদের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতকে " নিজেদের দেশের" মধ্যে বন্দী করতে পারলেও প্রলেতারিয়েত- "স্বদেশী" বুর্জোয়াদের বাদ রেখে বিদেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিতে সর্বাগ্রে যুদ্ধ করার কথা কারাত বাবুরা বলেন তা কিন্তু ইস্তাহারের নামে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। অথবা, দেশী নয় বলে কি, প্রলেতারিয়েত বিদেশী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না ? অবশ্য, সর্বকালেই, স্বার্থান্ধরা যুক্তি ইত্যাদির খুব একটা ধার ধারেন না।

ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " modern industry labor, modern subjection to capital, the same in England as in France, in America as in Germany, has stripped him of every trace of national character."

কলকাতার অনুবাদেও যা এই: " আধুনিক শিল্প শ্রম, পুঁজির কাছে আধুনিক ধরনের অধীনতা বা ইংলন্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা জার্মানীতে একই প্রকার, তাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত চিহ্নই লোপ পেয়েছে।" উল্লেখ্য- 'আধুনিক ধরনের অধীনতা'র বিকল্প হিসাবে- ইংলন্ড বা ফ্রান্স এমন বক্তব্য ইংরেজী ভার্ষাণে নাই , তবু অনুবাদে - 'বা' শব্দ ব্যবহার করে ' অধীনতার বিকল্প হিসাবে ইংলন্ড ভ্রান্তভাবে বিবৃত হয়েছে। এবং মস্কোর অনুবাদে এই: " আধুনিক শিল্প শ্রম, পুঁজির কাছে এখনকার বশ্যতা স্বীকার- ইংলন্ড বা ফ্রান্সে আমেরিকা অথবা জার্মানীতে সর্বত্র একই প্রকার ঘটছে, যাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লোপ পেয়েছে।"

অথচ,অনুবাদে ব্যবহৃত - 'অথবা', 'বৈশিষ্ট্যই', 'সমস্ত' ইত্যকার শব্দগুলো ইংরেজী ভার্ষাণে নাই।

যদিচ, যথার্থ অনুবাদ এই: "আধুনিক শিল্প শ্রমিক, ফ্রান্সের মতো ইংলন্ডে, জার্মানীর মতো আমেরিকায়, পুঁজির নিকট একই প্রকার আধুনিক বশ্যতায়, তার জাতীয় চরিত্রের প্রতিটি চিহ্ন অপহৃত হয়েছে।" তবে, 'চিহ্ন' এর পরিবর্তে - আলামতও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ শ্রমিকের জাতীয় চরিত্র অপহরণকারী বলেই আধুনিক শিল্প শ্রমিকের জাতীয় চরিত্র বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর -জাতি বা স্বজাতি বলে কিছু নাই।

তৎসত্ত্বেও, উপরোল্লেখিত নিবন্ধে মি: প্রকাশ কারাত লিখেছেন- " শ্রেণী সংগ্রাম প্রধানত পরিচালিত হবে রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যেই। এর অর্থ এই নয়, যে তা আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী। আজকের সাম্রাজ্যবাদ তার নীতি দিয়ে রাষ্ট্রকে গিলে নিচ্ছে, তাকে মানুষের কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। দেশের সার্বভৌমত্বের এই ক্ষতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিচ্ছে। এই ক্ষয় কেবল আর্থিক ক্ষতি নয় তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতন্ত্রকেও আঘাত হানছে। জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার অধিকারকে ব্যাহত করছে।"

দেশ ও জনগণের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার অধিকার বিষয়ে এমন আজগুবি বুলিবাগিশতা করার আগেই ঐ একই নিবন্ধে তিনি লিখেন- " এই পটভূমিকাকে মাথায় রেখেই অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শাসক শ্রেণীর ভূমিকাকে বিচার করতে হবে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ পুঁজিপতি-জমিদারবর্গ নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের পথে স্বদেশে পুঁজিবাদ বিকাশ প্রক্রিয়া জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া মুক্ত বাজারের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেছে।" অর্থাৎ বাংলা দখলে- নবাবের সহিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে যেমন মীর জাফর, উমি চাঁদ, জগৎ শেঠ প্রমুখরা বাংলা বা ভারতীয় নবাব নয়, পক্ষ নিয়েছিল কোম্পানির, ঠিক ভারত স্বাধীন হওয়ার এতো বছর পরেও ভারতীয় শাসক শ্রেণীর একটা অংশ-যারা আবার পুঁজিপতি ও জমিদার বটে এবং পক্ষভুক্ত তারা সাম্রাজ্যবাদীদের। পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার বিস্তৃতি-ব্যাপ্তী ও কার্যকরতা বুঝতে অপরাগতা নয়, বরং স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জনিত কারণেই যে, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একক কর্তৃত্বের বিশ্বে এবং ভারত- ঐ সংস্থা-সংগঠনগুলির জন্মাবদি হতেই সদস্য হওয়া সত্ত্বে ভারতীয় শাসক শ্রেণীর অপর অংশ-কারাত বাবুর দাবী মতো , যারা এখনো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ণের নিকট নতি স্বীকার না করেই কেবলই ভারতীয়

পরিচয়ে ভারতীয় স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনগণের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যকার যাবতীয় গণ অধিকার রক্ষা করতে ঐ নিবন্ধের পরের অংশে লিখেন- "বামপন্থীরা এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন; কিন্তু প্রকৃত বিকল্প কেবল আর্থিক নীতি পরিবর্তনের দ্বারা আসবে না। আর্থিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তবে একমাত্র বিষয় নয়। জনগণের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই একটা রাজনৈতিক লড়াই, তাকে ভাবাদর্শের উপাদানে গড়া হতে হবে।"

অবশ্য ভাবাদর্শের এরূপ উপাদান গড়ার জন্যই- "স্পীকার" সরকারী দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পদ-হওয়া সত্ত্বেও ২০০৪ সালে ভারতের ইউ. পি. এ সরকারের স্পীকারের পদ গ্রহণ করেছিলেন কারাত বাবুরা। যদিচ, সতীত্বহানির অজুহাতে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেনি সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বাম জোট। তবে, ধর্ষিতা না হোক, কারাত বাবুর যুক্তিতে- স্পীকার মহোদয় কারাত বাবুদের দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য ও বহিস্কৃত হয়েও মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত সেবা করেছেন বটে ইউ পি এ সরকারের -যে সরকার কারাত বাবুর ফতোয়া মতেই সাম্রাজ্যবাদের নিকট নতজানু হয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব সহ জনগণের সার্বভৌমত্ব হানি-ক্ষুন্ন কারী দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারাত বাবু আরো সাক্ষ্য দিলেন যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় বুর্জোয়াদের বানানো ভারতীয় রাষ্ট্র-টি ভারতের জনগণের জন্য কাজ করতে পারছে না কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের বাঁধার কারণে। যদি, তাই হয় তবেতো ভারত রাষ্ট-টি দুনিয়ার পুঁজিপতিদের স্বার্থে এবং ভারতীয় শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা হাসিলে তথা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ-পীড়ন ও দমনে সর্বাধিক কার্যকর হাতিয়ার বিশেষ নয়। রাষ্ট্র বিষয়ে কারাত বাবুদের অমন মহা আবিস্কারের সুবাদে খোদ লেনিনও লজ্জিত হতেন।

তবে, কারাত বাবুকে ধন্যবাদ যে, তিনি তার বানোয়াটি বক্তব্যের স্বপক্ষে কল্পিত যুক্তি হাজির করার জন্য ঐ নিবন্ধেই লিখেছেন- " ম্যানিফেস্টোতে পুঁজিবাদ সম্পর্কে আলোচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ। এবং মার্কসের ক্যাপিটাল বইতে এই আলোচনা অনেক পরিণত ও পূর্ণাংগ। পরবর্তীকালে লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম' পুস্তকটি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের পথ দেখায়।"

লক্ষ্যণীয়, কারাত বাবু ২০০২ সালেও বলছেন যে, কমিউনিস্ট ইস্তাহার সুসম্পন্ন ছিল না; এমনকি- 'পুঁজি' - ' পরিণত ও পূর্ণাংগ" হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ দেখাতে পারেনি বলেই লেনিন মহারাজ তা করেছেন। যদি তাই হয়, তবে মার্কসের নাম নেওয়ার দরকার কি, অথবা, " অসম্পূর্ণ" কমিউনিস্ট ইস্তাহার সুসম্পন্ন না করে তা মান্য করার অজুহাতে অনুবাদ বা প্রকাশ করার আবশ্যকতা থাকে কি? অথবা, সি.পি.আই (এম) কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে "অসম্পূর্ণতা" বিষয়ে নিদেনপক্ষে একটি মতামত বা বক্তব্য সংযুক্ত করা হলো না কেন? অথবা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পথ দেখাতে অন্ত:ত ' পুঁজি' গ্রন্থও যদি অক্ষম-অনুপযুক্ত হয়ে থাকে, তবে তা আর ' পরিণত ও পূর্ণাংগ" হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত হিসাবে জনাব কারাত বাবু কর্তৃক চিহ্নিত হওয়াটাই তারই বক্তব্যের স্ব-বিরোধীতার উপযুক্ত নজির নয়?

কমিউনিস্ট পার্টির অমন ক্রিয়া-কর্ম নয়, অর্থাৎ কারাত বাবুদের অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় পুঁজির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন নয়; এবং প্রকৃত পক্ষে - পুঁজি, যেহেতু শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি, সেই পুঁজিপতি ছোট কি বড় বা ব্যক্তি কি রাষ্ট্র বা সেই দেশ উন্নত কি, অনুন্নত তাতেতো শ্রমিকের মজুরি হারের যতকিঞ্চিত হের-ফের হওয়া ছাড়া শোষণ মুক্তির কোনো সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন জড়িত নাই। তাইতো - শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি সম্পর্কে - " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তক যা প্রকাশ করেছে-প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, তাতে মার্কস লিখেন- " প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমিতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই যে কোনও আকারে এবং যেকোনও অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম একটা সুসংগত রূপ ধারণ করে, সেখানেই আমাদের সংস্থার সদস্যগণ তার পুরোভাবে এসে দাঁড়াবে, এটা ত' স্বাভাবিক। যে, মাটিতে সংস্থাটি বেড়ে চলেছে সে মাটিটাই হল আধুনিক সমাজ। কোনো হত্যালীলা একে নির্মূল করতে পারবে না। একে নির্মূল করতে হলে সরকারসমূহকে উৎপাটিত করতে হবে শ্রম শক্তির উপর পুঁজির স্বেচ্ছাচারকে, যে স্বেচ্ছাচার হল তাদের পরগাছাসুলভ অস্তিত্বের শর্ত।"

অথচ, ঐ পরগাছাসুলভ সরকারের অংশীদার বা মালিক হয়ে না কি, কারাত বাবুরা পরগাছা হওয়া বৈ নিজের পায়ে দাঁড়ানো ভারতীয় বুর্জোয়াদের পুঁজি বিকাশের মাধ্যমে ভারতকে উন্নত পুঁজিবাদী তবে জনগণের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ইত্যকার গালভরা বুলিগুলো বাস্তবায়ন করবেন! কিন্তু, তারা যখন ভারত রাষ্ট্রের সরকার গঠন করবেন বা সরকারের অংশীদার হবেন বা রাজ্য সরকার পরিচালনা করবেন, তখন কি ভারতের শ্রমিক শ্রেণী নয়, কেবলই " অনুন্নত" বা দেশপ্রেমিক ভারতীয় বুর্জোয়ারা বা 'সার্বভৌম' ভারতীয় জনগণই ওনাদের সরকারের পরগাছাবৃত্তির যাবতীয় আঞ্জাম-আয়োজন করবেন, না কি-তখনো এখনকার মতোই ভারতের শ্রমিকরাই তাদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন- পরিপূরণ করবে?

দুনিয়ার বাজার জয়ের শর্তেই যে, শিল্প পুঁজির বিকাশ সম্ভব সে কথা নিশ্চিত করে "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০", পুস্তকে মার্কস লিখেন- " কারণ জাতীয় চৌহদ্দি তার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়।" অথচ, ভারতীয় 'কমিউনিস্ট' কারাত বাবু বলেছেন- বিশ্বপুঁজির বৈশ্বিক সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণের পুঁজিবাদী বিশ্বের মধ্যেই তারা লেনিনীয় " অনুন্নত" পুঁজির বিকাশ সাধন করবেন এবং তাদের শ্রেণী সংগ্রাম প্রধানত পরিচালিত হবে তাদের ভারত রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে !

তবে, একই পুস্তকে শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে মার্কস লিখেন- " শিল্প বুর্জোয়ার স্বভাবত যা করার কথা, ফ্রান্সে তা করে পেটি বুর্জোয়া; পেটি বুর্জোয়ার যা স্বাভাবিক কর্তব্য সেটা করে শ্রমিকেরা; আর শ্রমিকদের কাজ, সেটা কে করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মাত্র হয়। জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু হয় সেই মুহূর্তে, যখন বিশ্বযুদ্ধ মারফত প্রলেতারীয়তকে ঠেলে দেওয়া হয় দুনিয়ার বাজারের মাতব্বর, ইংলন্ডের পুরোভাগে। এক্ষেত্রে বিপ্লবের সমাপ্তি নয়, সাংগঠনিক শুরুটা লক্ষ্য করা যায় তা স্বল্পস্থায়ী বিপ্লব নয়।

বর্তমান পুরুষেরা হচ্ছে ইহুদিদের মতো,মুসা যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মুরুভূমির মধ্য দিয়ে। একে শুধু যে এক নতুন দুনিয়া জয় করতে হবে তাই নয়, এদের পথ ছেড়ে দিতে হবে তাদের জন্য যারা সামাল দিতে পারবে নতুন দুনিয়ার।"

কাজেই, মার্কসের এই বক্তব্য মতো ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী সংগ্রামী কারাত বাবুরা নতুন দুনিয়া জয়ী শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন বা সক্রিয় অংশ নয় , বরং বড়ো জোর তারা গণ্য হতে পারে পেটি বুর্জোয়া হিসাবে।

তবু, লেনিনবাদীদের বিভ্রান্তি ছড়ানো অনুবাদে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে দেশ-জাতির সীমা-গন্ডীতে গন্ডীবদ্ধ-আবদ্ধ ও আটক করতে ওরা ইস্তাহারের সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ অনুবাদে পরিকল্পিতভাবে বিবৃত করেছে এই: ক-ই(ম) " কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ যে, তারা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষের কোনো দেশ নাই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না।" এবং কারাত বাবুদের প্রকাশিত ক-ই(ক)- " কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও নিন্দা যে, তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার বিলোপ। শ্রমজীবী মানুষের দেশ নেই। তারা যা পায়নি, তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। "

কিন্তু ইংরেজীতে বিবৃত এই: " The Communists are further reproached with desiring to abolish countries and nationality. The workers have no country. We can not take from them what they have not got. " অর্থাৎ -" জাতীয়তা ও দেশগুলো বিলোপ করতে চায় বলে কমিউনিস্টরা আরো নিন্দিত হয়। শ্রমিকের কোন দেশ নাই। তারা যা পায়নি তা আমরা তাদের নিকট হতে কেড়ে নিতে পারি না।"

অত:পর, উল্লেখিত উদ্ধৃতি ও অনুবাদগুলো এবং ইংরেজীর প্রকৃত অনুবাদ দ্বারা এটি নিশ্চিতভাবেই নিশ্চিত হয় যে, উভয় ইস্তাহারের মধ্যে যেমন অনুবাদে গড়মিল আছে, তেমন ইংরেজীর- যথার্থ অনুবাদ নয়, এ দু'টির কোনোটিই।

মার্কসদের বক্তব্য দ্বারা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রমিকের জাতীয় চরিত্র অপহরণ করেছে পুঁজিবাদ, তাই তার জাত বা নিজস্ব জাতি বলে কিছু নাই; এবং ইস্তাহারে বলা হল- শ্রমিকের দেশ নাই। পরের বাক্যে আরো সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হলো যে, ভূমি হতে উচ্ছেদ হওয়া শ্রমিক কোনো দেশ পায়নি; তাই, তাদের দেশ থাকার প্রশ্নটি কেবল অবান্তর। তবে, পুঁজিপতিদের স্বার্থে যে সমস্ত দেশ বিদ্যমান , পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ সাধন করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী যে, এসকল দেশগুলোকে দুনিয়ার মানচিত্র হতে বিদায় করে দিবে, তা কোনো রকম সংকোচ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বিবৃত করেছেন- মার্কস-এ্যাংগেলস। কাজেই, বুর্জোয়ারা যদি - জাতীয়তা ও দেশগুলো তুলে দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে তজ্জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে গালাগাল করে, তাতে শ্রমিক শ্রেণীর দু:খ বা লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুতো নাই-ই, বরং, শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত বন্ধু হিসাবে বুর্জোয়াদের এ সংক্রান্ত অভিযোগ সানন্দে কবুল করেছেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

অথচ, ভুল অনুবাদে লেনিনবাদীরা কেউ বললো " স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব" আবার কেউ বললো- " স্বদেশ ও জাতি সত্ত্বার" বিলোপ করতে চায় নাকি কমিউনিস্টরা! কিন্তু "own nationality" or " own country" শব্দগুলো মার্কসদের লিখিত ইস্তাহারে না

থাকলেও লেনিনবাদীরা মার্কসদের মুখে তা বসিয়ে দিতে পারলেন বটে, পুঁজির সেবক-লেনিনবাদী প্রতারক বলেই ।

অবশ্য, লেনিনবাদীরা শ্রমিকের তথাকথিত "স্বজাতিত্ব " ও "স্বদেশ" কাগজে-কলমে দিতে সক্ষম হলেও বুর্জোয়ারা কিন্তু সে সুযোগ রাখেনি বলেই মার্কসরা যথার্থভাবে উপরোল্খিত বিবরণ দিয়েছেন। এতে এটি নিশ্চিত হয় যে, মার্কসদের মতে- বিশ্বের বিদ্যমান দেশগুলো যেমন থাকবে না তেমন জাতীয়তা থাকতে পারে না- শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে। সমগ্র বিশ্ব পরিণত হবে সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, সকল মানুষ পরিচিত হবে কেবলই মানবজাতির সদস্য হিসাবে। সুতরাং, জাতীয় মুক্তি হাসিলের ভুয়া কাজ বলা ভালো অমন দুস্কর্ম লেনিনবাদীরা করতে পারলেও কমিউনিস্টরা করতে পারে কি? – না ।

উল্লেখিত অংশের অনুবাদে উভয় পক্ষই - "ওয়ার্কার" এর অনুবাদে- 'শ্রমিক' বা 'মজুর' না বলে বরং " মেহনতি মানুষ" ও " শ্রমজীবী মানুষ" বলেছেন।

অথচ, যে নিজের জমিতে কৃষি কাজ করে, নিজের কুঠির শিল্পে কারিগর হিসাবে কাজ করে বা শ্রম শক্তি বিক্রি না করে নিজেই নিজের শ্রম নিজ নিজ খামার, ইত্যাদিতে দিয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই মেহনতি বা শ্রমজীবী মানুষ। অনুরূপ শ্রমজীবী মানুষের সম্পত্তি আছে বলেই তারাও পুঁজিবাদী শ্রেণীর ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশ এবং সম্পত্তিজনিত কারণেই তাদের স্বদেশ ও স্বজাতি আছে বটে। কিন্তু, যে শ্রম শক্তি বিক্রি করে সেই শ্রমিক । এবং ইস্তাহারে বিবৃত হয়েছে " মজুরের" দেশ-জাতি নাই; বরং, মজুর শ্রেণী দুনিয়া হতে দেশ-জাতির চিহ্ন মুছে দিবে। অত:পর, এটিতো সুস্পষ্ট যে, কলোনিয়াল পাওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে " নিপীড়িত জাতির মুক্তি" সাধন করতে যদি শ্রমিক শ্রেণীকে ব্যবহার করতে হয়,তবেতো কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুরূপ বিকৃত-ভুল ও ভ্রান্ত অনুবাদ না করে উপায় আছে কি লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের ?

তবে, শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সমেত বুর্জোয়া সমাজের অপরাপর শ্রেণী বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এই:

" Of all classes that stand face to face with the bourgeoisie today, the proletariat alone is a genuinely revolutionary class. The other classes decay, and finally disappear in the face of Modern Industry; the proletariat is its special and essential product.

The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all this fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay, more, they are reactionary, for they try to roll back the wheel of history."

বংগানুবাদে- " আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়ানো সকল শ্রেণীগুলোর মধ্যে একা প্রলেতারিয়েত হচ্ছে প্রকৃত এক বিপ্লবী শ্রেণী। আধুনিক শিল্পের সামনে অন্যান্য শ্রেণীগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এবং চূড়ান্তভাবে অদৃশ্য হবে; প্রলেতারিয়েত হচ্ছে ইহার বিশিষ্ট এবং আবশ্যকীয় উৎপন্ন।

নিম্ন মধ্য শ্রেণী, ছোট হস্তশিল্প মালিক, দোকানদার, কারিগর,কৃষক, এরা সকলে মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে অবলুপ্তি হতে তাদের অস্থিত্ব রক্ষায় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে। কাজেই,তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। অধিকন্ত, তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা তারা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে ।"

কিন্তু, উল্লেখিত উদ্ধৃতির মস্কো ও কলকাতার অনুবাদে খুব একটা ভুল না থাকলেও, "ও" অক্ষর যুক্ত করে মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ গুলোর " প্রতিক্রিয়াশীল" চরিত্রের প্রতি যেমন কম গুরুত্বারোপ করেছে, তেমন অনুদিত শব্দ ব্যবহার ও বাক্য বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে ভ্রান্তি জন্মানের সুযোগ আছে।

বুর্জোয়া সমাজের আবশ্যকীয় ও বিশিষ্ট উৎপন্ন শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাম্যবাদী সংগঠন অর্থাৎ কমিউনিস্টদের অশু লক্ষ্য হিসাবে ইস্তাহারেই বিবৃত এইঃ " The immediate aim of the Communists is the same as that of all other proletarian parties: Formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat."

মস্কোর অনুবাদে এইঃ " কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য অন্য সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্নঃ প্রলেতালীয়েতকে শ্রেণী রূপে গঠন করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারীয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।" এবং কলকাতার অনুবাদে- 'গঠন' এর স্থলে " গঠিত" ও একাধিক " করা" শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া বাকীটা একই রকম। কিন্তু, " বিজয়" না লিখে " conquest" , এর বাংলা " অধিকার" লিখার প্রয়োজন ছিল কি?

এ বাক্যে এটি অন্তত প্রমাণিত যে, মার্কস-এ্যাংগেলসদের ইস্তাহার রচনাকালীন যে সকল পার্টি নিজেদেরকে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে দাবী করতো, তারাও- শ্রমিক শ্রেণীকে , শ্রেণী হিসাবে গঠন ও বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়ে কাজ করা ছাড়া , লেনিন-মাও বা হোচিমিন বা কারাত বাবুদের মতো আশু করণীয় হিসাবে জাতীয় মুক্তি বা নিপীড়িত বুর্জোয়াদের মুক্তি-স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়ভাবে সমর্থন-সহযোগিতা তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ বিশেষের সেবা করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ রক্ষণ-সংরক্ষণ করার চিন্তাও করেনি।

অথবা, "মেহনতী মানুষ" হিসাবে – " কৃষক"কেও, প্রকৃতপক্ষে অবক্ষয়িত মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশকে, মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, বা পুঁজিবাদী সমাজের ঐতিহাসিক নিয়মেই পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক ভূমি হতে উচ্ছেদকৃত ব্যক্তিকে আবারো ভূমির জোয়ালে আবদ্ধ করে ভূমি দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধকরণে ভূমিহীন -ক্ষেতমজুরকে ভূমি প্রদানের মতো ভূমি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। যদিও, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলোর কর্মসূচি ও ঘোষণা সাম্যবাদ অর্জনে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ছিল না, বলেই মার্কসদেরকে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রচনা করতে হয়েছিল।

অথচ, লেনিন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করেছেন, মাও সেতুঙরাও বাদ যায়নি, আর কিউবার ফিদেলরা, চে-গুয়াভারের কর্তৃত্বে ১৯৫৯ সালে খামারের জন্য - ৩,৩৩৩ একর এবং রিয়েল ষ্টেট এর জন্য ১,০০০ একরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমার অতিরিক্ত ও বিদেশীদের জমি বাজেয়াপ্ত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে

অধিগ্রহণ করে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বন্টন করেছিল এবং ভিয়েতনামের হোচিমিনরাও একই কাজ করেছিল। সি.পি.আই (এম) নিজেও কৃষি সংস্কার নিয়ে বড়াই করে বেড়ায়। বিভিন্ন দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অজুহাতে মাওবাদীরাও ভূমিহীনদেরকে ভূমি প্রদানের কর্মসূচিকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ক্রিয়া সাব্যস্তে ভূ-মালিক জোতদারদের গলা কর্তন করছে। কিউবার বিপ্লবী সরকারের প্রতি আনুগত্য অর্জন ও বিরোধী পক্ষকে দুর্বল করার জন্য যেমন চে-গুয়াভারা দরিদ্র চাষীকে ভূমি দিয়েছিল, বাংলাদেশেও ১৯৮৪ সালে জনৈক সামরিক শাসক- তদীয় শাসনের পক্ষভুক্তকরণে- এবং কৃষি অর্থনীতিতে বিনিয়োগকৃত বিশ্ব পুঁজিপতিদের পুঁজির সুবিধার্থে ভূমিহীনদেরকে ভূমি প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। গণতন্ত্রের দাবীতে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বাংলাদেশের " মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" এবং মাও সেতুং এর চিন্তাধারার অনুসারী- কথিত কমিউনিস্টরা এখনো সামরিক শাসকের ভূমি নীতি কার্যকরণে তথাকথিত আন্দোলন করছে। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে বহু এন.জি.ও একই কর্মে ক্রিয়াশীল। অত:পর, ভূমি সংস্কার বিষয়ে এন.জি.ও. সেনা শাসক, এবং লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের কি চমৎকার মিল! অভিন্ন স্বার্থ না থাকলে এরা সকলেই ভূমি বিষয়ে অভিন্ন নীতি ও কর্ম সাধন করতে পারে কি?

যদিচ, কমিউনিজম মানে- ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অসাম্যের অবসান বলেই কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার অবসান, তার অর্থ মালিকানা বলতে শুধু শিল্প কলকারাখানারই নয়, অতি অবশ্যই উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিকানাই; এবং সেক্ষেত্রে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানাও বিলুপ্ত না করে বরং ইতোমধ্যে ভূমি হতে উৎখাত হওয়া মুক্ত শ্রমিককে ভূমিতে নতুন করে মালিক বানানো, আর যারই কাজ হোক না কেন, কমিউনিস্টদের কর্ম হতে পারে না।

উল্লেখ্য, লন্ডন, মার্চ, ১৮৫০ সালে " কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি"-তে, মার্কস ও এ্যাংগেলস লিখেন যে, " প্রথম ফরাসী বিপ্লবের মতোই পেটি বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রভুদের জমি কৃষকদের হাতে তুলে দিবে মুক্ত সম্পত্তি হিসাবে,অর্থাৎ, গ্রামীণ মজুরদের তারা জিইয়ে রেখে একটি পেটি বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইবে যারা আবর্তিত হবে ঋণ ও দারিদ্রের সেই চক্রে, যার মধ্য দিয়ে ফরাসী কৃষক আজও চলছে।

গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করা প্রয়োজন।"

অর্থাৎ ১৮৫০ সালে পেটি বুর্জোয়ারা গ্রামীণ মজুরদের পেটি বুর্জোয়া কৃষক বানাতে চেয়েছে, আর কমিউনিস্ট লীগ তার বিরোধীতা করেছে। অত:পর, ১৯১৮ বা ১৯৪৮ বা ১৯৫৩ সাল, তা যে সালেই হোক এবং লেনিন, মাও, হোচিমিন বা চে-গুয়োভারা বা কারাত বাবুরা, যারাই করুন না কেন , ভূমি সংস্কারের আবরণে গ্রামীণ মজুরদের ভূমিতে শৃংখলিত করে পেটি বুর্জোয়া বানানো মার্কসদের মূল্যায়নে পেটি বুর্জোয়াদেরই কাজ বটে।

১৮৯৪ সালে, লিখিত "ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন যে, " ছোট কৃষককে তার সম্পত্তিতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের এই চেষ্টায় তার স্বাধীনতা রক্ষা পায় না, কেবল তার দাসত্বের বিশেষ রূপটিই বজায় থাকে; শুধু জীবন্মৃত অবস্থাই চালিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার বাঁচারও উপায় নেই, মরারও উপায় নেই।"

এবং একই নিবন্ধে তিনি আরো লিখেন- " ব্যক্তিগত মালিকানার শর্তাধীন ব্যক্তিগত চাষপ্রথাই কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজের পদ্ধতি আঁকড়ে থাকতে চাইলে সে অনিবার্যভাবেই ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হবে, তাদের সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতি পুঁজিবাদী বৃহদায়ন উৎপাদনের দ্বারা স্থানচ্যুত হবে।"

এবং ১লা জুলাই, ১৮৭৪ সালে লিখিত " 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ"-এ ফে.এ্যাংগেলস লিখেন- "পুঁজিপতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনভাবে ক্ষেত-মজুরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয়ই তাতে উপকার হবে। শিল্পরত শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পুঁজিকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমাত্র তখনই ক্ষেত-মজুরেরা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই তাদের শ্রমের মূল উপায় অর্থাৎ জমি বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং চাষ হবে ক্ষেত-মজুরদের সমবায় সমিতির দ্বারা একযোগে। এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের বাসল্ কংগ্রেসে সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্তে এসে পড়ি: ভূমি মালিকানাকে সাধারণ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করাই সমাজের স্বার্থ।"

অত:পর, ভূমি বিষয়ে ১ম আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তও হচ্ছে- ভূমিকে সমাজের সাধারণ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করা। অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানা অর্জন নয়, কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার অবসান করে শিল্পের মতো ভূমিরও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পের মতোই কৃষি মজুরদের মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। এই জন্যই একই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে শিল্প শ্রমিকের মিত্র হচেছ কৃষি মজুর। এরপরও লেনিনবাদী-মাও চিন্তা পন্থী নানান ঘরানার কমিউনিস্টরা বলবেন যে, তারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল কর্মী?

তবে, তারা যাহাই বলুন না কেন, কৃষি সংস্কার ও জাতীয় মুক্তি বা নিপীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ সুরক্ষা বা ভূমিতে ভূমিহীনকে নতুন করে বন্দী করা ও রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদের শিকলে শ্রমিক শ্রেণীকে কঠিন-কঠোরভাবে আটক করার হোতা লেনিনবাদীরা ইতিহাসের চাকাকে কেবলই পেছনে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করছে বলেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মানদন্ডে ও নিরিখে লেনিনবাদীরা কেবল রক্ষণশীলই নয়, বরং চরম প্রতিক্রিয়াশীলও । আর , এই রকম প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের কারণেই সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করা সহ সেনা বিদ্রোহকে- জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার সংগ্রাম যেমন বলতে পারে তেমন অতীতের রাজা-বাদশাসমেত পরজীবীদের পক্ষ নিতে লজ্জিত হয় না, আবার নিজেদের দু:শাসনকে কায়েমি করতে বানোয়াটিমূলে সেনাবাহিনীকে শ্রমিক শ্রেণীর অংশ হিসাবে বিবৃত করে শ্রমিক শ্রেণীকে যেমন ভয়ানকভাবে শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতন করে তেমন 'শ্রমিক'- এই শব্দটির আভিধানিক অর্থকেও বিকৃত করে শ্রমিক শ্রেণীকে অপমানিত করে যাচ্ছে এবং যখন-তখন যেখানে-সেখানে সেনা শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার লজ্জাস্কর নজির স্থাপন করা সহ নানান বাহানায় বুর্জোয়াদের নানান অংশের সাথে জোট-মহাজোট গঠন করে এমনকি, রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, বা হওয়ার তৎপরতা চালায় বেহায়ার মতো। এই নির্লজ্জ -বেহায়ারাই কৃষক-শ্রমিকের প্রতিক হিসাবে কাস্তে

–হাতুড়ীকে, কমিউনিস্ট পার্টির, প্রতিক বানিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের পার্টি বিশেষকে, যখন কমিউনিস্ট বিপ্লবের পার্টি'র আবরণ পরায় তথা কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে ঘোষণা ও দাবী করে, তখন তারা কমিউনিস্ট ইস্তাহার বর্ণিত আজকের " একা শ্রমিক শ্রেণী" অকৃত্রিম বিপ্লবী , বাকীরা সকলেই রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল , এই বক্তব্যকে অমান্য, অস্বীকার ও অকার্যকর এবং ইস্তাহারকে এক গুরুত্বহীন কাগুজে বস্তুতে পরিণত করে বলেই কাস্তে–হাতুড়িওয়ালারা কমিউনিস্ট ইস্তাহার মুলেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করছে । তাই তারা কেবল চরম প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, বরং কার্যত ও বস্তুত শ্রমিক শ্রেণীর ভয়ংকর দুশমন।

'শ্রমিক', পূর্বেও ছিল কিন্তু আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রোডাক্ট– 'প্রলেতারিয়েত' পুঁজিবাদী সমাজের পূর্বে ছিল না। প্রলেতারিয়েত দরিদ্র বটে তাই বলে দরিদ্র মানেই প্রলেতারিয়েত নয়। এরূপ সিদ্ধান্ত সহ প্রলেতারিয়েত বলতে কি বুঝায় তা সূত্রায়ন করাসহ কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রচনার খষড়া হিসাবে ১৮৪৭ সালে "প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম" রচনা করেছিলেন এ্যাংগেলস। তাতে তিনি লিখেছেন-

"What is the proletariat?

The proletariat is that class in society which lives entirely from the sale of its labor and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe, whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labor – hence, on the changing state of business, on the vagaries of unbridled competition. The proletariat, or the class of proletarians, is, in a word, the working class of the 19th century." And-

"What will be the attitude of communism to existing nationalities?

The nationalities of the peoples associating themselves in accordance with the principle of community will be compelled to mingle with each other as a result of this association and thereby to dissolve themselves, just as the various estate and class distinctions must disappear through the abolition of their basis, private property."

অত:পর, অত্র নীতিমালায়ও বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী, কৃষক বা মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ বিশেষ , প্রলেতারিয়েত নয়; এবং কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্র ও শ্রেণী বিলুপ্ত হবে বলে জাতীয়তাও লুপ্ত হবে। সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টি , কৃষক বা মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশের পার্টি নয়, এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মুক্তি অর্জনে –ব্যক্তিমালিকানা,

শ্রেণী ও রাষ্ট্র বিলীন-বিলোপ করাই কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় ও কর্তব্য বলেই ভূমিহীনকে নতুন ভাবে ভূমি মালিক বানানো তথা ব্যক্তিমালিকানার সংরক্ষণ করা যেমন কমিউনিস্ট নীতি নয়, তেমন বিদ্যমান জাতীয়তা বিলুপ্ত করা বৈ জাতীয় মুক্তি অর্জন বা তদার্থে কর্মসূচি গ্রহণ কমিউনিজমের নীতিমালা অস্বীকার করার নামান্তর।

বিজ্ঞানীদের দেয় তথ্য মতে, মানুষের বয়স ২ লাখ বছরের কম নয়। কিন্তু, মানবজাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাজন সৃষ্টি হওয়ার বয়সও সাড়ে ৫ হাজার বছরের বেশী নয়। অথচ, এর মধ্যেই দুটি সমাজ তথা দাস ও সামন্ত সমাজ বিলীন হয়ে ১৩০০ সালে সূচিত হয়ে পুঁজিবাদী সমাজ এখনো বহাল আছে। তবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আদিতে শ্রেণী ছিল না, সাম্য বিলীন হয়ে বিভাজন এলো, কিন্তু বিভাজিত সমাজও স্থায়ী হয় না: পরিবর্তিত-রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর খোঁজার চেষ্টা অনেকের। মার্কসরাও খুঁজেছেন। আবার এই রূপান্তরের কারিগর মানুষ নিজেই। তাই, বলে মানুষ চাইলেই স্বীয় পরিকল্পনামতো সমাজের রূপান্তর সাধন বা তা ঠেকাতে পারে কি ? ' লুই বোনাপাটের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে মার্কস লিখেছেন-" স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতির মধ্যে। "

লন্ডন, ৫ মার্চ,১৮৫২, " ইয়ো. ভেইদেমেয়ার সমীপে মার্কস", প্রকাশিত পত্রে মার্কস লিখেন- " আমি নতুন যা করেছি তা হচ্ছে এইটে প্রমাণ করা যে, ১) উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সংগেই শুধু শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব জড়িত; ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে পৌঁছয়; ৩) এই একনায়কত্বটাও হল সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি ও একটি শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণ মাত্র.." ।

আর, ১৮৭৭ সালে লিখিত ও ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত " কার্ল মার্কস", নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেন- " মার্কস যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছেন তার মাত্র দুটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

প্রথম হল বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় তিনি যে বিপ্লব এনেছেন সেটি। আগে ইতিহাসের উপর সমগ্র দৃষ্টিভংগিরই ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার মধ্যেই সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মুল কারণ খুঁজতে হবে, এবং সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন, সমগ্র ইতিহাসের উপর তারই প্রাধান্য। কিন্তু, মানুষের মনে ধারণা আসে কোথা থেকে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালক হেতু যে কী সে প্রশ্ন তোলা হয়নি। শুধুমাত্র ফরাসী আর আংশিকভাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকের নতুন গোষ্ঠীই এ প্রত্যয়ে বাধ্য হয়েছিল যে, অন্ত ত:পক্ষে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের ইতিহাসের চালিকাশক্তি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের সাথে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম। এখন মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিগত ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক

শ্রেণীগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনের প্রশ্ন, পুরোনো শ্রেণীগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণীগুলির ক্ষমতা জয়ের প্রশ্ন। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির সৃষ্টি এবং ক্রমাগত অস্তিত্বের হেতু কি? কোনো বিশেষ যুগে যে নির্দিষ্ট বৈষয়িক এবং বস্তুগতভাবে বোধগম্য অবস্থার মধ্যে সমাজের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বিনিময় করা হয়, সেইটাই তার হেতু। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক গোষ্ঠীগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি, এরা তাদের প্রয়োজনের প্রায় সবটাই নিজেরাই উৎপন্ন করত, প্রায় কোনোরকম বিনিময় ব্যবস্থাই তাদের ছিল না আর অস্ত্রধারী অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে এরা পেত বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষণ এবং জাতীয়, অথবা অন্তত:পক্ষে রাজনৈতিক সংহতি। যখন শহর গড়ে উঠল এবং তার সংগে সংগে গড়ে উঠল স্বতন্ত্র হস্ত শিল্প আর প্রথমে আভ্যান্তরীণ ও পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, তখন শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের জায়গা করে নিল। কিন্তু ইউরোপের বাইরের জগৎ আবিস্কারের সংগে সংগে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই বুর্জোয়া শ্রেণীর বাণিজ্যিক এলাকা অনেকখানি বেড়ে গেল আর সেই সাথে তাদের শিল্প বিকাশে এল নতুন প্রেরণা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব শাখায় হস্তশিল্পের জায়গায় এবার এল কারখানা ধরনের শিল্প এবং তারও জায়গা নিল বৃহদায়তন শিল্প, গত শতাব্দীর বিভিন্ন আবিস্কারের ফলে, বিশেষত বাস্পচালিত ইঞ্জিন আবিস্কারের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠল। আবার বৃহদায়তন শিল্পেরও প্রভাব পড়ল বাণিজ্যের ওপর: অনুন্নত দেশগুলি থেকে পুরানো কায়িক পরিশ্রম বিতাড়িত করল তা আর অধিকতর বিকশিত দেশগুলিতে গড়ে তুলল আজকের দিনের নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা: বাস্পচালিত ইঞ্জিন,রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। এইভাবে, যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অভিজাত শ্রেণীর আর তাদের সমর্থিত রাজতন্ত্রের হাতে তা থেকে আরো বহুদিন বঞ্চিত হয়ে থাকলেও, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বেশি করে সামাজিক সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতা নিজের হাতে জমাতে থাকল। কিন্তু বিশেষ এক পর্যায়ে- ফ্রান্সে, মহান বিপ্লবের পরে- বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নিল, আর এবার তারাই প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর শাসক শ্রেণী হয়ে বসল। সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে জ্ঞান অবশ্য আমাদের পেশাদার ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তা যথেষ্ট থাকলে এই দৃষ্টিভংগি থেকে সব ঐতিহাসিক ঘটনাই সবচেয়ে সহজ উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং এইভাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বের ধ্যান-ধারণা খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে এবং তদ্বারা নির্ধারিত সেই পর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে। এই প্রথম ইতিহাস তার সত্যিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্যের জন্য লড়বার আগে, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের সর্বাগ্রে চাই খাদ্য পানীয়, চাই আশ্রয় ও পরিচ্ছদ, সুতরাং তাকে কাজ করতে হবে, এই যে জলজ্যান্ত সত্যটি এতদিন উপেক্ষা করা হয়েছে, এই সত্য অবশেষে তার ঐতিহাসিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগির পক্ষে ইতিহাসের এই নতুন বোধের তাৎপর্য খুবই বেশী। এতে দেখিয়ে দিল যে, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণী, শোষক ও শোষিত শ্রেণী থেকেছে আর

বরাবরই মানবসমাজের বিপুল অধিকাংশই দন্ডিত থেকেছে হাড়ভাংগা মেহনত ও নগন্য উপভোগের নির্বন্ধে। এর কারণ কি? কারণ নিতান্তই এই যে, মানবজাতির বিকাশের আগেকার সব স্তরে উৎপাদন এতই অনুন্নত ছিল যে, একমাত্র এই বিরোধব্যঞ্জক রূপেই ঐতিহাসিক বিকাশ চলতে পারত, আর সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক প্রগতির ভার থাকত এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর ক্রিয়াকলাপের ওপর আর বিপুল জনগণের নির্বন্ধ ছিল স্বীয় মেহনতে নিজেদের দীনহীন জীবনোপকরণের সংগে সংগে সুবিধাভোগীদের ক্রমসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করা। পূর্বতন যেসব শ্রেণী-শাসনের ব্যাখ্যা অন্যথায় কেবল মানুষের অসাধুতা দিয়েই করতে হয় এইভাবে তার স্বাভাবিক ও যুক্তসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া ছাড়াও ইতিহাসের এই অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এ যুগের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠছে যে, অন্তত:পক্ষে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে, মানবসমাজকে শাসক ও শাসিত হিসাবে, শোষক ও শোষিত হিসাবে বিভক্ত করে রাখার শেষ অজুহাতটিও আর থাকে না, স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পূরণ করেছে, সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্য সংকট, বিশেষত গত বিরাট বিপর্যয়* এবং স্বদেশে শিল্পের মন্দা সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে,ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রলেতারিয়েতের হাতে, সমাজে এ শ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থার দরুন এ শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে কেবল সব শ্রেণী-শাসন, সব দাসত্ব ও সব শোষণ পুরোপুরি শেষ করে দিয়ে, এবং সামাজিক উৎপাদন শক্তিসমূহ বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ছাপিয়ে উঠে এখন শুধু সমিতিবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের দখলে যাবার জন্যই অপেক্ষা করে আছে এই উদ্দেশ্যে যাতে এমন পরিস্থিতি ঘটানো যাবে যেখানে সমাজের প্রতি সদস্য শুধু সামাজিক সম্পদ উৎপাদনের কাজেই নয়, সে সম্পদ বন্টন ও পরিচালনার কাজেও অংশ নিতে পারবে। তাতে করে পুরো উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিকল্পিত পরিচালনার ফলে সামাজিক উৎপাদন-শক্তিগুলি ও তার উৎপাদন এত বেড়ে যাবে যে, প্রত্যেকের জন্যই যুক্তিসংগত প্রয়োজন মেটবার নিশ্চিতি থাকবে। ”

এই সূত্রায়নে এটি পরিস্কার যে, উৎপাদন উপকরণের অগ্রগতির সহিত সাবেকী সমাজের বিরোধ ও বৈরীতা হেতু শ্রেণী বিভক্ত সমাজ স্থায়ী নয়, পুঁজিবাদী সমাজও অস্থায়ী। অথচ, সকল শোষক-শাসক শ্রেণীর মতোই বুর্জোয়া শ্রেণীও এখনো পর্যন্ত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেকে চিরন্তন ও স্থায়ী রাখতে। যদিচ, মানুষ চাইলেই যেমন নিজের পরিকল্পনামতো সমাজ পাল্টাতে পারে না, তেমন তা অটুট ও অক্ষুন্নও রাখতে পারে না। সমাজের বস্তুগত উপাদান ও সমাজের উৎপাদনী উপকরণই সমাজকে গতিশীল-পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরিত করার মূল, কিন্তু বিষয়টি সম্পাদিত হয় সমাজের আলোচ্য উপকরণাদির সহিত সম্পর্কিত ও ক্রিয়াশীল মানুষের মাধ্যমেই। তাই, উপকরণের মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ মালিকানার ধরন অনুযায়ী এ্যাক্ট-রিএ্যাক্ট করে। সামন্ততন্ত্রকে বিলীন ও বিনাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে বটে বুর্জোয়া শ্রেণী; কিন্তু বিজয়ী বুর্জোয়া শ্রেণী তার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় পৌঁছামাত্র ইতিহাসের মানদন্ডে এবার বিদায় হবার পালা, আর বিদায় করার দায়-দায়িত্ব বটে বুর্জোয়াদেরই সৃষ্ট প্রলেতারিয়েতের। কিন্তু, যতোই এটি সামাজিক নিয়ম হোক না কেন, শ্রেণী বিভক্ত সকল

সমাজে শোষক-শাসক শ্রেণী স্বার্থপর ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের শাসন-কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সমরূপ চরিত্রের অধিকারী।

কমিউনিস্ট ইস্তাহারে এই সূত্রটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে,ইংরেজীতে এইঃ " The selfish misconception that induces you to transform into eternal laws of nature and of reason the social forms stringing from your present mode of production and form of property- historical relations that rise and disappear in the progress of production- this misconception you share with every rulling class that has preceded you. What you see clearly in the case of ancient property, what you admit in the case of feudal property, you are of course forbidden to admit in the case of your own bourgeois form of property."

মস্কোর অনুবাদে এইঃ " আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি ও মালিকানার রূপ থেকে যে সামাজিক রূপগুলি মাথা তোলে, ঐতিহাসিক এই যে সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সংগে সংগে উদয় ও লয় পায়, একটা স্বার্থপর ভুল ধারণার ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান- আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছিল তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন মালিকানার ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে পরিস্কার, সামন্ত মালিকানার বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের মালিকানার ক্ষেত্রে সে কথা আপনাদের স্বীকার করা বারণ।"

ইংরেজীতে বিষয়টি যত সুন্দর ও সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে সেরকমটা যে বাংলা অনুবাদে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। ডাল মে কুছ কালা হলে, এমনটাই হয়। না হয়, ' আপনাদের পূর্বেকার প্রত্যেক শাসক শ্রেণীর ভ্রান্ত ধারণার আপনারা অংশীদার '; লিখলে, বিষয়টা যেমন যা বলা হয়েছে তেমনটা অর্থাৎ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বুঝা যেত। আবার, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থপর ভ্রান্ত ধারণা পূর্বেকার শাসক শ্রেণীর ছিল বলে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পূর্বেকার শাসক শ্রেণীর পুরোহীত বানানোটা ইতিহাসের বরখেলাফ নয় কি? অথচ, মার্কসরা যথার্থভাবেই চিহ্নিত করেছেন যে, বুর্জোয়া যতই আধুনিক হোক না কেন, শোষক বলেই, তারাও শোষণের সত্ত্ব অটুট-অক্ষুন্ন রাখতে তাদেরই পূর্বসুরিদের উপযুক্ত উত্তরসুরিই বটে।

জটিলতা বা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট বটে মস্কো, কিন্তু কলকাতার অনুবাদকরা তথা কারাত বাবুরাতো বারিত বটে অন্তত:পক্ষে মস্কোর মতো অনুবাদেও। নচেৎ পুঁজিওয়ালাদের কল-কারখানা হবে কি করে পশ্চিমবংগে? ইতিহাসের নিয়মে, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সত্য বটে পুঁজিপতি শ্রেণী অদৃশ্য-বিলুপ্ত হবে, কিন্তু তা যদি স্বীকার করে পুঁজিপতি শ্রেণী তবেতো তা হবে- স্বয়ংখুনের শামিল, অথবা, বুর্জোয়ারা শোষণ,পীড়ন ও শাসন করবে কি ভাবে? তাইতো, উন্নয়ন ও শিল্প প্রেমিক কার্যত পুঁজি প্রেমিক

সি.পি.আই (এম) ঘোরতরভাবে বারিত বটে সমাজ পরিবর্তনের অমন রূপান্তরের ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অমন স্বার্থপরতাজনিত ভ্রান্ত ধারণা বিষয়ে মার্কসদের বক্তব্য তাদের অনুদিত ইস্তাহারে উল্লেখ করতে।

কাজেই, সি.পি.আই (এম) এর অনুদিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ৪২-৪৩ পৃষ্টায় উল্লেখিত প্যারাটি স্থান পেলেও তাতে – "What you see clearly in the case of ancient property, what you admit in the case of fedual property, you are of course forbidden to admit in the case of your own bourgeois form of property."এই বাক্যটির অনুবাদ নাই বা তা উল্লেখিত নয়, অর্থাৎ এই বাক্যটিকে তারা একদম হাফিস বা গুম করে দিয়েছে। কারাত বাবুদের সি.পি.আই (এম) বড় দলতো, তাই মার্কস-এ্যাংগেলস কবে কখন কি লিখলো বা না লিখলো, তা-অতো গুরুত্ব দিতে হবে কেন। মার্কসরাতো আর সরকার চালায়নি, তাই তাদের অনেক ভার-চাপ সইতে হয়নি। কিন্তু, সি.পি.আই(এম) তো ৩টি রাজ্য সরকারে ছিল, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কখনো পরোক্ষ অংশীদার বা কখনো কখনো সরকার ফেলা-গড়ার কারিগর, এমনকি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাওয়াই যুদ্ধের নায়ক, এমন আরো কত কত দায়-দায়িত্ব নেপাল ইত্যাদি সহ নানান দেশে পালন করতে হয় কারাত বাবুদের। বুর্জোয়াদের স্বার্থে দুনিয়ার এতো ধরনের দায়-দায়িত্ব পালন করবে আবার বুর্জোয়াদের মরণ সূত্র, ধারণ-বহন করবে তা কি সম্ভব?

অত:পর, উল্লেখিত বাক্য গোপন করায় সি.পি.আই(এম) ও তার ভক্ত-অনুরাগী ও অনুসারীগণ তাদের অনুদিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার পাঠ করে আদৌ সমাজ বিকাশের নিয়ম-সূত্র এবং শোষকদের অস্তিত্বের ভুয়া চিরন্তনতা বিষয়ে অর্থাৎ মার্কসের মুল দুটি আবিস্কারের মধ্যে একটি সম্পর্কে -সম্যক জানতে বা অবহিত হতে পারবেন কি?

যদি, তা হতে না পারেন বা শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ম-সূত্র বুঝতে ও উপলব্ধি করতে না পারেন, তবেতো ভারতে বিপ্লব সংঘটনে শ্রীকৃষ্ণের মতোই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন, না হয় মাও চিন্তার নামে- গলাকাটা, বোমা মেরে ট্রেনের সাধারণ যাত্রী হত্যা করার মতো দুস্কর্ম করতে থাকবেন। তবে, এসবের জন্য দায়-দোষী কেবল বোমাবাজ বা সমাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী নিরীহ কর্মীরাই?

সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নেওয়া বিশ্ব বিজয়ী পুঁজিবাদ তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে যে সকল উৎপাদনী উপকরণ সৃষ্টি করেছে সেই সকল উপকরণাদির বিরোধ-বৈরীতা ও বিদ্রোহে নিপতিত হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী একসময়ে নিজেরই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় উপনীত হয়ে নিজেই নিজের মালিকানা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে মালিকানার বিনাশ ও বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুঁজিবাদের স্থলে সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপনের শর্তাদি পুরণ করার বিষয়ে মস্কো হতে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " আমরা তা হলে দেখলাম: উৎপাদন ও বিনিময়ের যে সব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছিল, সেগুলির উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে ।

উৎপাদন ও বিনিময়ের এই সব উপায়ের বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায় এল যখন সামন্ত সমাজের উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত,কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন শক্তির সংগে খাপ খেল না । উৎপাদন বিকাশের পরিবর্তে এগুলি উৎপাদনে বাধা হল। এগুলি তখন শৃংখল হল।

তাদের জায়গায় এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সংগে তারই উপযোগি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর এক ধারা চলছে। নিজের উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক ও মালিকানা সম্পর্ক সহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ ভোজবাজির সাহায্যে উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন বিশাল উপকরণ গড়ে তুলেছে, তার অবস্থা যেন সেই যাদুকরের মতো যে জাদুমন্ত্রে পাতালপুরির শক্তিসমুহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরে শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক হালচালের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের জন্য যে মালিকানা–সম্পর্ক প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকটে শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এই সব সংকটের ফলে এক মহামারি হাজির হয়, আগেকার সমস্ত যুগে যা অসম্ভব গণ্য করা হত– এই মহামারী অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ সরবরাহের পথ; শিল্প , বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; এবং কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণের সামগ্রীর দেখা দিয়েছে অতি প্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানা বিকাশের জন্য তা আর সাহায্য করছে না; বরং যে অবস্থার মধ্যে এই শক্তি শৃংখলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশী প্রবল; শৃংখলের বাধা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এই শক্তি এনে ফেলে বিশৃংখলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানা অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে, উৎপাদন শক্তির বিপুল অংশ নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়ে, অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের উপর আরো ব্যাপক শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ বলা যায় যে, আরো ব্যাপক ও আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে। ”

ইংরেজী ভার্ষাণের হুবুহ অনুবাদ না হলেও উদ্ধৃতাংশে গুরুতর গলদ না থাকায় যেমন ইংরেজী অংশ তেমন কলকাতার অনুবাদেও কিছুটা রকমফের থাকলেও মোটামুটি একই ধরণের বলে ঐ দুটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

তবে, মার্কসদের এই বক্তব্য ইতিহাস সত্য প্রমাণ করেছে। যদিও এর প্রমাণমূল্য অনেক অনেক বেশি। বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় সৃষ্ট সংকট হতে রেহাই পেতে নানান ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে -উৎপাদন সীমিতকরণ, যা-পুঁজির অস্তিত্বের শর্তের বিরোধী তবু ঐ রকম স্বয়ংঘাতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহ তদার্থে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-সংঘর্ষ বা হত্যা-খুন বা রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ইত্যকার ক্রিয়াদি সহ কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি-সিন্ডিকেট, ট্রাষ্ট ইত্যাদি গঠন করেও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজির সংকট হতে নিস্তার না পেয়ে শেষতক রাষ্ট্রের নিকট সরাসরি আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রীয়খাতের মাধ্যমে পুঁজিকে সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়েও পুঁজির সংকট এড়াতে না পেরে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে মরিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী ৭-৮ কোটি মানুষ খুন করে, অসংখ্য শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করে দুনিয়ার সকল পুঁজিওয়ালা ও পুঁজিবাদের স্বার্থে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিকে সামগ্রীকভাবে ও কেন্দ্রীভূতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ-এর মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় বিশ্ব ব্যাংক ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং তাই হয়েছে। অর্থাৎ যতই এককেন্দ্রীক নিয়ন্ত্রণ করা হোক না কেন, পুঁজিবাদী সমাজের হাতে যে পরিমাণ উৎপাদন শক্তি আছে, তাতে অতিরিক্ত উৎপাদন হবেই, এবং তাই হয়েছে। ফলে, ২০০৮ সাল হতে চলছে ভয়ানক মন্দা।

২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতামূলক নীতি তথা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ও উপনিবেশ হতে জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ১ম বিশ্বযুদ্ধ যেমন সংঘটিত হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই, ইউরোপীয় শ্রমিকরা ২য় আন্তর্জাতিকের গ্যাড়াকলে পড়ে বিবদমান বুর্জোয়াদের পক্ষ-বিপক্ষে ভাগ-বিভাগ হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের স্বার্থে এমনকি যুদ্ধও করেছে। প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণা ও ১ম বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক লাইনের কার্যকরতার স্ববিরোধীতায় খুবই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক কারণে ২য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত হলেও, লেনিনরা মূলত পুঁজিবাদের পক্ষে রাশিয়ায়- সেনাসহযোগিতায় ক্ষমতা দখল করে জার্মান সংকটাপন্ন পুঁজির সেবা করেও দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার দাবীদার হয়ে কার্যত রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু, তাতেও পুঁজির সংকট কাটেনি, বরং সংকটোত্তরণে ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-এখতিয়ার, ক্ষেত্র বিশেষ হরণ-ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেও মার্কসদের বর্ণিত সংকট দশা হতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে রক্ষা করতে পারেনি বলেই ২০০৮ সাল হতে খোদ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা সহ ইউরোপের বহু দেশের বহু পুঁজিপতি হয় দেউলিয়া হয়েছে, নয়তো বিপুল পরিমাণ পুঁজি হারিয়েছে। উক্ত সংকটের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিণতি-ইন্দন বা ক্ষেত্র বিশেষ মন্দাক্রান্ত দের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ইত্যকার কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত-বিক্ষুব্ধ মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলন-যুদ্ধে নামছে মিশর, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া ইত্যকার দেশগুলিতে। অর্থাৎ , উৎপাদিত উপকরণ ধ্বংস করতেই হবে, হ্রাস করতে হবে উৎপাদন, তবেই আরো সমস্যার জন্ম দিয়ে হয়তো আপাত রেহাই পাওয়ার আবারো চেষ্টা করবে- পুঁজিপতি শ্রেণী।

অথচ, ২য় আন্তর্জাতিক ও লেনিন এবং লেনিননবাদীদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিরোধী রাজনীতির ঘেরাটোপ হতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এখনো বের হতে পারেনি বলেই পেটি বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক সংস্কার ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে দেশপ্রেমের মায়াজালে আটক রেখে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করছে, এবং যথারীতি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করার পরই যেমনটা ফ্রান্স বিপ্লব বা বিপ্লব পরবর্তী সরকারগুলি শ্রমিক শ্রেণীর সাথে করেছিল সেই রূপ বিশ্বাসঘাতকতা মিশর,তিউনিশিয়ায়ও করছে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে । আবার, গ্রীস-ইটালী বা ফ্রান্সের শ্রমিকরা বিশাল বিশাল মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদি সংঘটিত করলেও মন্দার জন্য দায়-দোষী বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে দায়ী না করে বা তদার্থে অভিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ, যারা বৈশ্বিকভাবে পুঁজির সংকট ত্রাণে ক্রিয়াশীল এবং সেভাবে নানা রকম বিধি-ব্যবস্থা করছে অহরহ, এবং তাদের দাওয়াই মানতে বাধ্য বটে সদস্য রাষ্ট্রগুলি, সেই বিশ্ব ব্যাংক বা তাদের সহযোগি সংস্থাকে নয়, বরং নিজ নিজ সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলিকেই কেবলমাত্র দায়-দোষী গণ্য করছে । তবু লেনিননবাদী আছরের কারণে কি, গ্রীস বা ফ্রান্স বা ইটালির শ্রমিকরা-শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম ও প্রাথমিক শর্ত - " দুনিয়ার মজুর এক হও" এই সূত্র কার্যকর করতে চিন্তাও করতে পারছে না বলেই ইউরোপের দেশগুলির সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন , এমনকি দেশের সীমানা-গন্ডি অতিক্রম করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্তরেও উন্নীত হতে পারে নি। অর্থাৎ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সংকটকে বৈশ্বিকভাবে মোকাবেলা করার বা পুঁজিবাদ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা বলেই সংকটটিও কার্যত বৈশ্বিক, যতোই তা দেখা দিক , আমেরিকা, কি ইটালী বা গ্রীস বা স্পেনে; তাই এমন বৈশ্বিক বিষয়কে বৈশ্বিকভাবেই মোকাবেলা করা আবশ্যক; অর্থাৎ সংকটের চরিত্রই বৈশ্বিক বলেই প্রতিকার-প্রতিবিধানও হবে বৈশ্বিক চরিত্রের , অথবা বিশ্ব পুঁজিবাদের এমন সংকটই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশু-প্রত্যক্ষ ও উপযুক্ত অবস্থা তৈরী করে মর্মে কমিউনিস্ট ইস্তাহার বর্ণিত তত্ত্বগত বিষয়টি এখনো চিন্তায়ও ঠাঁই পায়নি বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর, যাদের একটি দুনিয়া ছাড়া আর কোন দেশ বা জাতি নাই।

অথচ, জাতীয় মুক্তি, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, উপনিবেশ হতে স্বাধীনতা, বা একদেশ ভিত্তিক সমাজতন্ত্র,ও একদেশেই সমাজতন্ত্র সম্ভব, ইত্যকার লেনিননীয় প্রতারণা-চালাকি ও চাতুরালী হতে যদি মুক্ত হতে পারতো দুনিয়ার না হোক অন্তত:পক্ষে, ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর অংশ বিশেষও ,তা-হলেও ২০০৮ সাল হতে চলে আসা মন্দায় পুঁজিবাদ বিরোধী বৈশ্বিক আন্দোলন কিছুটা মাত্রায় হলেও শুরু হতে পারতো।

কিন্তু, যেহেতু এখনো তেমন লক্ষণ নাই, সেহেতু মুমূর্ষ পুঁজিবাদ আরো অধিকতর আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিবে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তবে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকামী ঐকান্তিক সমাজতন্ত্রীগণ- যতো দ্রুত লেনিনবাদী জোয়াল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অন্তত অগ্রগামি অংশ যতো দ্রুত নিজেদের প্রকৃত দুরাবস্থা ও তজ্জন্য দায়-দোষী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্ববিরোধীতা-বৈরীতা, সংকট-মহাসংকট ইত্যকার অবস্থা উপলব্ধি করে অমন দু:সহ ও দৈন্যদশা হতে মুক্তি বা পরিত্রাণে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থবোধের চৈতন্যে সমৃদ্ধ তথা স্থানীয় বা

জাতিগত নয়, বৈশ্বিক দৃষ্টি ভংগি গ্রহণ ও কার্যকরণে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত নীতিগুচ্ছ তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সূত্র সমূহ বাস্তবায়নে ভন্ড লেনিন-মাও বা চে-ফিদেল ইত্যকার লেনিনবাদী কমিউনিস্ট ভূতদের কবল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে , ততো দ্রুতই মরণাপন্ন পুঁজিবাদকে কবরস্ত করা সম্ভব হবে।

মস্কোর লেনিনবাদীরা বা কারাত বাবুরা যেমন দাবী করেছিলেন যে, মার্কসরা ১৮৫০এর পর হতে উপনিবেশিকতার ক্ষতিকরতা ও জাতীয় মুক্তির বিষয়টি অনুধাবন ও চিন্তা করতে শুরু করেন এবং ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ সমেত জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের প্রতি, সহানুভূতিশীল, আশাবাদী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন, ঠিক যদি তেমনটাই হতো তবে পুঁজিবাদ বিনাশে ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধতায় পৌঁছানো পুঁজিপতি শ্রেণীর মরণদশা সম্পর্কিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উপরোদ্ধৃত বিবরণ নিশ্চয়ই সংশোধন করতেন। কিন্তু, তা না করে, বরং তাদের এই রূপ মতামতই এ্যাংগেলস যে, ১৮৭৭ সালেও " কার্ল মার্কস" নিবন্ধে লিখেছেন, তা যেমন আমরা দেখেছি, তেমন মার্কসও তার ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত পুঁজি, ১ম খন্ড, ২য় অংশ, "অষ্টম ভাগ।-তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন, অধ্যায় ৩১।-শিল্প পুঁজির উৎপত্তি" , ৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- " উপনিবেশগুলি উঠতি-শিল্পসমূহের জন্য বাজারের যোগান দিত এবং একচেটিয়া বাজার মারফৎ পুঁজির সঞ্চয়ন বাড়িয়ে তুলত। নগ্ন লুণ্ঠন, দাসত্ববন্ধনারোপ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বাইরে যে সম্পদ আহরিত হত, তা স্বদেশে প্রেরিত হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত। পূর্ণ বিকশিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রথম স্রষ্টা হল্যান্ড ১৬৪৮ সালেই তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল।"

অর্থাৎ ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের ২০৯ বছর আগেই হল্যান্ড ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে বাণিজ্যের শিখরে উঠেছিল। এবং একই পুস্তকের একই অধ্যায়, ৩১০ পাতায় মার্কস লিখেন- " আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের আবিস্কার, আদিবাসী জনসমষ্টির মুলোৎপাটন, তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা ও খনিগুলিতে তাদের কবরস্ত করা, ইস্ট ইন্ডিয়া বিজয় ও লুণ্ঠনের প্রারম্ভ, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 'কালা আদমী' জোগাড়ের জন্য আফ্রিকাকে পণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করা, এই গুলি ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের গোলাপ-রাঙা উষাগমের সংকেত।" এবং

" ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" গ্রন্থেও মার্কস শিল্প পুঁজি সম্পর্কে লিখেছিলেন যে-" জাতীয় চৌহদ্দি তার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

কাজেই, মার্কসের সাক্ষ্যমতে শিল্প পুঁজি বিকাশের শর্ত-উপনিবেশিকতা।

আর, " কার্ল মার্কস" নিবন্ধে এাংগেলস জানিয়েছেন যে, "জার্মান পত্রিকায় মার্কস বোনাপার্টপন্থা ও সেযুগের প্রুশীয় নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান । তখন বোনাপার্টপন্থীরা উদারনৈতিকতার ভান করত আর নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিদাতা হিসাবে নিজেদের জাহির করত।"

কিন্তু, ১৮৭৭ সালেও এ্যাংগেলসরা বলেননি যে, তারা জাতিগুলির মুক্তিদাতা সিপাহীদের বিদ্রোহ বা শ্রমিকশ্রেণীকে বা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে জাতীয় মুক্তির কর্মটি সম্পন্ন করতে হবে, অন্তত উপনিবেশে-যা লেনিন বলেছেন ।

তবে, পুঁজি, ১ম খন্ড,২য় অংশ, "অধ্যায় ৩২।- পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবণতা", ৩২৫ পৃষ্ঠায় মার্কস লিখেন- " বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে তা নিজের বিলোপ সাধনের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপাদানসমুহের উদ্ভব ঘটায়। সেই মুহূর্ত থেকে সমাজের বুকে জেগে উঠে নতুন নতুন শক্তি আর নতুন নতুন কামনা; কিন্তু পুরনো সমাজ-ব্যবস্থা তাদের নিগড়ে বেঁধে রাখে এবং অবদমিত করে। একে নির্মূল করতেই হবে; আর তা নির্মুল হয়েই যায়। এর বিনাশ, স্বতন্ত্রভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত উপায়ে রূপান্তর, বহু সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির অল্পসংখ্যক মানুষের বৃহৎ সম্পত্তিতে রূপান্তর, জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে জমি থেকে, জীবিকার উপায় থেকে এবং শ্রমের উপায় থেকে দখলচ্যুত করা, জনসাধারণের এই ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক দখলচ্যুতি হল পুঁজির ইতিহাসের উপক্রমণিকা। তা গঠিত হয় একদিকে বলভিত্তিক পদ্ধতির ক্রমিক সমন্বয়ে, যার মধ্যে আমরা পর্যালোচনা করছি শুধু সেইগুলিই, যেগুলি পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতি হিসাবে যুগান্তকারী ছিল। প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের দখলচ্যুতি সাধিত হয়েছিল নিষ্ঠুর বর্বরতার সংগে, আর এর পিছনে ছিল সবচেয়ে কলঙ্কপূর্ণ,সবচেয়ে নোংরা, নীচতম ও জঘন্যতম বাসনার তাড়না। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ভিত্তি, বলা যেতে পারে, বিক্ষিপ্ত, স্বাধীন খেটে-খাওয়া ব্যক্তি মানুষ ও তার শ্রমের অবস্থার একত্রমিশ্রণ। তার স্থান দখল করে নেয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার অবলম্বন হল অপরের নামত মুক্ত শ্রম, অর্থাৎ মজুরি-শ্রম।**

যখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া পুরনো সমাজে যথেষ্ট পচন ধরিয়ে দেয়, যখন শ্রমিকদের পরিণত করা হয় সর্বহারায়, তাদের শ্রমের উপায়কে পরিণত করা হয় পুঁজিতে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী তার নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের অধিকতর সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের সামাজিকভাবে ব্যবহৃত এবং সেইহেতু সর্বজনীন উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তর তথা ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকতর দখলচ্যুতি সম্পত্তির এক নতুন রূপ ধারণ করে। এর পর যাকে দখলচ্যুত করতে হবে সে নিজের জন্য কর্মরত শ্রমিক নয়, বরং বহু শ্রমিকের শোষণকারী পুঁজিপতি।

এই দখলচ্যুতি সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিজেরই অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়ার দ্বারা, পুঁজির কেন্দ্রীভবন দ্বারা। একজন পুঁজিপতি সর্বদাই বহু পুঁজিপতির মৃত্যু ঘটায়। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি কর্তৃক বহুসংখ্যক পুঁজিপতিকে দখলচ্যুত করার সংগে সংগে ক্রমপ্রসারমান হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক রূপটি, বিজ্ঞানের সচেতন কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ, জমির সুশৃংখল চাষ, শ্রমের হাতিয়ারগুলির একমাত্র সর্বজনীনভাবে ব্যবহার্য শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তর, উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে সমবেত, বিশ্ব-বাজারের জালে সকল জাতিকে জড়িয়ে রাখা, আর তার সংগে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্র। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত সুবিধা যারা

আত্মসাৎ ও একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, পুঁজির সেই রাগববোয়ালদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যার সংগে সংগে বেড়ে চলে দুর্ভোগ, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধ:পতন ও শোষণের পরিমাণ; কিন্তু সেই সংগে বেড়ে চলে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহও, যে শ্রেণী সংখ্যায় সর্বদাই বর্ধিষ্ণু, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব কার্যপ্রণালীর দ্বারাই নিয়মানুবর্তী; ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন-প্রণালীর বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়, যে প্রণালীটি গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে তারই সংগে এবং তারই অধীনে। উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছায় যেখানে পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সংগে সেগুলি আর খাপ খায় না। তখন এই বহিরাবরণটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্ত্যেষ্টির ঘন্টা বেজে ওঠে। দখলকারীরা দখলচ্যুত হয়।

উপযোজনের পুঁজিবাদী প্রণালী, যা পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীরই ফল, তা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে। এইটি হল মালিকের শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন তার নিজের নিরাকরণ সৃষ্টি করে। এটা হল নিরাকরণের নিরাকরণ। তা উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু তাকে এনে দেয় সেই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা গঠিত হয় পুঁজিবাদী যুগের অর্জনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সহযোগ এবং জমি আর উৎপাদনের উপায়গুলির সর্বজনীন অধিকারের ভিত্তিতে।"

না, ভুলক্রমেও মার্কস উপনিবেশিকতা হতে মুক্তি বা জাতীয় মুক্তি ইত্যকার লেনিনীয় ভুয়া বোল-চালের কথা বলেননি, বরং বিশ্ব-বাজারের জালে সকল জাতিকে জড়িয়ে রাখা এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও অতি উৎপাদন সংকটে পুন:পুন নিপতিত খোদ পুঁজিবাদ নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেরই অন্ত্যেষ্টির ঘন্টার মুখোমুখি হয়ে সামাজিক মালিকানার যাবতীয় আয়োজন তথা জমি ও উৎপাদনের উপায়গুলির সার্বজনীন অধিকারের পথে নিজেই নিজের কবর রচনা করে চলছে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ।

কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদের মরণক্রিয়ায় অর্থাৎ নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় এ্যাক্টর নয়, রি-এ্যাক্টর মাত্র। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির নিমিত্তে গঠিত পার্টি -কমিউনিস্ট পার্টি নিরাকরণের প্রক্রিয়ায় বিদ্রোহী শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহকে সংগঠিত- সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত পুঁজির স্বল্পসংখ্যক পুঁজিপতির কেন্দ্রীয় শক্তিকে পরাজিত ও পরাভূত করে কেবলমাত্র শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক রূপটিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে সামাজিকীকৃত শ্রমের উপায় হিসাবে শ্রমের হাতিয়ারগুলির সামাজিক মালিকানা বা সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠিত কর্মী মাত্র ।

সুতরাং, উপনিবেশিক ব্যবস্থার শোষণ-পীড়ন ও অত্যাচারকে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থারই ক্রিয়া-কর্ম হিসাবে বিবেচনা না করে , কেবলই কতিপয় উপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতাধরদের দমন-পীড়ন বা পুঁজিবাদী বিশ্ব-বাজারের অধীন হয়েও কেবলই পরাধীনতার কবল হতে তথাকথিত স্বাধীনতা বা মুক্তি বা ভুয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশ

ইত্যকার বানোয়াটি গাল-গল্পের ধুম্রজালে আবদ্ধ হয়ে ভূ-খন্ড বিশেষে নতুন নতুন রাষ্ট্র বানিয়ে নিপীড়িত বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তির স্বার্থে কমিউনিস্টদের কাজ করার যেমন সুযোগ নাই, তেমন ভূমি সংস্কার ইত্যকার নামে ভূমি হতে 'মুক্তি প্রাপ্ত' মুক্ত শ্রমিককে আবারো ভূমি দাসত্বের বাঁধনে বন্দী করাও কমিউনিস্টদের কর্ম নয়।তাই বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অটুট-অক্ষুন্ন রেখে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের অংশ বিশেষে বা রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখল করাও কমিউনিস্টদের করণীয় নয়।

অথবা, কমিউনিস্টদের না-করণীয় তথা জাতীয় মুক্তি, উপনিবেশ হতে মুক্তি বা স্বাধীনতা ইত্যকার লক্ষ্য সমূহ পরিপূরণে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করাও কমিউনিস্ট নয়, কেবলই বুর্জোয়াদের কাজ হিসাবেই চিহ্নিত ও নির্ণিত হয়। অথবা, কেবলমাত্র রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখল-বেদখল করার যুদ্ধ-লড়াই ইত্যাদিকেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করার অবকাশ নাই।

কিন্তু, কমিউনিস্টদের জন্য না-করণীয় রূপ উল্লেখিত লক্ষ্যে পার্টি গঠন করাসহ রাশিয়ার ক্ষমতা দখলকারী লেনিন-কমিউনিস্ট ইস্তাহার এ উপরোধৃতাংশ ও মার্কসদের 'নিরাকরণের নিরাকরণ' তত্ত্ব ইত্যাদিকে একদম আমলে না নিয়ে বা বলা ভালো অস্বীকার- অমান্য ও গুরত্বহীন গণ্যে বিপ্লব ও বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৯২০ সালে লিখিত " কমিউনিজমে ' বামপন্থার' শিশু রোগ" পুস্তক, যা প্রগতি প্রকাশন, মস্কো কর্তৃক ১৯৭৪ সালে বাংলায় প্রকাশিত-" ভ.ই. লেনিন রচনা সংকলন" এর চতুর্থভাগে প্রকাশিত, তাতে লেনিন লিখেন- " সমস্ত বিপ্লবে, বিশেষ করে বিশ শতকের তিনটি রুশ বিপ্লবেই (৫০) যা সমর্থিত হয়েছে, বিপ্লবের সেই মুল নিয়মটা হল এই: শোষিত ও নিপীড়িতরা পুরনো কায়দায় দিন কাটানো অসম্ভব বলে মানছে ও পরিবর্তন দাবী করছে, এইটুকুই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়; শোষকেরা পুরনো কায়দায় দিন কাটাতে ও শাসন চালাতে পারছে না- এইটে বিপ্লবের পক্ষে অপরিহার্য। 'নিচুতলা' যখন পুরনোটা চায় না এবং 'ওপরতলা' যখন পুরনো কায়দায় পারে না, কেবল তখনই বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে। এই সত্যটাকে অন্যকথায় প্রকাশ করা যায়: দেশজোড়া (শোষিত ও শোষক উভয়কেই নিয়ে) সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। অর্থাৎ,বিপ্লবের জন্য দরকার, প্রথমত, এইটে ঘটানো যে অধিকাংশ শ্রমিক (অন্তত সচেতন, চিন্তাশীল, ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিকদের অধিকাংশ) বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি বুঝছে ও তার জন্য মৃত্যুবরণে প্রস্তুত; দ্বিতীয়ত, শাসক শ্রেণীরা শাসন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যাতে রাজনীতিতে টেনে আনছে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনগণকে (যে কোনো সত্যিকার বিপ্লবের লক্ষণ হল: এতদিন পর্যন্ত নিস্পৃহ মেহনতি ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্ষম লোকেদের দশগুণ-দ্রুত এমনকি শতগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি), যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে সরকার এবং বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তার দ্রুত উচ্ছেদ সম্ভব হয়।" অর্থাৎ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজের বদল বা রূপান্তর নয়, কেবলই দেশ বিশেষের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল এবং যেকোনো কারণেই হোক ঐ দেশের শাসক শ্রেণী যদি সংকটে পড়ে এবং বিপ্লবীরা যদি স্বয়ং-খুনি, হিসাবে মৃত্যুবরণে মনস্থির করে, এবং শ্রমিক শ্রেণী নয়, বরং 'মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণ'যদি সংগ্রামে সমর্থন জোগায়, তবেই বিপ্লব সফল হবে।

স্বয়ং-খুনের, ধারণায় আচ্ছন্নরা মানসিক রোগী হিসাবে চিহ্নিত হলেও এমন মানসিক রোগীদের মধ্যে ধর্মান্ধরা পরলৌকিক ভোগ-সম্ভোগ চাহিবামাত্র প্রাপ্তির আশা-ভরশায় ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণে রাজী হয়, কিন্তু বস্তুবাদী লেনিন তার স্বয়ং-ঘাতি, বিপ্লবীদের কি দিবেন, সেবিষয়ে কোনো ফতোয়া কখনো দেননি, তবুও বদ্ধ উন্মাদনায় আক্রান্ত ও মতিচ্ছন্ন না হলে কি আশায়, লেনিনীয় বিপ্লবীরা স্বয়ং-হত হবেন?

একই পুস্তকে লেনিন আরো লেখেন – " কমিউনিজমের অবজেকটিভ বিকাশের **স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে** প্রয়োগ করাই হল কর্তব্য, আলাদা আলাদা প্রতিটি দেশেই এই স্বকীয়তা বর্তমান এবং তা বিচার করা , আবিস্কার করা, ধরতে পারা চাই।" এবং

একই প্রকাশনা হতে প্রকাশিত একই রচনা-সংকলনের প্রথম ভাগে , মুদ্রিত " ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি" নিবন্ধ যা-সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ, ৪৪ সংখ্যা, ২৩ আগষ্ট, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত, তাতে লেনিন লিখেছেন যে, " কমিউনিজমের পরিপূর্ণ জয়লাভের ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ সর্ববিদ রাষ্ট্র নি:শেষে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসমূহের যে ঐক্য ও স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে আমরা সমাজতন্ত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট করি সেই রাষ্ট্ররূপ হল বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র (শুধু ইউরোপীয় নয়) । তবে স্বাধীন একটা ধ্বনি হিসাবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি কিন্তু বড়ো একটা ঠিক হবে না; কেননা প্রথমত, তা সমাজতন্ত্রের সংগে অচ্ছেদ্য,দ্বিতীয়ত, তা থেকে এই ভ্রান্ত অর্থ করা সম্ভব যে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব এবং সেদেশের সংগে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বিষয়েও তাতে ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে।

অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের এক অনপেক্ষ নিয়ম। এ থেকে দাঁড়ায় যে প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি আলাদাভাবে একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।"

অত:পর, যদিও বুর্জোয়ারাই উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে বা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বহু দেশের সীমা-গন্ডি গুড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই দুনিয়া হতে দেশগুলিকে বিদায় করার দায়ে অভিযুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত ; অথবা, ঐ অভিযোগে প্রকৃতার্থে বুর্জোয়ারাও দায়-দোষী। তবু, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে-দেশগুলি তুলে দেওয়ার বুর্জোয়া অভিযোগ স্বীকার ও কবুলকারী-মার্কসরা এ বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তার কিছু কিছু অংশ আমাদের অত্র নিবন্ধে তাদের বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার সাথে লেনিনের বক্তব্যের যে মিল নাই বা সম্পূর্ণত বিপরীত-বৈরী ও সাংঘর্ষিক তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা নাই। তবে, লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে মার্কসরা সহ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কি বলেছে - তা, আমরা পরখ করে দেখতে পারি–

'প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম', পুস্তকে এ্যাংগেলস লিখেছেন–

“ Will it be possible for this revolution to take place in one country alone?

No. By creating the world market, big industry has already brought all the peoples of the Earth, and especially the civilized peoples, into such close relation with one another that none is independent of what happens to the others.Further, it has co-ordinated the social development of the civilized countries to such an extent that, in all of them, bourgeoisie and proletariat have become the decisive classes, and the struggle between them the great struggle of the day. It follows that the communist revolution will not merely be a national phenomenon but must take place simultaneously in all civilized countries – that is to say, at least in England, America, France, and Germany.

It will develop in each of these countries more or less rapidly, according as one country or the other has a more developed industry, greater wealth, a more significant mass of productive forces. Hence, it will go slowest and will meet most obstacles in Germany, most rapidly and with the fewest difficulties in England. It will have a powerful impact on the other countries of the world, and will radically alter the course of development which they have followed up to now, while greatly stepping up its pace.

It is a universal revolution and will, accordingly, have a universal range.”

এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব বলেই উল্লেখিত প্রশ্নের এক শব্দে “ না” উত্তরদাতা এ্যাংগেলস তো তাহলে মহা বিপ্লবী- মহাপন্ডিত লেনিনের রায়ে “ ভ্রান্ত” নয় কি ? না কি, আধুনিক শিল্প বিশ্ব-বাজারের মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে সম্পর্কিত করেছে যে, দুনিয়ার একজন মানুষও পুঁজিবাদী জোয়ালের কবলমুক্ত নয়, তাই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কেউই স্বাধীন নয় রূপ বক্তব্যটি সত্য নয়?

অথবা অনুরূপ ক্ষমতাধর ও বিশ্বজয়ী পুঁজিবাদ- একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হেতু বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজ বিলোপে সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লবও বৈশ্বিক এবং এর বিস্তৃতিও বিশ্বজনীন বলেই কমিউনিস্ট বিপ্লব জাতীয়তো নয়ই, এমনকি এটি একই সময়ে বা যুগপৎ সংঘটিত হবে অন্তত ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলন্ড ও জার্মানীতে, এরূপ নীতি কথা কি যথার্থভাবেই লিখেন নাই এ্যাংগেলস?

এ্যাংগেলসের এমন মতামত যেমন মার্কসের নিরাকরণের নিরাকরণ-তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত তেমন

The International Workingmen's Association 1864, General Rules, October 1864-

বর্ণিত উদ্ধৃতি এই:

" That the emancipation of labor is neither a local nor a national, but a social problem, embracing all countries in which modern society exists, and depending for its solution on the concurrence, practical and theoretical, of the most advanced countries;"

এবং, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা তথা সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ আবিস্কারক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতার অভাব সহ আরো নানাবিধ কারণে প্যারী কমিউন ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৮৭১ সালে গৃহীত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীতে বর্ণিত আছে- " যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা নয় ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম। " এবং

" সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিদ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা,

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলোর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর; ইউরোপের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুজ্জীবন যেমন এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে, তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ বাণীও জানিয়ে দিচ্ছে যেন পুরানো ভুল আর না হয়, এবং এ আহবান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির আশু একত্রীকরণের; তাই এই সব কারণের জন্য শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।"

সুতরাং, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি যে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিকল্পহীন শর্ত এবং এই সংগঠনের দায়িত্ব-করণীয় যে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে একত্রীকরণ, তাতো-আন্তর্জাতিকের উল্লেখিত নিয়মাবলীতেই লিপিবদ্ধ করেই কৃষক বা মধ্য শ্রেণীর অবক্ষয়িত ভগ্নাংশ বিশেষের সহযোগে নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জন করবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অর্থ- শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা হাসিল নয়, বরং দুনিয়া হতে শ্রেণী আধিপত্য বিলুপ্ত করা। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিষয়টি একটি সামাজিক সমস্যা বিধায় এটি স্থানীয় বা জাতীয় নয় হেতু এটি বৈশ্বিক এবং এ সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলোর তাত্ত্বিক সহযোগ বিকল্পহীন শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করে ১ম আন্তর্জাতিকও লেনিনের সাব্যস্তকৃত " ভ্রান্ত" এ্যাংগেলসকে কিন্তু ভ্রান্ত নয়, বরং কমিউনিজমের যথার্থ প্রেক্ষিত ও সঠিক নীতি প্রণেতা হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে ।

তাইতো মার্কসরা কমিউনিস্ট ইস্তাহারে লিখেছেন – " National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mood of production and in the conditions of life corresponding thereto.

The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat."

বাংলা অনুবাদে এই : "বুর্জোয়াদের পরিপূর্ণত্ব, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ব-বাজার, উৎপাদনী ভাবে সমরূপতা, এবং অধিকন্ত এর সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনের শর্তাবলীর

কারণে জনগণের মাঝে জাতিগত পার্থক্য ও বিরোধীতা নিত্যই অধিক হতে অধিকতর হারে লোপ পাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরো দ্রুত অবসানের কারণ হবে । প্রলেতারিয়েতের মুক্তির শর্তসমূহের প্রথমটি হচ্ছে অন্যূন নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।"

অর্থাৎ, তখনকার জন্য এ্যাংগেলস কর্তৃক চিহ্নিত দেশগুলোর কথাই বলা হয়েছে নিশ্চয়ই; এবং সেই সূত্রেই আজকের যুগে জি-৮ভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়াই হবে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অন্যূন শর্তসমূহের প্রথমটি।

তবে, উল্লেখিত উদ্ধৃতাংশের বাংলা অনুবাদে মস্কো হতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বিবৃত এই: " বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীন ভাব- এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতি-বিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরো দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।"

কিন্তু, "অগ্রণী" ও "নেতৃস্থানীয়" নিকটতম শব্দ হলেও একই রূপ অর্থ বা মান প্রকাশক শব্দ নয়, বা " অন্যতম প্রধান শর্ত" আর " শর্তসমূহের প্রথমটি হচ্ছে " যেমন সমার্থক নয়, তেমন " মিলিত প্রচেষ্টা" এবং "সম্মিলিত ক্রিয়া"ও একই অর্থ প্রকাশক নয়।

নেতৃস্থানীয় মানে অগ্রণী, কিন্ত অগ্রণী মানেই নেতৃস্থানীয় নয়। যেমন বার্ষিক মাথা প্রতি গড় আয়ের মানদন্ডে বর্তমানে - কাতার বা লাইসন্টেশিয়া দুনিয়ার অগ্রণী দেশ বটে, তাই বলে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃস্থানীয় নয়। মার্কসদের কালেও হল্যান্ড, বেলজিয়াম ইত্যকার দেশগুলো পুঁজিবাদী দুনিয়ার অগ্রণী দেশ বটে, তাই বলে ঐ সকল অগ্রণী দেশগুলি নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র ছিল বটে- ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জার্মানী।

প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম সহ নানান রচনায় মার্কস-এ্যাংগেলস, দুজনেই নানানভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, পুঁজিপতি শ্রেণীর দখলাধীন দুনিয়ায় কেন্দ্রীভূত পুঁজির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে- কর্তৃত্ববান ও ক্ষমতাবান বলেই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তৎকালে নেতৃস্থানীয় ছিল উল্লেখিত ৪ টি রাষ্ট্র। অতিরিক্ত উৎপাদন ও অনুরূপ উৎপাদনের সংকট-সমস্যা ও মহামারিতে সর্বাধিক আক্রান্তও ছিল বটে উল্লেখিত রাষ্ট্র চতুষ্টয়। এই রাষ্ট্রগুলোই পরস্পরের বাজার দখল-বেদখলে যুদ্ধ ইত্যাদিও করতো। আবার এই নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলোর শ্রমিক শ্রেণীও অপরাপর রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর অভিজ্ঞ এবং মন্দাজনিত কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। আবার, মন্দাই যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু কারণ সেহেতু সর্বাধিক মন্দাক্রান্ত ও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত বলেই দুনিয়ার সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী দেশ চতুষ্টয়ের শ্রমিক শ্রেণীই দুনিয়ার শ্রমিকদের মুক্তির অগ্রণী ভূমিকা পালনে ঐতিহাসিকভাবেই দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অপরাপর কোন দেশতো নয়ই, এমনকি এ দেশগুলোর যে কোন একটিতেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকারী শ্রমিক শ্রেণী নিশ্চিতভাবে মুখোমুখি হতো পুঁজিবাদী দুনিয়ার অপরাপর দেশগুলির এবং স্বাভাবিকভাবেই সকল দেশের বা নিদেন পক্ষে নেতৃস্থানীয় অপরাপর রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হলেও যে, বিজয়ীদেরকে নিজেই একটি রাষ্ট্র হয়ে উঠতে হতো। তাছাড়া- বিজয়ী দেশে ব্যক্তিমালিকানার স্থলে রাষ্ট্রিয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না । ফলে- দেশ বিশেষে এককভাবে যেমন বিজয়ী ক্ষমতা সংহত ও রক্ষা করতে পারতো না, ঐ দেশের শ্রমিক শ্রেণী তেমন - অপরাপর দেশের পুঁজিবাদী মালিকানা তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও অবসানের কারণও ঘটতো না। কিন্তু, যদি, তখনকার সময়ে সমগ্র দুনিয়াকে নেতৃত্বকারী উল্লেখিত রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের শ্রমিক শ্রেণী বিজয়ী ক্ষমতা বলে এই ৪ রাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানা রহিত-বাতিল ও বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে কেবলমাত্র একটি জনসমিতির মাধ্যমে পরিকল্পিত উৎপাদন ও সামাজিক ক্রিয়াদি সম্পাদন ও সংঘটন করতো, তবে, দুনিয়ার অধিকাংশ অংশ, যা- ছিল এই ৪টি রাষ্ট্রের উপনিবেশ, তা -হতে উপনিবেশিকতার অবসান হতো।

কারণ, বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী- বিক্রি বা মুনাফার জন্য নয়, উৎপাদন করতো বটে কেবলমাত্র নিজেদের সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। তাই , উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজার

তথা উপনিবেশের আবশ্যকতা থাকতো না তাদের। আবশ্যকীয় কাঁচা মাল সংগ্রহেও লুণ্ঠন বা ঠগবাজি-প্রতারণার প্রয়োজন থাকতো না বিজয়ী শ্রমিকদের। তাই, অপরাপর দেশের সাথে অসম বিনিময়ের বদলে সুষম বিনিময়ের সূচনা ততো। অত:পর, বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর দখলাধীন বিশ্বে- সকল মানুষ সকল সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে সক্রিয় অংশীদার হিসাবে সকল সমাজিক ক্রিয়া-কর্ম সংঘটিত করতো বলেই সেখানে যেমন পরজীবীতার অবসানের সূচনা হতো তেমন পরজীবীদের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধাহীনতায় সাধারণভাবে সকলেই উন্নততর জীবনমান অর্জন ও তদানুরূপ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত হতো বলেই, দুনিয়ার অপরাপর অংশের শ্রমিক শ্রেণী সহ মুক্তিকামী মানুষজন- একদিকে উন্নত হতে উন্নততর সভ্যতা-সামাজিকতা ও অনাবিল শান্তির শোষণহীন-শ্রেণীহীন এবং রাষ্ট্র বিহীন সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগ-সুবিধায় এবং নিজ নিজ দেশে শোষণমূলক ব্যবস্থা জারি রাখার প্রতিকুলতায় এবং দুনিয়া জয়ী শ্রমিক শ্রেণীর - দৃঢ় হতে দৃঢ়তর ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে ক্রমেই এগিয়ে যেতে হতো সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক দেশে ব্যক্তিমালিকানা অবসানে এবং একই সাথে ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষীয় সকল সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদি বিলুপ্তকরণে।

সমাজ রূপান্তরের এমন প্রক্রিয়ায় একটি বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক । তবে, ঐ বিশ্ব যুদ্ধটি সংঘটিত হতো- বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত শ্রমিক শ্রেণীর। আজকের যুগেও বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মাধ্যমে দুনিয়ার নেতৃত্বকারী- ফান্ডের লারজেস্ট অংশীদার ৫ সদস্য রাষ্ট্র এবং তাদের সহযোগি জি-৮ ভুক্ত এবং ক্রম-পরম্পরায় জি-২০ রাষ্ট্রগুলির শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত ক্রিয়াই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তসমূহের প্রথমটি হিসাবে গণ্য না হওয়ার কোনো কারণ নাই। সুতরাং, লিডিং- এর অনুবাদ নেতৃস্থানীয় না লিখে- "অগ্রণী" লিখাটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্থান শনাক্তকরণে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা সহ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাছাড়া, জাতিগত পার্থক্য ও বিরোধীতাকে বৈশ্বিক পুঁজিবাদই যখন বিলোপ-বিনাশ করছে, তখন ইতিহাসের গর্তে ঢুবে যাওয়া জাতির পুনর্জন্ম বা মুক্তির নিস্ফল চেষ্টা করা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর অপচেষ্টা বলে সেই ধরণের ক্রিয়াদি প্রতিক্রিয়াশীল দুস্বর্ম হিসাবে চিহ্নিত না হওয়ার কোনো কারণ নাই। উপরন্ত, বুর্জোয়া যুগে একাকী বিপ্লবী শ্রেণী- শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের গতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়া হিসাবে

পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সাধারণ মালিকানার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জাত-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ ইত্যকার সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা হতে মানবজাতি মুক্ত করবে এমনটাইতো কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বলা হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে " ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ" বন্ধ হলেই জাতিগত বিরোধ-বৈরীতাও বিলুপ্ত হবে। তৎসত্ত্বেও, লেনিনবাদের আবরণে শ্রমিক শ্রেণীকে ভুয়া-কল্পিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির গ্যাড়াকলে নিপতিত করার বক্তব্য কমিউনিস্ট ইস্তাহার অস্বীকার ও অকার্যকর করার নামান্তর।

বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপনে- বৈশ্বিক পরিসরের সমাজ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বে একই সংগে সংঘটিত হওয়ার মতো সমতাপূর্ণ সমাজ নয়-পুঁজিবাদ। তবে, কেন্দ্রীয় সুইচ বোর্ডে সুইচ অন-অফ করার মাধ্যমে যেমন ঐ কেন্দ্রের অধীন এলাকায় বিদ্যুৎ এর আলো ছড়ানো বা বন্ধ করা হয়, তেমন বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়ায় মাধ্যমে যদি ঐ সকল নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত, উৎখাত ও উচ্ছেদ করে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে- দুনিয়ার অপরাপর দেশে ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ-বিনাশের সামাজিক ধারা ক্রমান্বয়ে ও দ্রুতগতিতে বিকশিত ও প্রসারিত হবে, এবং অনুরূপ অগ্রসরমানতার ধারায় দুনিয়া হতে ব্যক্তিমালিকানা যেমন বিলুপ্ত হবে, তেমন ব্যক্তিমালিকানার সংরক্ষক বা স্বপক্ষীয় সকল সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপতিত হবে। কাজেই, সমাজ বিপ্লবের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- চেষ্টা বা প্রচেষ্টার বিষয় নয়, বরং সুসম্পন্ন একটি ক্রিয়া বলেই মার্কসরা এটিকে প্রচেষ্টা বলেননি এবং ১৮৪৮ সালের ইংরেজী অনুবাদকেরাও "Action" না লিখে- "Attempt" লিখে নাই।

Attempt means to try to do anything and action means to do something. Thus, attempt, is no doubt action, but action is not only attemp, and its more than attempt. কাজেই, চেষ্টা বা প্রচেষ্টা সন্দেহাতীতভাবে কর্ম হলেও ক্রিয়ার তুলনায় প্রচেষ্টা দুর্বল বা দুর্বলতর শব্দই কেবল নয়, বরং প্রচেষ্টা হচ্ছে কোন ক্রিয়ার সূচনা বা শুরু আর 'ক্রিয়া' অর্থ - একটি সুসম্পন্ন কর্ম । তাই উল্লেখিত বাক্যে যেমন মার্কসরা, তেমন ইস্তাহারের ইংরেজী অনুবাদকেরা "Action" না লিখে- " Attempt" লিখেন নাই ।

সুতরাং, চেষ্টা বা প্রচেষ্টা নয়, বরং অন্যূন নেতৃস্থানীয় দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্তসমূহের মধ্যে প্রথম শর্ত। কাজেই, ইংলন্ড, ফ্রান্স বা জার্মানী ইত্যাদি যে কোনো একটি দেশেও একক বা আলাদা ভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। তাই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের পার্টিও কোনো দেশের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখলের জন্য বা দেশ বিশেষের পার্টি নয়।

" অন্যতম প্রধান শর্তই" মানেতো কতিপয় প্রধান শর্তসমূহের মধ্যে একটি-যেটি আবার 'অন্যতম শর্ত' । কাজেই, কতিপয় শর্তের অন্যমত শর্ত, কোনোভাবেই সকল শর্তের মধ্যে প্রথম বা সর্বাগ্রণ্য হওয়ার মতো কোন শর্ত নয়। কিন্তু, "one of the first conditions" মানেতা শর্তসমূহের মধ্যে প্রথমটি; অর্থাৎ শর্তসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রণ্য শর্ত। তাছাড়া- 'প্রথম' আর 'প্রধান'- এদুটো শব্দের ফারাক না বুঝে কি কেউ ভাষান্তরের কাজ করতে পারে?

কমিউনিস্ট ইস্তাহার সহ সর্বত্র মার্কসরা লিখলেন- শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হচ্ছে - নেতৃস্থানীয় সভ্যদেশগুলির মিলিত ক্রিয়া। অথচ, অত্র নিবন্ধেই লেনিনের বক্তব্য হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, মার্কসবাদী লেনিন দাবী করেছেন যে, কেবলমাত্র একটি দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হেতুবাদ হিসাবে মার্কসরা ইস্তাহারেও বলেছেন অতি উৎপাদনের মহামারিতেই পুঁজিবাদ কবরস্ত হবে; অথচ লেনিন দাবী করলেন একটি নির্দিষ্ট দেশের শাসক ও শোষক শ্রেণীর কলা-কৌশলের ব্যর্থতা এবং ঐ দেশের শাসিত-শোষিত শ্রেণীর অনুরূপ ব্যবস্থায় থাকতে না চাওয়া এবং পরিবর্তনের জন্য জীবন বলি দিতে আগ্রহী কর্মী বিশেষের উপস্থিতি। এতে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসের উদ্ঘাটিত তত্ত্ব যে অকার্যকর ও অস্বীকৃত হয়, তাতো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় স্বার্থান্ধ ছাড়া আর কারো।

আবার প্রথম প্যারার -"জনগণের মাঝে", শব্দযুগল অনুল্লেখিত । অত:পর, শব্দ বিশেষ বাদ দিয়ে অপরাপর শব্দ শব্দগুচ্ছের অর্থ বিকৃত করে অনুবাদ করতে গিয়ে, চাতুর্যপূর্ণ বাক্য বিন্যাশ ও শব্দ চয়নের মাধ্যমে সৃষ্ট ধুম্রজালে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিবৃতাংশ সম্পর্কে যেমন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা , তেমন শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্ত বিষয়ে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি?

তবে, এমন ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা না হলে- ইংলন্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় দেশ নয়, কেবলই রাশিয়ার মতো পশ্চাদপদ একটি দেশে ক্ষমতা দখল করে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় কি? অথবা, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও সেই পার্টির দ্বারা ক্ষমতা গ্রহণ করে চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে মাওরা কি চালাতে পারতেন? অথবা, ভিয়েতনাম-কুরিয়া বা কিউবা যেমন নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করেছে, তেমন পোলান্ড,রোমানিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া , বুলগেরিয়া ইত্যকার দেশের লেনিনীয় নীতিমালার পার্টিগুলি নিজেদেরকে-কমিউনিস্ট পার্টি এবং কথিত কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলার সুযোগ আদৌ পেত?

কাজেই, খোদ লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিলে যে, মস্কোর লেনিনবাদরা কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বর্ণিতাংশ যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং শর্তসমূহের প্রথমটি বিবৃত আছে তা- বিকৃত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে পাঠকদেরকে বিভ্রান্তকরণে- এমন দুস্কর্ম সাধন করেছে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

এবার আমরা উল্লেখ করবো কলকতা হতে প্রকাশিত ইস্তাহারের এতদসংশ্লিষ্ট অংশ: "বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ববাজার, উৎপাদন পদ্ধতির একরূপতা এবং সেটার উপযুক্ত জীবনযাত্রার পরিবেশ- এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন অধিকতরভাবে মিলিয়ে যাছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরও দ্রুত বিলোপের কারণ হবে।"

ব্যাস , এটুকুই। সমাজ বিকাশের নিয়মের ক্ষেত্রে যেমন একটি পুরো বাক্যই গুম করা হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ , " United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat."-

এই বাক্যটি একদম গায়েব করা হয়েছে। বিশ্বাস না হলে দেখুন পৃষ্ঠা নম্বর-৪৪। অথবা, প্রিন্টিং মিসটেক ? না, মোটেই নয়। কারণ-সি.পি.আই.(এম) এর কর্তা প্রকাশ কারাত বাবুরা যেমন ইংরেজী জানেন তেমন বাংলা ভাষা সম্পর্কেও অজ্ঞ নন। অথবা, ইংরেজী

পাঠের সাথে না মিলিয়েই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তারা মুদ্রণ করতে পারেন কি? তাও আবার অতোগুলো সংস্করণের পরও এমন প্রিন্টিং মিসটেক? অথবা, কেবলই সমাজ বিকাশের নিয়মের মতোই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তসমূহের প্রথমটি-ই, মুদ্রিত হবে না কেন, যদি না এর মধ্যে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য সহ চালাকি ও চাতুর্যপূর্ণ যোগসাজস না থাকে? তবে, এটিতো সত্যি যে, কমিউনিস্ট ইস্তাহার যে ভাবে সমাজ রূপান্তরের নিয়ম-সূত্র বিবৃত হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্তসমূহের প্রথম-শর্তটি চিহ্নিত ও নির্ণিত আছে, তা যদি যথাযথভাবে জানতে পারে পাঠক, তবে যে , ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয় মুক্তির লড়াই, ভূমি সংস্কার ইত্যকার কর্মসূচি নিয়ে কেবলই ভারতীয় ভূমিতেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করার কোন সুযোগ বা যৌক্তিকতা থাকে না। অথবা সি.পি.আই (এম) এর মতো পার্টি নয়, বরং প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যদি শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি, তবে কি কারাত বাবুদের আমৃত্যু রাজনৈতিক ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখার সুযোগ থাকে ?

তবে, ইতো:মধ্যে অত্র নিবন্ধে কারাত বাবুর যে সকল বক্তব্য বা ফতোয়াদি আলোচিত হয়েছে, তাতে তো এটি নিশ্চিত যে, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিকৃতি সাধনেই উল্লেখিত রূপ ফাঁক-ফোকর যুক্ত বা অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে অপূর্ণাংগভাবে বা খন্ডিতাংশকে পরিপূর্ণ হিসাবে বাংলা অনুবাদে কলকাতা হতে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে , কারাত বাবুদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে সম্পাদিত বহু ধরণের চালাকি-চাতুরালী ও কারসাজির মধ্যে এই বাংলা অনুবাদের কমিউনিস্ট ইস্তাহার -অন্যতম একটি বটে।

অত:পর, মস্কো-দিল্লীর লেনিনবাদী-কারাত বাবুদের অমরত্বের রাজনৈতিক ব্রাহ্মণত্বের মৌরশি পাট্টা যথারীতি বহাল ও কার্যকর রাখতে- শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে দুরভিসন্ধিমূলে জটিলতা-কৃত্রিমতা সৃষ্টি করা সহ বর্ণিত বিষয়ে ধুম্রজাল বিস্তার করে কুয়াশাচ্ছন্নতার অস্পষ্টতা দ্বারা সামগ্রীকভাবে- পুঁজিবাদ, জাতি, শ্রেণী, কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজম সম্পর্কে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই যে কারসাজিমূলে এমন বিকৃত, খন্ডিত ও কৃত্রিম অনুবাদ করেছে যেমন মস্কোর প্রগতি প্রকাশনের লেনিনবাদীরা, তেমন কলকাতার লেনিনবাদীরাও দেশী-বিদেশী বুর্জোয়াদের সেবা করতেই এবং একই কারণে কলকাতার অনুবাদে উল্লেখিত বাক্যদ্বয়ও গোপন করেছে তাতো- সন্দেহাতীতভাবে অত্র নিবন্ধে ইতো:মধ্যে বিভিন্নভাবে আলোচিত-পর্যালোচিত ও প্রমাণিত হয়েছে।

একই হেতুবাদে, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের– " In depicting the most general phases of the development of the proletariat, we traced the more or less veiled civil war, raging within existing society, up to the point where that war breaks out into open revolution, and where the violent overthrow of the bourgeoise lays the foundation for the sway of the proletariat." মস্কোর অনুবাদে বর্ণিত এই: " প্রলেতারিয়েতের বিকাশে সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে বর্তমান সমাজের ভিতর কমবেশি যে প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলছে– সে যুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলতারিয়েতের শাসনের ভিত্তি– তার সন্ধান আমরা পেয়েছি।" এবং

কলকাতার অনুবাদে বর্ণিত এই: " প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে, বর্তমান সমাজের ভিতরে কমবেশ প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ একটি বিন্দুতে এসে প্রকাশ্যে বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের শাসনের ভিত্তি।" এক্ষেত্রেও– " তার সন্ধান আমরা পেয়েছি।" এই বাক্যটি সি.পি.আই (এম) খুন ও গুম করে উদাও করে দিয়েছে।

মার্কসরা যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের সন্ধান পেয়েছেন সে বিষয়টি মস্কোর লেনিনবাদীরা কবুল করলেও কারাত বাবুরা তা করেননি। তবে, উভয় পক্ষই –" violent" এর আভিধানিক বাংলা– " হিংস্র" বা " প্রচন্ড আক্রমণ জনিত" না লিখার ক্ষেত্রে সহমতে গুরত্বহীনভাবে " সবলে" শব্দটি ব্যবহার করেছে, যাতে বাক্যটির মর্মার্থ ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়েছে। তাছাড়া, বিশ্ব ব্যাংক সহ পুঁজিবাদীদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বাহ্নেই স্থিরকৃত "উপসংহার" স্বপ্রমাণে নিয়োজিত ভাড়াটিয়া গবেষকরা যেমন নিয়োগকর্তার নির্দেশিত ও আরোপিত উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত হয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে "আমরা দেখাবো" রূপ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন, তেমন কলকাতার অনুবাদকেরাও অনুরূপ বোধে মার্কসদের নামে লিখেছেন যে, " আমরা দেখিয়েছি"; ঠিক যেন নিয়োগ কর্তার হুকুম মাফিক কাজে নিযুক্ত বুর্জোয়া গবেষকদের মতো বানোয়াটি বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিত্র দেখানোই মার্কসদের কাজ ছিল! মার্কসদের সম্পর্কে সামান্যতম জানা-শুনা থাকলে, বা মার্কসদের অপমানিত করতে না চাইলে, মার্কসদের মুখে এমন কথা কেউ বসাতে পারে?

কিন্তু, কলকাতার অনুবাদকরা মার্কসদের মুখে, তা বসালেন এবং কারাত বাবুরা তা প্রকাশ ও প্রচার করছেন। তবে, এ বিষয়ে শিক্ষা গুরু -তাদের মস্কোর লেনিনবাদী ইনস্টিটিউট। ভুল বা যথার্থ অর্থ প্রকাশক নয়, এমন শব্দ চয়ন, বা জটিল- গরল নয়, একদম সহজ-সরল বাক্যবিন্যাসেও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে- জটিলতা ও অস্পষ্টতা, বিশেষ বিশেষ বাক্য বা বাক্যাংশ একদম কতল-গায়েব করা; অনুবাদে অনুরূপ চালাকি-চাতুরালী ও কারসাজি করার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার যেমন মার্কস-এ্যাংগেলস রচিত ইস্তাহার নয়, তেমন, এই অনুবাদ পড়ে পাঠকের পক্ষে - সমাজ বিকাশের নিয়ম-সূত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিস্ট পার্টি -যথার্থভাবে বুঝাও সম্ভব নয়, বরং, এতে অনুবাদকদের অসৎ উদ্দেশ্য আরোপিত বিষয়াদিই পাঠকের ধারণায় স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক। অত:পর, আমার মতো যে সকল পাঠক ইংরেজী ভার্ষাণ না পড়ে কেবলই মস্কো-কলকাতার বাংলা অনুবাদের কমিউনিস্ট ইস্তাহার পড়ুয়া, তারা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এবং জাতি-শ্রেণী ও জনগণ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা ছাড়া উপায় আছে কি?

কমিউনিস্ট ইস্তাহার নিয়ে এমন ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর হেতুবাদ ইতো:মধ্যে আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়েছে ইংরেজী ভার্ষাণের সাথে তুলনামূলক আলোচনায়। তবু, এমন দুস্কর্মের প্রধান প্রধান হোতা ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে লেনিনবাদী-ষ্ট্যালিন পন্থী -মাও সেতুঙ এবং খোদ লেনিনের কতিপয় বক্তব্য বিবেচনায় নিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার ও স্পষ্ট হবে বিবেচনায় তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিত উল্লেখ করা হল।

গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত "মাও সেতুঙের রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ" এ -মুদ্রিত " জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে",২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ সালে লিখিত প্রবন্ধে মাও সেতুঙ লিখেন- " বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যে আমাদের সাফল্য পুরনো চীনের চেহারাকে দ্রুত বদলে দিয়েছে। আমাদের মাতৃভূমির সামনে রয়েছে আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যত। গণধিক্কৃত জাতীয় অনৈক্য ও অব্যবস্থার দিনগুলির অবসান ঘটেছে, সেগুলি আর কোন দিন ফিরে আসবে না। শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি মানুষে একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের ৬০ কোটি মানুষ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মহান কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।"

পুঁজি কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক শক্তি না বলে ইস্তাহার অনুবাদে কেবল বাদ দেওয়ার হেতুবাদ মাওয়ের অত্র বক্তব্যের মধ্যেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পুঁজির মতোই সমাজে ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করে কেবলই সমাজের ভূমিকার আবরণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যাদের মৃত্যু থাই পাহাড়ের মতো ভারী তাদের একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা-গুরুত্ব ও ভূমিকাকে কার্যকরণে একটি মানুষে একতাবদ্ধ হওয়ার ফতোয়া জারী করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

৬০ কোটি মানুষের একটি মানুষে পরিণত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবেই কার্যকরী করার অপচেষ্টা হয়েছে চীনের ১৯৭৫ সালের সংবিধানেও। ঐ সংবিধানের ২ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- " The Communist Party of China is the core of leadership of whole chinese people. The working class exercises leadership over the state through its vanguard, the Communist Party of China.

Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought is the theoretical basis guiding the thinking of our nation." And

Art-16, " The National Peolpe's Congress is the highest organ of the state power under the leadership of the Communist Party of China. ....." And

Art-17, " The functions and powers of the National People's Congress are: to amend the Constitution, make laws, appoint and remove the Premier of the State Council and the members of the State Council on the proposal of the Central Committee of the Communist Party of China, approve the national economic plan, the state budget and the final state accounts, and exercise such other functions and powers as the National People's Congress deems necessary."

উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলোর সম্মিলিত নির্গলিতার্থ হচ্ছে- চীনা রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন, আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট সহ অনুরূপ ক্রিয়াদি সমেত রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানসহ কর্মকর্তা নিয়োগ-অপসারণ করবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংগঠন- জাতীয় গণ পরিষদ, তবে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবানুসারে; এবং সমগ্র চীনা জনগণের নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ- চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ; এবং সকল জনগণের পক্ষে যেমন এহেন মহাক্ষমতাধর পার্টি, তেমন চীনা জাতি পরিচালিত হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওসেতুঙের চিন্তা দ্বারা। অবশ্য, লেনিনবাদ যেহেতু সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দুষণ, সেহেতু প্রথম ছোটেই মার্কস বিযুক্ত। তবে, তাত্ত্বিকভাবে লেনিন উপস্থিত থাকলেও মার্কস ও লেনিন দু'জনেই তখন মৃত, এবং জীবিত মাত্র একজন অর্থাৎ মাওসেতুঙ এবং চরম দাসত্বের কঠোর নীতি-লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার হেতুবাদে চীনা পার্টির চূড়ান্ত অর্থে তিনিই সর্বেসর্বা। তাই তার- চিন্তা, মতামত, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত ও আদেশ, এমনকি আশা-প্রত্যাশা মতোই যদি চালিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয় কেউ, এমনকি তিনি যদি ৪৫ বছরের সহযোগি-বন্ধুও হন, তাহলেও দলীয় কর্তার সহিত দ্বিমত করার হেতুবাদে তার মৃত্যু নিশ্চিত বলেই যেমন দল, তেমন দলের নির্দেশনায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে পার্টি। আর আমৃত্যু এমন সর্বাত্মক ও সর্বময় এবং একক ও একেচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ-দখল ও ব্যবহারের নিশ্চিতিতে মাও সেতুঙ যেমন পার্টিতে ছিলেন আমৃত্যু চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রিয় পদ-পদবী সবসময়ে দখলে না রাখলেও অনুচ্ছেদ ১৫-এ বর্ণিত এই: "The Chairman of the Central Committee of the Communist Party of China commands the country's armed forces." , আর নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক অনুচ্ছেদ ২৬- বর্ণিত এই: " The fundamental rights and duties of citizens are to support the leadership of the Communist Party of China, support the socialist system and abide by the Constitution and the laws of the People's Republic of China. It is the lofty duty of every citizen to defend the motherland and resist aggression. It is the honourable obligation of citizens to perform military service according to law."

অর্থাৎ, মাতৃভূমির অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে চীনের সকল নাগরিক 'সন্মানীয় দায়বদ্ধতায়' তথা দাসত্বে সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে পার্টি চেয়ারম্যানের কমান্ডে মৃত্যুবরণ করার

মৌলিক অধিকারী ; এবং রাষ্ট্রের আইন-কানুন তথা মহামান্য চেয়ারম্যানের হুকুম-নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করলে অপরাধী গণ্যে দন্ডবিধানকারী বিচারকগণও নিয়োগ-অপসারণ ইত্যাদি হবেন বটে অনুচ্ছেদ-২৫ মতে পিপলস কংগ্রেস কর্তৃক । কাজেই, অত্র সংবিধানমুলেই চীনা জাতি ও রাষ্ট্র কার্যত ও প্রকৃতার্থেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে চীনা পার্টির আমৃত্যু চেয়ারম্যান- "মহান নেতা" ও " মহান শিক্ষক" মাওসেতুঙ কর্তৃক।

সুতরাং, চেয়ারম্যান মাওসেতুঙ হচ্ছে মাথা আর অন্যরা দেহের নানান অংশ বিশেষমাত্র এবং মাওয়ের মাথার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত ৬০ কোটি মানুষ খোদ মাওয়েরই জবানীতে মাওয়ের মধ্যে লীন ও বিলীন হয়েছে বলে চীনের সংবিধানমুলে "একটি মানুষে একতাবদ্ধ" হয়ে স্বয়ং মাওসেতুঙ চীনা জনগণের মাথা হিসাবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত-নির্ণিত, সাব্যস্ত ও গণ্য হয়ে সে হিসাবে মান্য-পুঁজিত ও স্মরিত হচ্ছে এবং মরেও অমরতা প্রাপ্তির মোহান্ধের স্বার্থান্ধ ও অনুগত দাস-ভৃত্য এবং নানান সুযোগ-সুবিধাভোগী প্রতারক-জোচ্চুরদের বদৌলতে চীনের তিয়েন স্কয়ারে পরিপার্টি অক্ষত দেহে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে ফারাও ডাইনেষ্টীর কিংদের চেয়ে আরো আরো বেশী খরচে। চমৎকার!

উল্লেখ্য, পরজীবীতায় চালাক-চতুর মানুষ ছাড়া কেউ কখনো দেবতা হয়নি। দেবাদীদেব ভারতীয় মনুতো হার মানতেই হচ্ছে, এমনকি ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রথম সুবিধাভোগী এবং স্বীয় সৃষ্ট ঈশ্বরদ্রোহীতার দায়ে মানুষকে কৃষি কর্মের দন্ডভোগী এবং কেবলই পুরুষ অর্থে মানুষের বিনোদনী দাসী-মানবীদের স্বীয় স্বামী তথা মালিকের হুকুম-নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন করা সমেত পুরুষের বংশ বিস্তার ও রক্ষায় আজীবন দাসত্বের দন্ডবিধানকারী যেমন নিজেকে স্ব-জাতির মহান নেতা-মহান শিক্ষক ও রক্ষক ঘোষণা করে নিজ কউমের এখনো গুরু, তেমন লেনিনবাদী কমিউনিস্ট -মাওসেতুঙও তার ঐ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৬ মুলে, যেমন নিজ নাগরিকগণের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারসহ বিবাহ ও পরিবারের রক্ষক, তেমন অনুচ্ছেদ-৯মুলে, আয়কারীদের মালিকানার সংরক্ষক বলেই চীনা পার্টি কর্তৃক " আমাদের মহান নেতা," " মহান শিক্ষক" হিসাবে স্বীকৃত ও মান্য হয়ে সুবিধাভোগী, স্বার্থান্ধ ও মোহান্ধ -মাও ভক্তদের দ্বারা ঘোষিত হয়েছেন-' পূর্বের লাল সূর্য' বলে, এবং তেমনটা মান্য করছে ভারতের নকশালীরা সমেত নেপালের মাওপন্থী এবং ইউরোপ-আমেরিকা সহ দুনিয়ার বহু দেশের, হয় স্বার্থান্ধ-ক্ষমতালোভী, না হয়, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনীয় ভ্রান্তি প্রসূত তবে ঐকান্তিকভাবে সমাজতন্ত্র প্রত্যাশী সহজ-

সরল ব্যক্তিগণও বলেই লেনিন-মাওদের নিকট হার মানছে বটে সর্বকালের সর্ব দেব-দেবতা।

অথচ, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এইঃ " The theoretical conclusions of the Communists are in no way based on ideas or principles that have been invented or discovered, by this or that would –be universal reformer."

বংগানুবাদে, "কোনো অবস্থাতেই কোনো হবু বিশ্ব সংস্কারক এর উদ্ঘাটিত ও আবিস্কৃত অভিসন্ধিপুঞ্জ বা নীতিগুচ্ছ কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি নয়।" কিন্তু, লেনিন-মাও প্রমুখদের 'মহান নেতা' , 'চিরঞ্জিত বীর,' 'ন্যাশন গাইড,' বা ' মহান শিক্ষক' হওয়ার প্রয়োজনে প্রগতি প্রকাশনের উল্লেখিত বাক্যের অনুবাদ এইঃ "ঢালাওভাবে যে কোন অবস্থাতে কোন হবু সংস্কারক যে ধারণা বা নীতিগুলি আবিস্কার বা প্রকাশ করেন, তার উপর নির্ভর করে কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত স্থির হয় না ।"

অর্থাৎ " ঢালাওভাবে", নয়, বিশেষ বিশেষভাবে বা " ঢালাওভাবে যে-কোনো অবস্থাতে নয়", তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে বা বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে যেমন ষ্ট্রালিনের দাবীমতো- 'রুশ বিল্পবের জন্য জন্ম নেওয়া বিপ্লবী' লেনিনের মতো মহান নেতা, শিক্ষক বা চিরঞ্জীত বীর বা ন্যাশন সেইভার বা গাইডারদের মতো ব্যক্তিদের উদ্ভাবিত বলা ভালো বানোয়াটি " লেনিনবাদ" বা কষ্ট-কল্পিত জগা-খিচুড়ি ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর " মাও চিন্তাধারা" বা কিমের জঘন্য প্রতারণার " জুসে আইডিয়া" ইত্যকার নানান ঐতিহাসিক আবর্জনা বিশেষ লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের আবিস্কৃত " তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত" হতেই পারে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, " ঢালাওভাবে" বলে কোনো শব্দ মার্কসরা লিখেননি,তবু অনুবাদে প্রগতি প্রকাশন, তা যুক্ত করলো। অবশ্য, তা না করলে- লেনিনবাদ,মাও চিন্তাধারা বা জুসে আইডিয়া,ইত্যকার বঙ্জাতিমুলক জঞ্জালগুলো বানানোর সুযোগ পাবেন কি করে,তাও আবার মার্কসদের নামে?

আর অন্যান্য সকলের চেয়ে কমিউনিস্টদের বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য নির্ধারণ করে ইস্তাহারে বর্ণিত এইঃ " The Communists, therefore, are on the one hand practically, the most advanced and resolute section of the working

class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat, the advantage of clearly understanding the lines of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian."

না, মাওদের মতো মার্কসরা বলেনি যে, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে দেশ বিশেষের সমগ্র জনগণের " কোর অব লিডারশীপ", বা মাওদের উল্লেখিত সংবিধানে প্রস্তাবনায় যেমন বলা হয়েছে-" আরো বৃহত্তর বিজয় অর্জন করার জন্য আমাদের সকল জাতির জনগণ ঐক্যবদ্ধ", তেমনভাবে দেশ বিশেষের সকল জাতিকে একতাবদ্ধ করা কমিউনিস্ট করণীয়; অথবা মার্কসরা এমনো বলেননি যে, যেমন লেনিন বলেছিলেন যে, কখনো কখনো কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তি সমগ্র জাতির আশা-আকাংখার ধারক-বাহক ও প্রতিনিধি হয়ে উঠেন ঠিক তেমন মাওসেতুং এর দাবী ও বক্তব্যমতো দেশ বিশেষের জনগণকে এক মহান নেতা ও শিক্ষকের দেহে লীন-বিলীন হয়ে সকল জাতির জনগণের একতাবদ্ধতা সৃষ্টি করলেই কেবলই বুর্জোয়াই নয়, শ্রমিক শ্রেণীর অপরাপর ব্যক্তিগণ হতে কমিউনিস্টদের তফাত প্রমাণ করতে হবে।

উল্লেখিত প্যারাও ভুল-বাল অনুবাদ না করার কোন কারণ নাই মস্কো ও কলকাতাওয়ালাদের, যেমন- "resolute" এর অনুবাদ " দৃঢ়সংকল্প" নয়, করা হয়েছে- " দৃঢ়চিত্ত"। 'চিত্ত'- রক্ত সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন নি:সরণে কার্যকরী এক দৈহিক অংগ ছাড়া ' হৃদয় ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার' সংঘটনে যেমন উপযুক্ত নয়, তেমন মস্তিষ্ক ছাড়া দেহের আর কোন অংগই চিন্তা করতে সক্ষম নয় বলেই সকল ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বর্জনে একমাত্র মস্তিষ্কই যেকোনো বিষয়ে - সাধারণ বা বিশেষ বা দুর্বল বা দৃঢ়,সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করতে উপযুক্ত ভূমিকা রাখে। কিন্তু, পরজীবীতার স্রষ্টা মানুষরূপী দেবতাগণ নিজেদের পরজীবীতার স্বার্থে ও অজ্ঞতাপ্রসূত 'চিত্ত' কে, জীবন-মরণ নির্ধারক এক দেহগত অংগ হিসাবে ভুয়াভাবে চিহ্নিত করে, এর স্রষ্টা, সংরক্ষক হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দেবাদিদেব, যাদের সরাসরি অংশ বা উত্তরাধিকার হচ্ছে- রাজা বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বরূপী দেবতা বিশেষ, যারা মরেও অমর থাকবে এবং পুঁজিত-স্মরিত হবে, তবে অন্যান্যদের ' চিত্ত' কত দিন রক্ষিত বা সংরক্ষিত হবে, তা

ঠিক করার দায়-দায়িত্ব যেমন এর কথিত স্রষ্টা-রক্ষক বা সংরক্ষকের, তেমন ঐ সকল সংরক্ষকের তথা দেবাদিদেবের পক্ষ হতে সকলের আত্মার স্থায়ীত্ব, তথা জীবন দান-রক্ষা ও মৃত্যু সংঘটন করা অর্থাৎ রাজাজ্ঞা অমান্যে মৃত্যুদন্ড বা পুন:আনুগত্যে দন্ড মওকুফ করা সহ জীবন ধারণের উপকরণাদির উৎসস্থল-ভূমি,জলাশয়, জংগল ইত্যাদির দখলদারিত্বের ক্ষমতাবলে রাজা বিশেষই জীবন ধারণের উপকরণগুলোর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রক বলেই আবশ্যকীয় উপকরণাদি সংগ্রহ ও উৎপন্নে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া না পাওয়া সম্পূর্ণত রাজকীয় কর্তৃত্বের ইচ্ছাধীন বলেই রাজাজ্ঞাধীনে ও রাজকীয় কর্তৃত্বের শর্তে জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপন্ন করে, সেই সংগৃহীত ও উৎপন্নকৃত সামগ্রী হতে কর-রাজস্ব ইত্যকার নামে যা মুলত চাঁদা, তা রাজকীয় কর্তৃত্বকে প্রদেয় হেতু রাজকীয় কর্তৃত্ব- প্রভু বা মহাত্ম বিশেষ, আর উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপন্নকারী মাত্রই রাজাজ্ঞার ইচ্ছাধীনে বাঁচা-মরার শর্তে জীবিত থাকতে হয় বিধায় প্রভুর সেবক বা দাস হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে স্ব-শ্রমে রাজকীয় কর্তৃত্বকে লালন-পালন করার সুবাদে অমন পরশ্রমভোগী-পরজীবী গোষ্ঠীই ছোট-বড় নানান মাপের 'মহাত্ম ' সেজে মানুষকে দাসে পরিণত করে প্রভু বনেছিল।

কাজেই, আত্মা বা চিত্তকে অমর সাব্যস্তে দাসদেরকে -মহাত্মা বিশেষের পূঁজারী বানিয়ে, মস্তিষ্ক নয়, ভুয়াভাবে আত্মা বা চিত্তকে চিন্তন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেহগত অংগ গণ্যে মহাত্মার কৃপা লাভে সাধারণের চিত্তের শুদ্ধতা ও দৃঢ়তা আবশ্যকীয় শর্ত স্থিরকৃতে অথবা সাধারণ হয়ে অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততার দ্বারা কেউ কেউ পরমাত্মা লাভ করতেও পারে রূপ মতামত তৈরী করতে গিয়ে চিত্ত শুদ্ধিতা বা চিত্তের দৃঢ়তার উপর গুরুত্বারোপ করে দেবতা বা প্রভুরূপী রাজা বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুকুলে নানান গাল-গল্প ও কল্প-কাহিনী বানিয়েছে তৎকালের বহু গীতিকার, কবি-সাহিত্যিক নামীয় রাজভোগের উচ্ছিষ্টভোগীরা। সুতরাং, একালের দেবতা লেনিনবাদী মোড়লরা পরজীবী বলেই এবং পরজীবীতার স্বার্থে মার্কসদের ব্যবহৃত- "দৃঢ় সংকল্প"কে, " দৃঢ়চিত্ত" বলতে লজ্জিত হয়নি।

চাষা-ভুষাকে একই রংয়ের ও একই ডিজাইনের পোষাক, একই হাড়ির খাবার খেতে কমিউনের সদস্যদেরকে বাধ্য করা হলেও গ্রেট টিচার মাওসেতুঙ এবং তার স্ত্রী -চার কুচক্রীর অন্যতম ও পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হয়েও তারা উভয়েও এক বাড়ীতে খেতেন না। কমিউনের জবর-দস্তি নীতিতে ৫০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করার প্রেক্ষিতে

কমিউন নীতির ঘোরতর সমর্থক হয়েও তা পর্যালোচনা ও পুর্নমুল্যায়ন করে উক্ত নীতি পরিবর্তনের সমর্থক প্রেসিডেন্ট লিউ সাউচি সহ রাষ্ট্রীয় ও দলীয় বহু নেতাকে পদচ্যুত, অপসারণ, বন্দী, হত্যা-খুন ও গুম করা সহ বেসরকারী সশস্ত্রবাহিনী তথা চেয়ারম্যান মাওয়ের গুন্ডাবাহিনীর দানবীয় তান্ডবের মাধ্যমে নিজের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে অকোজো ও অকার্যকর করে তার নিজ ইচ্ছামতো পুনর্গঠিত করার জন্য-মাও চিন্তার ফসল আলোচ্য চীনা সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদ রাখা হয়নি। কিন্তু, চীনা রাষ্ট্রটি যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে খোদ চেয়ারম্যান মাওসেতুঙ কর্তৃক তাওতো উক্ত সংবিধানই নিশ্চিত করে। অত:পর, মহাত্মার মহাত্মা বিশেষ দেবতা না হলে এমন ধরণের দেবাদিবের সুযোগ কেউ পায়?

উল্লেখিত সংবিধান মুলে বর্বর যুগের সর্বাধিক নিকৃষ্ট বর্বর রাজার তুলনায় বা ইরানের খামেনিদের চেয়ে শত-সহস্র নয়, লাখোগুণ বেশী ক্ষমতাধর 'গ্রেট লিডার' মাওসেতুঙ, তার উপরোল্লিখিত নিবন্ধে আরো লিখেন- " আমাদেরকে প্রথমে অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে "জনগণ" বলতে কি বুঝায় এবং " শত্রু" বলতে কি বুঝায়। "জনগণ" সম্পর্কিত ধারণার বিষয়বস্তু বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভিন্ন রকম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। জাপান বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও সামাজিক গোষ্ঠী জাপানী আক্রমনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই ছিল জনগণের আওতাভুক্ত, আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা, চীনা দেশদ্রোহীরা এবং জাপান সমর্থকরা সকলেই জনগণের শত্রু পর্যায়ভুক্ত ছিল। মুক্তি যুদ্ধের সময়ে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের পদলেহী কুকুরেরা অর্থাৎ আমলা-পুঁজিবাদী, জমিদার এবং কওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলরা এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত- এরা সকলেই ছিল জনগণের শত্রু; আর এই শত্রুদের বিরোধীতাকারী সব শ্রেণী, স্তর ও সামাজিক গোষ্ঠী ছিল জনগণের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান পর্যায়ে, সমাজতন্ত্র গঠনের সময়ে, যে সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পক্ষে, তাকে সমর্থন করে এবং তাতে যোগদান করে তাদের সকলেই জনগণের আওতায় পড়ে। আর যে সমস্ত শক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিরোধ করে, সমাজতান্ত্রিক গঠনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং তাকে বানচাল করে, তারাই জনগণের শত্রু। "মোদ্দা কথায়, মাও চিন্তার বিপক্ষীয়গণ জনগণ নয়, শত্রু।

তবে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক ঢাকার জনগণকে হত্যায় সমর্থনকারী ও মদদদাতা বলেই মাওয়ের সংজ্ঞা মতোই " মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ" ছিল বাংলাদেশের জনগণের শত্রু। কিন্তু, মাও এবং তার চীন , বাংলাদেশের জনগণ নয়, শত্রুপক্ষ পাকিস্তানেরও যেমন সমর্থক-সহযোগি ছিল তেমন এক্ষেত্রে মাওসেতুংরা "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ"এর শত্রু ছিল না, বরং ছিল বটে বন্ধুই।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমাজ- সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ইতো:পুর্বে অত্র নিবন্ধে কমিউনিস্ট ইস্তাহার সহ মার্কসদের যে সকল মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সাথে অনুরূপ বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে কি ? মার্কস-এ্যাংগেলসের বক্তব্য অনুযায়ী- শ্রম শক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ-বৈরীতা হতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব; এবং শ্রমের ক্রেতা যেখানকারই হোক , যেমন এখন চীনে অবস্থিত বহু পুঁজিপতি চীনা নয়, এমন কি ভারত-বাংলাদেশের মতো গুরুত্বহীন দেশের পুঁজিপতিরাও চীনে বিনিয়োগ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনুকুল সুবিধায় চীনা শ্রমিকদের শ্রম শক্তি আরামছে শোষণ করছে বলেই চীনের হোক বা যেখানকারই হোক- শ্রম শক্তির বিক্রেতা শ্রমিক, এই উভয়ের মধ্যেই – উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের হার, এবং তা আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা জনিত কারণে বৈরীতা-শত্রুতা অনিবার্য।

আবার, উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতের সুযোগ অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার – সমর্থনকারী, আশ্রয়ী ও রক্ষাকারী মাত্রই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী অর্থাৎ শ্রম শক্তি বিক্রেতার শত্রু। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী- শ্রমিক শ্রেণী তার শ্রেণী স্বার্থে বা মুক্তি হাসিলে অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদে ও বিলোপে- উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী - ভোগী অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, বাধ্য করা হলে যুদ্ধও করবে। কিন্তু, মাওসেতুঙ যেমন জাতীয় বুর্জোয়ার পরিচয়ে কেবলমাত্র জাপ বিরোধী যুদ্ধে মাওয়ের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজ নিজ স্বার্থেই সমর্থন করে বলে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারীকে " জনগণ" বানিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধু বানালেও বুর্জোয়া তথা শ্রম শক্তির ক্রেতার সহিত তেমন বন্ধুত্বের সুযোগ নাই শ্রমিক শ্রেণীর, তার জন্ম হতেই। কারণ শ্রমিক - কেবলই শ্রম শক্তি বিকেতা হেতু শ্রম শক্তির ক্রেতার জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করে নিজেই শোষিত হয় শ্রম শক্তির ক্রেতা কর্তৃক এবং

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাভোগী, সমর্থক ও রক্ষক বুর্জোয়া শ্রেণী বলেই **জন্ম হতে এবং আজন্ম শত্রুতার সম্পর্কাধীন শ্রেণী বটে- বুর্জোয়া ও শ্রমিক ।**

সোজা কথায় শ্রম শক্তি আত্মসাৎ করেই পুঁজি যেমন উৎপন্ন হয়, তেমন শ্রম শক্তি শোষণ করেই পুঁজি, স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। তাই, শ্রম শক্তি আত্মসাৎকারী পুঁজির সহিত শ্রমের দ্বন্দ্ব ও বৈরীতা পুঁজির জন্ম শর্ত। এ জন্ম শর্তাধীন দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়- পুঁজিপতি শ্রেণীর ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব রূপে। সুতরাং জন্ম হতেই দ্বন্দ্ব ও বৈরীতার সূত্র ও সম্বন্ধে আবদ্ধ বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আমৃত্যু বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর সুযোগ নাই। তাই, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ ও শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত মাওদের " জনগণ" দ্বারা কেবল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করা গেলেও কস্মিণকালেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য- কেবলমাত্র শ্রম শক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা রহিত-বাতিল ও বিনাশের মাধ্যমে সৃষ্ট সাধারণ মালিকানাধীন সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী পরিচয় বিলুপ্তির শর্তে 'কেনাবেচা' মুক্ত সমাজে - প্রত্যেকেই মুক্ত-স্বাধীন মানুষ বলে মানুষে মানুষে শত্রুতা-বৈরীতার যেমন সুযোগ নাই, তেমন আবশ্যকতাও নাই। কাজেই, মাওয়ের ইচ্ছাধীন বা স্বার্থাধীন শত্রু-মিত্র রূপী 'জনগণ' নয়, - কমিউনিস্ট পার্টি কেবল শ্রমিক স্বার্থের সংগঠন এবং কমিউনিস্ট ইস্তাহারও কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির মাধ্যমে শ্রমিক নামীয় কতিপয় মানুষ নয়, বরং সামগ্রীকভাবে সমগ্র মানব জাতির মুক্তি হাসিলের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপত্র ।

এই নিবন্ধেই মাও জানিয়েছেন যে, তার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে -রাষ্ট্রায়াত্ত কল কারখানা বা শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে যেমন চাকুরীজীবী তেমন তারা তাদের মুলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদভোগী বটে বুর্জোয়ারাও । তবু, এহেন বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং দেশপ্রেমিক ও সমাজতন্ত্র গঠন কার্যে সহযোগি-সমর্থক। পুঁজি সঞ্চলনে ব্যক্তিগত দায়হীন, পুনরুৎপাদনের ঝুঁকি বিহীন উপরন্ত রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তায় ও দায়িত্বে বেতন-ভাতা ও নানান সুযোগ-সুবিধাভোগী এবং পুঁজির হারাহারি মতো সুদ গ্রহীতা মাওয়ের চীনা জাতীয় বুর্জোয়ারা তথা শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা কয়েক সপ্তাহ মাওয়ের পার্টির অধ্যয়ন শিবিরে যোগদান করে আরো বেশী মাত্রায় সমাজতন্ত্রের উপযোগি কর্মীতে পরিণত হওয়ার তথ্যাদিও এই প্রবন্ধে 'গ্রেট টিচার' মাও দিতে ভুলেনি।

অথচ, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " But not only has the bourgeoisie forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the man who are to wield those weapons- the modern working class- the proletarians."

না, জাতীয়- বিজাতীয়, কোন ধরনের বুর্জোয়াই নয়, এমনকি, মধ্য শ্রেণীর অবক্ষয়িত ভগ্নাংশ বিশেষ, ছোট হস্তশিল্পের মালিক, দোকানদার, কারিগর বা চাষীও নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ করে বুর্জোয়ার মৃত্যু ঘটানোর অস্ত্র বুর্জোয়ারাই তৈরী করেছে, এবং সে অস্ত্র চালানোর জন্য বুর্জোয়ারাই সৃষ্টি করেছে-আধুনিক শ্রমিক তথা প্রলেতারিয়েত।

অত:পর, 'জাতীয় বুর্জোয়া', 'ব্যবসায়ী', 'শিল্প-পতি', 'সুদখোর', রাষ্ট্রিক পরজীবী, 'কৃষক' ইত্যকার দেশপ্রেমিক জনগণকে নিয়ে ও জনগণের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এমন আজগুবি কল্প-কাহিনী শুনলে বা বিশ্ব জয়ী বুর্জোয়ারা ইতিহাসের মানদন্ডে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে অতীত আশ্রিত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিজ্ঞান এর সূত্রায়নকারী ও ব্যাখ্যাকারী যথাক্রমে মার্কস ও এ্যাংগেলস যদি, সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে -গ্রেট কমিউনিস্ট লিডার এন্ড টিচার- মাওদের নব আবিস্কৃত সূত্র মতো – উক্তরূপ জনগণের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ভুমিকা দেখতেন , তবে লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রের সাফল্যে চমৎকৃত হতেন, না লজ্জায় মুখ ঢাকতেন, সে বিচারে না গেলেও, মাওয়ের গুরু লেনিন এ বিষয়ে কি বলেছেন, তা আমরা কিঞ্চিত উল্লেখ করতে পারি।

" অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে" শিরোনামে, প্রাভদা, ২৩৪ নং সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর, ১৯২১ সালে -প্রকাশিত, এবং ভ.ই. লেনিন, রচনা সংকলন, চতুর্থভাগে মুদ্রিত নিবন্ধে লেনিন লিখেন- " ঠিক এই বারই আমরা আমাদের ' নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি' দিয়ে আমাদের একগুচ্ছ ভুল শুধরে নিচ্ছি,ক্ষুদে কৃষি এক দেশে সমাজতান্ত্রিক ইমারতটার নির্মাণ কী ভাবে চালিয়ে যেতে হয় ভুল না করে, সেটা আমরা শিখে নিচ্ছি। "

উল্লেখ্য, নয়া অর্থনীতির মাধ্যমে কৃষি পণ্য বিক্রির সুযোগ সহ ধনী কৃষককে জমি এবং কৃষি-শিল্প, ব্যাংক-বীমা, আমদানী-রপ্তানি সহ প্রায় সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যক্তি পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যাতে ষ্ট্যালিনের তথাকথিত

কালেক্টিভাইজেশনের পরে ১৯৩৬ সালেও রাষ্ট্রিক খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষ ৪০-৫০% ছিল বলেই ব্যক্তি মালিকানার সুবিধার্থে উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানাকে রাষ্ট্রীয় ভাবে সমর্থন -রক্ষণ ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান সহ মাওয়ের পূর্বসূরি হিসাবে নাগরিকগণের বিবাহ ও পরিবারকে রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

অত:পর, লেনিনের রাশিয়ায়ও রাষ্ট্রিয় একচেটিয়া কর্তৃত্বে ও একদলীয় শাসনে প্রাইভেট মালিকানার স্বপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে ভয়ানকভাবে শোষণ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগে এমনকি বিদেশী পুঁজিকে অধিকতর মুনাফা দিয়ে বিদেশী পুঁজিপতিদের পুঁজিরও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি-বহাল রেখে মাওয়ের পূর্বসূরী হিসাবে লেনিন-ষ্ট্যালিনরাও ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, মুনাফাখোর, সুদখোর, কর ফাঁকিবাজ ইত্যকার ধান্ধাবাজ-জুচ্চোরদের সহযোগে ও স্বার্থে একক ও একদলীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাষ্ট্রীক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধার যাবতীয় আঞ্জামকারী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়েও তারা-দাবী করেছিল যে, তাদের রাষ্ট্রও সমাজতান্ত্রিক!

পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণ এবং সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এহেন তাত্ত্বিক-ব্যাখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠাতাদের-ঈশ্বর ক্ষমা করুন, হেফাজত করুন।

একই নিবন্ধে লেনিন আরো লেখেন-" যথেষ্ঠ বিচার না করেই আমরা অনুমান করেছিলাম যে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সরাসরি আদেশেই একটা ক্ষুদে কৃষি দেশে কমিউনিস্ট ধরনে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং উৎপন্নের রাষ্ট্রীয় বন্টনের সুব্যবস্থা করা যাবে। বাস্তব জীবন আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। দরকার হয়েছে একগুচ্ছ উৎক্রমণ পর্যায়ের-রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের, যাতে কমিউনিজমে উত্তরণের প্রস্তুতি করতে হবে বহু বৎসরের কাজের মাধ্যমে। সরাসরি উদ্দীপনা দিয়ে নয়, বরং মহা বিপ্লবে প্রসূত উদ্দীপনাটার সাহায্য নিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণার ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক হিসেবীয়ানার ভিত্তিতে আগে সেই সব মজবুত সাঁকোগুলা নির্মাণের কাজে লাগুন যা ক্ষুদে কৃষি দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে; তা ছাড়া আপনারা কমিউনিজমে পৌঁছবেন না, তা ছাড়া কোটি কোটি লোককে আপনারা কমিউনিজমে নিয়ে যেতে পারবে না।" এবং

এই নিবন্ধেই লেনিন আরো লেখেন- " প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারী, অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান এক ' কারবারী', নিপুন এক **পাইকারী বণিক** হয়ে উঠতে হবে, নইলে সেই রাষ্ট্র ক্ষুদে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে খাড়া করে তুলতে পারবে না।". এবং এই নিবন্ধে তিনি আরো লেখেন – " বাস্তব জীবনে ক্ষুদে কৃষি অর্থনীতি থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রেরণায় উৎপাদন বাড়বে; যে করেই হোক না কেন, সর্বাগ্রে আমাদের দরকার উৎপাদন বৃদ্ধি।" এবং এই জন্যই লেনিনের মতোই লেনিনের হুবুহু নকলকারী মাওসেতুঙও, তার উল্লেখিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯ এ লিখেছেন যে " যে কাজ করবে না, সে খেতে পারবে না,"।

অথচ, এ যাবৎ আমরা কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যা পেয়েছি তা হচ্ছে- অতি উৎপাদনের মহামারিতেই পুঁজিবাদ-ই ব্যক্তি মালিকানার সীমানা ক্রমেই সংকোচিত করতে করতে ক্রমেই পুঁজিপতি শ্রেণীর মৃত্যু নিশ্চিত করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই, খাবার বা জীবন ধারণের উপকরণের অভাবতো নয়ই, বরং জীবন ধারণের উপকরণাদির আতিশয্যেই পুঁজিবাদ ধ্বংস হচ্ছে ও হবে। তাছাড়া, শ্রম শক্তির ক্রেতা- রাষ্ট্র বা ব্যক্তি যেই হোক না কেন, যদি শ্রম শক্তি বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকে এবং বেচা-কেনা থাকে বা ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত না হয়, যদি, উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন হয় , অর্থাৎ পুঁজি গঠিত হয়, সকল প্রকার উত্তরাধিকার বাতিল না হয়, এবং যদি নেতৃস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্যবদ্ধতায় সম্মিলিত ক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত-বিলোপ করা না যায়, তবে, সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু, লেনিন-মাওদের রাষ্ট্রে কেবল বেচাকেনা ছিল, বা ব্যক্তি মালিকানা ছিল, বা পুঁজি ছিল বা উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন হত, এমনই নয়, খোদ লেনিন মহোদয় বলছেন- যে করেই হোক উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং সেজন্য হতে হবে **বুদ্ধিমান কারবারী ও নিপুন বণিক**। কি সর্বনাস! কারবারী-বণিক, যাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম, এবং **যাদেরকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র, সেই কারবারী-বণিকদের দিয়েই অর্থাৎ " ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণায়" তাড়িত লেনিন-মাওদের মতো 'বুদ্ধিমান কারবারী' ও 'নিপুন বণিকদে'র দিয়েই নাকি রুশ-চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ??????!**

অথচ, 'উপনিবেশিকতা প্রসংগে ' পুস্তকে মুদ্রিত, লন্ডন,১৮ জানুয়ারী, " এ. বেবেল সমীপে এ্যাংগেলস" পত্রে বর্ণিত এই: "... রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত চাইলে জাভার

কথা ধরা যেতে পারে। পুরনো কমিউনিস্ট সুলভ গ্রাম-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ওলন্দাজ সরকার সেখানে সমস্ত উৎপাদন এমন চমৎকার করে স্বহস্তে নিয়েছে যে, অফিসার ও সৈন্যের জন্য ১০ কোটি মার্ক বেতন ছাড়াও বছরে সাত কোটি মার্ক সে পায় ওলন্দাজদের হতভাগ্য উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলির সুদ জোগাবার উদ্দেশ্যে। তুলনায় বিসমার্ক তো এক নিরীহ শিশু।..."

কাজেই,এ্যাংগেলসের রায়ে সমাজতন্ত্র বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বণিক-কারবারী লেনিন-মাওরা বিসমার্ক পন্থী নয় কি?

তাছাড়া,১৮৯৪ সালে লিখিত " ফ্রান্স ও জার্মানীর কৃষক সমস্যা" প্রবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " সমাজের যে-কোন শ্রেণী হতে আগত ব্যক্তি বিশেষকে আমরা পার্টিতে অন্ত র্ভুক্ত করতে পারি, কিন্তু পুঁজিপতি, মাঝারি বুর্জোয়া বা মাঝারি কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো দলে আমাদের প্রয়োজন নাই।"

অত:পর, কৃষক মুক্তি , জনগণের সার্বভৌমত্ব -গণতন্ত্র ও জাতীয় পুঁজি বিকাশের উদ্দেশ্যে গঠিত- বলশেভিক পার্টির জন্মের মাত্র কয়েক বছর আগেই এ্যাংগেলস কর্তৃক লেনিনদের পার্টি যেমন পরিত্যাক্ত হয়েছে, তেমন একই কারণে লেনিনের সরাসরি হস্তক্ষেপ-সহযোগিতায় গঠিত মাওদের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বা প্রকাশ কারাত বাবুদের সি.পি.আই (এম) সহ এ জাতীয় পার্টিগুলিও- এ্যাংগেলসের বক্তব্যমতো শ্রমিক শ্রেণীর নিকট পরিত্যাজ্য ও পরিত্যাক্ত আবর্জনাই। তৎসত্ত্বেও, লেনিন-মাওরা বা তাদের ছেলা-চামুন্ডারা কমিউনিস্ট হলে স্বয়ং এ্যাংগেলস কমিউনিস্ট নয়।

মরণকালেও নিজের রাষ্ট্র ছিল না মার্কসের, তার জন্ম স্থান জার্মান নয়, পুঁজি গ্রন্থের পটভূমি ছিল যথার্থভাবেই-ইংলন্ড, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বৈশ্বিক প্রেক্ষিত সহ মুলত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রামের তাৎপর্য ও উপযুক্ততায় তার অনেক গ্রন্থের স্থান-ফ্রান্স; চীন-ভারত, আমেরিকা-আলজেরিয়াও বাদ যায়নি, দেশ বিশেষ নয়, বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বৈশ্বিক অবস্থায় যেমন ছিল মার্কসের একাগ্রতার কেন্দ্র তেমন প্রেম ছিল বিশ্বের আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এবং মানুষও উপেক্ষিত নয় বলেই মানবজাতির অতীত যেমন গভীর অভিনিবেশে অধ্যয়ন করে মানব জাতির ইতিহাসের নিয়ম-সূত্র আবিস্কার করে সেই সূত্র মতোই যে, শ্রমিক শ্রেণী কেবল নিজেকে নয়, মানবজাতিকে মুক্ত করবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই তা অর্জনে আমৃত্যু তৎপর ছিলেন। এ্যাংগেলসও

বহুদিন বসবাস করেছেন ইংলন্ডেই, দেশ-জাতির গন্ডীবদ্ধতা নয়, বরং মার্কসের মতোই ছিলেন বৈশ্বিক দৃষ্টি ভংগির অধিকারী ও বিজ্ঞানী এবং কেবল জার্মানীর নয়, বিশ্বের তাবৎ শ্রমিক শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু বলেই মাত্র ২২ বছর বয়সে জার্মান নয়, 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' লিখে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অত:পর, মানুষ হওয়া ও মানুষ থাকার ধারাবাহিক সংগ্রামে বিজ্ঞানী ও মানুষ মার্কসের সহযোগী ও বন্ধু হিসাবে আমৃত্যু সক্রিয় ছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনে – যা যা করণীয়, তা তা করে, শ্রেণী বিভাজনের দু:সহ দুরাবস্থা হতে মানব জাতির নিস্কৃতি ও মুক্তি অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন ফে. এ্যাংগেলস।

সুতরাং, মার্কসের মতো অভিবাসী বা হালেও যারা নানান কারণে নিজ জন্ম স্থান-ভুমি,পিতৃ বা মাতৃভূমি, কার্যত, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রিক-বেষ্টনী ভুক্ত ভূমি বা দেশ বিশেষ হারিয়ে বা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়ে পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন অপর কোন রাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছেন তারা আদৌও কমিউনিস্ট কি না বা কমিউনিস্ট হতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে নিরুত্তর থেকে পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত মাওসেতুঙ তার " জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" নিবন্ধে লিখেছেন– "মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেই কেবল আমরা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে পারি। আর জাতীয় মুক্তি অর্জন করেই কেবল সর্বহারাশ্রেণী ও অপরাপর শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে।" এবং " জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে দেশপ্রেম হলো ব্যবহারিক আন্তর্জাতিকতাবাদ।" কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিকতাবাদের চমৎকার ব্যাখা বটে।

মাওসেতুঙের গুরু লেনিনও " কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১৯শে জুলাই –৭ই আগষ্ট,১৯২০ (২৬) জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন বিষয়ক কমিশনের রিপোর্ট, ২৬ শে, জুলাই" , যা ভ.ই. লেনিন রচনা-সংকলন, চতুর্থভাগে মুদ্রিত, তা তে লিখেছেন– "বর্তমানে গোটা বিশ্ব বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক নিপীড়িত জাতি এবং নগণ্যসংখ্যক নিপীড়ক ও বিপুল ঐশ্বর্য ও পরাক্রান্ত সমরশক্তির অধিকারী জাতির মধ্যে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি।" এবং " 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' কথাটার বদলে ' জাতীয় বিপ্লবী' কথাটা বসানো দরকার। এ বদলের অর্থ এই যে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের উপনিবেশের বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন করা উচিৎ..." ।

তা নিপীড়িত হোক বা পীড়ক বুর্জোয়াই হোক, বুর্জোয়ামাত্রই শ্রমিক শ্রেণীর শোষক। তাইতো কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এইঃ " The proletariat goes through various stages of development. With its birth begins it struggle with the bourgeoisie."

জন্মমুহূর্তে থেকে শ্রমিকের সাথে বুর্জোয়ার বিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, শ্রম শক্তি বিক্রি করতে গিয়েই শ্রমিক মুখোমুখি হয় শ্রম শক্তির ক্রেতার । অত:পর, যখনই শ্রমিক তার শ্রম শক্তি বিক্রি করে দেয় তখনই সে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃত হয়। তবে, মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করতে না পারলে শ্রমিক হিসাবে কাউকে মালিক নিয়োগ করে না বলেই শ্রমিক জন্মমুহূর্ত হতেই মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করে বিধায় সে নিজেই শোষিত হয়। কাজেই, এই শোষণজনিত কারণেই শ্রমিকের শত্রু হচ্ছে মালিক, যিনি-উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী। সুতরাং, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত জন্মমুহূর্ত থেকে সংগ্রাম করতে হয় শ্রমিককে বলেই মালিক তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে মৈত্রী বা বুর্জোয়া মুক্তির জন্য কাজ করার সুযোগ নাই শ্রমিকের।

তাছাড়া, লেনিন হতে প্রকাশ কারাত, সকলেই কবুল করে নিয়েছেন যে, উপনিবেশ হতে তথাকথিত মুক্তি প্রাপ্ত দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী সাবেক প্রভু দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে মিলে যায়, উভয়ে মিলে-মিশে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থই নিশ্চিত করার চেষ্টা-অপচেষ্টা করে। উপরন্ত, লেনিন-মাওদের বক্তব্য মতো যদি উপনিবেশ হতে মুক্তি বা নিপীড়িত জাতির মুক্তি- মানেতো কার্যত, স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর তথাকথিত মুক্তি। অত:পর, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অথচ, সাবেক প্রভু দেশ সহ অপরাপর দেশের এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে সকল দেশের সকল বুর্জোয়ারাই স্ববিরোধীভাবে বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে বলে লেনিননদের মুক্তি প্রাপ্ত জাতি বা দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী - 'মুক্তি প্রাপ্ত' দেশীয় পুঁজিপতিদের যেমন অবাধ শোষণের পণ্যে পরিণত হয়, তেমন দেশীয় পুঁজিপতিদের সহযোগিতায় সামগ্রীকভাবে বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর খোরাকে পরিণত হয়।

সুতরাং, লেনিনীয় জাতীয় মুক্তি বা মাওয়ের জাতীয় মুক্তি ও দেশপ্রেমের শর্তে আন্ত র্জাতিকতাবাদ -প্রকৃত পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকতর দুর্ভোগ-দুর্দশার কারণ হওয়া ছাড়াও শ্রমিক শ্রেণীকে জাতি-দেশ বিশেষের সীমা-গন্ডীতে আটক-বন্দী করে তাদেরকে

একদিকে যেমন বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগি অর্জনে বা প্রকৃত আন্তর্জাতিকবোধে উন্নীত হতে না দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় অবস্থা ও দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে উপলব্ধি অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য লাভে বিভ্রান্ত করে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রেও মারাত্মক বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

তবে, লেনিনের উদ্ভাবিত ও সূত্রায়িত তত্ত্ব মতো বর্তমান বিশ্বটা- নগণ্য সংখ্যক নিপীড়ক জাতি আর বহুসংখ্যক নিপীড়িত জাতিতে ভাগ বিভাগ হয়েছে, না কি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা ও বৈরী সম্পর্কের বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীতে বিভাজিত বৈশ্বিক বুর্জোয়া সমাজ নিত্যই লম্বালম্বিভাবে ভেংগে টুকরো টুকরো হচ্ছে, সে বিষয়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কমিউনিস্ট ইস্তাহারের দ্বারাস্ত হওয়াই শ্রেয় ।

ইস্তাহারে বিবৃত এই: " Our epoch, the epoch of the bourgeoisie, possesses, however, this distinct feature: it has simplified class antagonisms. Society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other – bourgeoisie and proletariat."

মস্কোর অনুবাদে এই: " আমাদের যুগ, অর্থাৎ বুর্জায়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণী বিরোধ এতে সরল হয়েছে। গোটা সমাজই ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখিন দুই বিরাট শ্রেণীতে: বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।"

আর কলকাতার অনুবাদ এই: " আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু একটা পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণী বিরোধকে এ সহজতর করেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়েছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখিন দুই বিরাট শ্রেণীতে- বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।"

উভয়ের অনুবাদের যথার্থতা নির্ধারণে আমরা অভিধানের সাহায্য নিতে পারি। Possesses= মালিক হওয়া; নিয়ন্ত্রণে রাখা, Distinct = পৃথক; স্বতন্ত্র, Feature =

বৈশিষ্ট্য, Simple = সরল, Antagonism = সক্রিয় বিরোধীতা, More = আরো; অধিক; অধিকতর, Split = লম্বালম্বিভাবে ভেংগে টুকরো হওয়া; ফেটে ভাগ হওয়া, Hostile = শত্রুপক্ষীয়; বৈরী । এবারে উভয়ের অনুবাদে ব্যবহৃত অন্তত দুটি শব্দের ইংরজৌ দেখতে পারি আমরা : ক্রমে = continuous; gradual; gradually, এবং ভাগ = division; partition .

" সরল"-কে 'সহজ' বলার যেমন দরকার ছিল না, তেমন ব্যবহারের প্রেক্ষাপঠ বিবেচনায় - 'একে অপরের', পরিবর্তে "পরস্পর" লিখার যৌক্তিকতা নাই। আবার, অধিক হতে অধিকতর না লিখে " ক্রমেই" লিখে যেমন বৈশ্বিক বুর্জোয়া সমাজের ভেংগে টুকরো হওয়ার গতিটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি, তেমন " ফেটে ভাগ হওয়া" বা লম্বালম্বিভাবে ভেংগে টুকরো হওয়া" না লিখে " ভাগ" শব্দ লিখে – অস্থায়ী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশ্বিক বুর্জোয়া সমাজের যথার্থ ছবিটা যথার্থভাবে উপস্থাপন না করে, তা গোপন করার মাধ্যমে যেমন মার্কসদের যথার্থ বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে, তেমন অধিক হতে অধিকতরভাবে চৌচির হওয়া বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিস্তারে সহযোগিতা করে কার্যত পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে সহযোগিতা করার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে।

স্বার্থান্ধ কারাত বাবুদের মতো পুঁজিবাদী সমাজের কৃত্রিম বা কল্পিত চিত্র ' দেখানোর' আঁকার যেমন প্রয়োজন ছিল না তেমন ভন্ড লেনিন-মাওদের মতো বানোয়াটি তথ্য-তত্ত্ব নির্মাণ বা আবিস্কারের ধান্ধা ছিল না বলেই মার্কসরা " কিন্তু" তথা " but" - এর শর্তসাপেক্ষ বা মার্কসদের যুগ বুঝাতে - " অর্থাৎ" তথা " that is" শব্দ মার্কসরা যথার্থভাবে ব্যবহার করেননি; এবং রাজা-বাদশা বা বুর্জোয়া যুগে-সামন্তদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব নয়, বরং অধিক হতে অধিকতর হারে ভেংগে টুকরো টুকরো হওয়া অবক্ষয়িত বৈশ্বিক বুর্জোয়া সমাজের মালিকানা বা দখলদারিত্ব যে, বুর্জোয়াদেরই সেজন্য "আমাদের যুগ, বুর্জোয়া যুগের" অতীতের সমাজ হতে পৃথক বা স্বতন্ত্র অবস্থা বুঝাতে "অর্থাৎ" ও " কিন্তু" যেমন লিখেননি, তেমন- বুর্জোয়া মালিকানা বা দখলদারিত্ব বুঝাতে- " Possesses" শব্দটি যথার্থভাবে উল্লেখ করতে যথার্থভাবেই ভুল করেননি।

অথচ, একদম উদ্দেশ্যমূলক দুরভিসন্ধিতে-মস্কো বা কলকাতার অনুবাদে যেমন- "অর্থাৎ" ও " কিন্তু" শব্দ যুক্ত করা হয়েছে তেমন- "Possesses" শব্দটির উল্লেখই করা হয়নি। দুনিয়ার দখলদারিত্ব বা মালিকানা বুর্জোয়ারা অর্জন করেছিল, এবং অপরাপর সাবেকী সামন্ত, বা সামন্তীয় সুযোগ-সুবিধাভোগীদের নানান রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বুর্জোয়াদের উচ্ছিষ্টভোগীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই মার্কসরা ইস্তাহারে বুর্জোয়াদের এই বিশ্বজয়ী ও দখলদারীত্বের নিয়ন্ত্রক ও কর্তৃত্ব মুলক অবস্থান ও ক্ষমতা বুঝাতেই যথার্থভাবেই এই একটি ছোট্ট শব্দ – "Possesses" ব্যবহার করেছিলেন খুবই যৌক্তিকভাবে ।

অবশ্য , যথার্থভাবে যদি এমনকি উল্লেখিত প্যারার অনুবাদও করতেন লেনিনবাদীরা , তবে- কারাত বাবু, ২০০৭ সালেও কি করে লিখবেন যে, ১৮৫৭ সালে, অর্থাৎ ইস্তাহার রচনার প্রায় ১০ বছর পরেও ভারতে " প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ" ছিল; অথবা, লেনিন মহোদয়রা কি করে দলীয় প্রস্তাবনায় লিখবেন যে, রাশিয়াতে খুব ভালোভাবেই পুরোনো " প্রাক পুঁজিবাদী ওয়ার্ডার" বিদ্যমান বলেই রাশিয়ায় একটি সাংবিধানিক নিশ্চয়তাপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে; অথবা, মাওসেতুঙ কি করে এই বলে শ্রেণী সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ করবেন যে, চীন হচ্ছে- আধা উপনিবেশ এবং ল্যান্ড ও ওয়ার লর্ডদের কর্তৃত্বাধীন আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ; অথবা এখনো নানান দেশের লেনিনবাদী বা মাও চিন্তা পন্থীরা কি করে – তাদের প্রণীত " জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" বা " নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" বা " জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব" ইত্যকার রণনীতি নির্ধারণে প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য হিসাবে " আধা " বা " নয়া" উপনিবেশিক এবং " আধা" , " সেমি" বা " ক্ষয়িষ্ণু" সামন্ততন্ত্র বলে, তদানুরূপ রাজনৈতিক কলা-কৌশল হাজির করবেন?

লেনিন-মাওদের খায়েশটা খুবই লক্ষণীয় যে, মার্কসরা বলেছেন -শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় মুক্তির শর্তে দুনিয়াময় সংগঠিত-ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর শোষক- বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত-উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়ায় অনিবার্যভাবে বিলুপ্ত হতে বাধ্য বটে স্বয়ং বুর্জোয়াদের দখলাধীন-নিয়ন্ত্রণাধীন সাবেকী পরজীবীরাও। কিন্তু, সেকাজটি না করে বিপরীতে লেনিনরা জাতীয় বুর্জোয়ার ফতোয়ায় শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যক্ষ শত্রু-শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত না করে বা তদার্থে আন্দোলন পরিচালনা না করে বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী

ঐক্যবদ্ধ না হয়ে কেবলই জাত-জাতি বিশেষের বা রাষ্ট্র বিশেষের সীমানায় দল বিশেষের আবরণে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম বা যুদ্ধ করবে- তারই প্রত্যক্ষ শত্রুর-আশ্রিত এবং শত্রু দুই-ই, সাবেকী পরজীবীদের বিরুদ্ধে -যাতে তাদের নিজ শত্রু- বুর্জোয়া শ্রেণীর আরো অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় তাকেই অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে আরো অধিকতর মাত্রায় শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতনের।

অথচ, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় লেনিনদের মতো বর্ণচোরা বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বলে শ্রমিক শ্রেণীকে মাত্রাতিরিক্তহারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে বাধ্য করে কেবল- আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সহ সামগ্রীকভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং, মাও-হোচি, কিম-ফিদেল-এরা সকলেই প্রাক বুর্জোয়া যুগের পছা-বাসী মতাদর্শিক আবর্জনাদি দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়ে ফারাও ডাইনেষ্টীর আভিজাত্যের সুযোগ-সুবিধাভোগী পরজীবী সমেত হালের মানবাধিকার কর্মী নামীয় এক বিশাল পরজীবী গোত্র বিনির্মাণে যেমন সহযোগিতা করেছে, তেমন ধর্ম ও ধর্মীয় প্রথার অনুশাসন মতো পরিবার-বিবাহ ও উত্তরাধিকার ইত্যাদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চয়তা বিধান সহ সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে যেমন নিজ নিজ রাষ্ট্রে তেমন অন্যান্য রাষ্ট্রে মোট কথা দাসত্বের বিধি-বিধান, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির এমনটাই পৃষ্ঠপোষকতা করছে বলে দুনিয়ার বহু দেশেই এখন পুঁজিবাদী সংকট হতে উত্তরণের একমাত্র পথ-পন্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে- ধর্মীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাইতো নানান দেশে নানান ধর্মের আবরণে সংগঠিত হচ্ছে নানান সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী ও দল।

যদিচ, বুর্জোয়া যুগের চাহিদা ও উপযোগিতা মতোই খোদ যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় রাষ্ট্র সমেত ইউরোপ-আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ ইতো:মধ্যে জাতিসংঘের বিঘোষিত - এল.জি.বি.টি'র নীতি কার্যকরণে এমনকি সেইম সেক্স ম্যারেজ ইত্যাদিকে আইনী রূপ দিচ্ছে। এবং এটিই পুঁজিবাদী সমাজের স্ববিরোধীতাপূর্ণ মতবাদিক বৈশিষ্ট্য।

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী -সাবেকী সামাজিক ব্যবস্থা ভাংগচুর করে ইতো:পূর্বেকার অধিপতি'র অবশিষ্টাংশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেও নিজের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় উপনীত হয়ে বিশ্বের দখলীস্বত্ব লাভকারী পুঁজিপতি শ্রেণী

নিজেই নিজের ব্যবস্থাকে টুকরো টুকরো করে ভেংগে চুরমার করে নিজেরাই নিজেদের অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করায় পুঁজিবাদ বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হয়েও ধ্বংস-বিলুপ্ত হতে অনিচ্ছুক পুঁজিপতি শ্রেণী ইতিহাসের গতিকে পেছনে ঘুরিয়ে সাবেকী মতাদর্শ সমেত সাবেকী পরজীবী, অধিপতি শ্রেণীকে সাথে নিয়ে অতীত আশ্রিত হয়ে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে গিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী সরাসরি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদের সমাধিখনক এবং পুঁজিপতি শ্রেণীরই সৃষ্ট ও শত্রুতামূলক সম্পর্কের শ্রমিক শ্রেণীর । ফলে, কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনাকালেই, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী ইতোপূর্বেকার সকল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর কর্তৃত্বকারী হয়েও সেই শ্রেণীর সহযোগে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক অবস্থান গ্রহণ করে শ্রেণী বৈরীতাকে সরলীকৃত করেছিল।

সুতরাং, মার্কসদের বিশ্লেষণ ও মতামত অনুযায়ী এরূপ সরলীকৃত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর মুখোমুখি যথার্থভাবেই শত্রুতামূলকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পুঁজিপতি শ্রেণীকে কবরস্ত করাই শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় বলেই পুঁজিপতিদের দয়া-দাক্ষিণ্যে পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধাভোগী, তবে দিল্লীর মোগল সম্রাট বা ঝাঁসির রানী প্রমুখদের মতো সুযোগ-সুবিধা হারানোর বেদনায় অসন্তুষ্ট বা কম্বোডিয়ার প্রিন্স সিহানুকদের মতো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে অধ:পতিত সামন্তশ্রেণীর কেউ যেমন শ্রমিক শ্রেণীর নেতা-মুক্তিদাতা হতে পারে না, তেমন ওরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ বা সন্মুখ সমরের দুশমনও নয়। অথবা, অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর অনিবার্য আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষ-শত্রু বৈ মিত্র হতে পারে না ইতিহাসে একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী- শ্রমিক শ্রেণীর। বরং পুন:পুন সংকটে বিপন্ন-বিপর্যস্ত বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অবসান ঘটাতে বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী, অন্তত, শিল্পোন্নত নেতৃস্থানীয় দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্যে সাম্যবাদের ভিত্তি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেই খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী যখন কবরস্ত হবে, তখন- পুঁজিপতিদের আশ্রিত বা পুঁজিবাদের পরগাছা বিশেষ সাবেকী শ্রেণীগুলো বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে পরগাছাসুলব মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য।

আর বৈশ্বিক পুঁজিবাদের পতনে ও পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিস্থাপনে সমাজতন্ত্র বৈশ্বিক না হওয়ার সুযোগ নাই। উপরন্ত, পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা ও সুরক্ষায় সৃষ্ট হালের বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফসহ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল, এবং রাষ্ট্রিক স্থায়ী

আমলাবাহিনী ও সেনা-পুলিশ ও কোর্ট-কাছারী ও কয়েদখানার আবশ্যকতা যেমন থাকবে না তেমন বেচাকেনার বিলুপ্তি অর্থাৎ শ্রম শক্তি বেচাকেনার পক্ষবিশেষ অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিক বলে কোন শ্রেণী থাকার সুযোগ রহিত হবে বলেই সমাজের সকলেই কেবলই মানবজাতির সদস্য হিসাবে পরিচিত হওয়া ছাড়া জাত-জাতির পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার কারণ নাই।

কাজেই, লেনিনদের " নিপীড়ত বুর্জোয়ার মুক্তি", বা মাওদের " মাতৃভূমি রক্ষা" বা "জাতীয় মুক্তি" বা কারাত বাবুদের " উপনিবেশিকতা হতে মুক্তি" বা " স্বাধীনতা" , ইত্যকার কোন নীতি শ্রমিক শ্রেণীর নীতি হতে পারে না। অথবা, "সেমি" " আধা" বা "ক্ষয়িষ্ণু" ইত্যকার সমান্ততন্ত্র উচ্ছেদে " নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" , বা " জনগণতান্ত্রিক" বিপ্লব সাধনের অজুহাতে আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষের সাথে মৈত্রী বা জোট গঠন করার যেমন সুযোগ নাই, তেমন একই হেতুবাদে "জনে জনে চক্রান্ত" বা " শ্রেণী শত্রুর গলা কাটার" অবকাশ , আর যারই থাকুক, কোনোমতেই বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নাই; এবং তেমনটা প্রয়োজনীয়তো নয়ই।

এমনকি, ব্যক্তি মালিকানার সহায়ক ও পক্ষে সহ জাত-জাতির নামে যে সকল মতাদর্শ , দর্শন বা ধর্ম বা নৈতিকতা বিদ্যমান তাও ব্যক্তিমালিকানা অবসানের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে বিলীন-বিনাশ কমিউনিজম সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এই: "But communism abolishes eternal truths, it abolishes all religion, all morality, instead of constituing them on a new basis; it therefore acts in contradiction to all past historical experience." And

" The communist revolution is the most radical rupture with traditional relations; no wonder that its development involved the most radical rupture with trditional ideas."

অর্থাৎ " কমিউনিজম চিরন্তন সত্যগুলোর বিলোপ সাধন করে, ইহা সকল ধর্ম, সকল নৈতিকতাকে বিলোপ করা বৈ তাদেরকে নতুন ভিত্তিতে গঠন করে না; অত:পর, অতীতের সকল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিপরীতে ইহা ক্রিয়াশীল। " এবং

" কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে প্রথাগত সম্পর্কগুলির সংগে এক্কেবারে আমুল বিচ্ছেদ; ইহার বিকাশে প্রথাগত ভাবনাগুলোর সহিত একেবারে আমুল বিচ্ছেদ হওয়াতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

কিন্তু, মমি সংস্কৃতির প্রবর্তক ফারাও ডাইনেষ্টির চরম ক্ষমতার কঠোর নিয়মের আধিপত্য পরম্পরার নীতি- ঐতিহ্য ও মুল্যবোধের চর্চাকারী বলেই ব্যক্তির মুক্তির পরিপন্থী ও চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পরম ক্ষমতার আধিপত্য পরম্পরার "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার", নীতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক শৃংখলার পার্টি বিশেষের আমৃত্যু ক্ষমতাধর বা অধিপতি এবং মরণোত্তর মমি হয়ে চিরন্তর অমর হয়ে থাকার সাংবিধানিকমুলে "ইর্টানাল প্রেসিডেন্ট"- কিম ডাইনেষ্টির প্রতিষ্ঠাতা কিম সহ অনুরূপ নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও অনুরূপ মুল্যবোধের চর্চাকারী এবং বস্তুবাদের নামে পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠা ও সমর্থন এবং কাল্টীয় কুসংস্কার লালন-পালনকারী লেনিন-ষ্ট্যালিন, মাও, হো-চি-মিন, পলপট-হোক্সা, টিটু-চসেস্কু, ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ, চে- ফিদেল, এবং দহল-কারাত প্রমুখ দলপতি-রাষ্ট্রপতি ও নানান স্তরের নানান রকমের পতিবৃন্দের ভোগ-দখলীয় ঘৃণ্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও তা-বজায় রাখার সুবিধার্থে উপরোক্ত প্যারার অনুবাদে মস্কো ও কলকাতা হতে প্রকাশিত ইস্তাহারে প্রায় একই রকম বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে বলে কেবলমাত্র মস্কোর অনুবাদ উল্লেখ করছি- " কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকে উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠন না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতাকেই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।" এবং

"কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সংগে একেবারে আমুল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সংগেও একেবারে আমুল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী। "

অর্থাৎ "চিরন্তন সত্যকে", বিলোপ সাধন নয়, " উড়িয়ে দেয়", যাতে লেনিন-মাওদের রাজত্বে -উড়ে যাওয়া সত্যটি পুন:স্থাপিত হতে পারে। কমিউনিজম, বৈজ্ঞানিক সমাজ বলেই তা গতিশীল-চলমান ও প্রাগ্রসরমান। তাই কমিউনিজম কেবল "ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী" নয়, বরং অতীতের সকল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিপরীতে ক্রিয়াশীল; এবং তাই খুব সহজভাবে এবং যথার্থভাবে "ক্রিয়া"এর বহুবচনে

“acts” যথার্থ ও উপযুক্তভাবে লিখা হয়েছে , কমিউনিস্ট ইস্তাহারে। তবু, উল্লেখিত অনুবাদাংশ দ্বারা কমিউনিজমের ক্রিয়াশীলতাকে অমান্য ও অস্বীকার করার জন্যই “acts” শব্দটি সুকৌশলে হাফিস বা গুম করা হয়েছে। আবার যদি বর্ণিত “ চিরাচরিত মালিকানা সর্ম্পকের সংগে” বিষয়টি যথার্থ ও ঠিক হতো বা তেমনটাই বুঝাতে চাইতেন মার্কসরা তবে তারা লিখতে পারতেন- “ with realtion of eternal ownership” ; কিন্তু, তা- তারা লিখেননি। তবে কি ইংরেজীতে অনুবাদকারী বা ইংরেজী অনুবাদের অনুমোদক মার্কসরা ইংরেজীতে আমার মতো আনাড়ি ছিল?

অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ ও বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় যতোই পুনরুৎপাদন করলো ততোই অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন হলো। আবার বিজয় করার মতো বা উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য অবশিষ্ট ছিল না ধরিত্রীর কোন দেশ। বরং, উল্টো উপনিবেশে সৃষ্ট নব্য পুঁজিপতি গোষ্ঠী নিজেদের পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে দেখতে পেলো খোদ উপনিবেশিক শক্তির পুঁজিপতি শ্রেণীকে। আবার উপনিবেশিক শক্তিগুলোও পরস্পরের উপনিবেশে অনুপ্রবেশের সুযোগ-সুবিধা লাভে উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণীকে স্বপক্ষভুক্তকরণে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার রাজনৈতিক আওয়াজ তুলে কার্যত উপনিবেশিক শক্তিগুলো বহু স্থানে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করে এবং সেই সুযোগে নানান উপনিবেশ নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। যুদ্ধের ফলে- উৎপাদিত পণ্য যেমন ধ্বংস হলো তেমন নতুন নতুন চাহিদার জন্ম হলো। তাতে মজুতকৃত পুঁজির সঞ্চালন সুযোগ হয়ে মন্দা আক্রান্ত পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের কিঞ্চিত সুবিধা হল। কাজেই, যুদ্ধ- পুঁজিবাদের অংশ ও বৈশিষ্ট্য। নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারাও সাবেক প্রভুসহ সামগ্রীকভাবে বিশ্বপুঁজিবাদের অংশীদার হয়ে এবং নিজেদের কর্তৃত্বে নিজ নিজ দেশে অবস্থিত শ্রমিক শ্রেণীকে অধিকতর মাত্রায় শোষণের সুযোগ লাভ করায়, সামগ্রীকভাবে সমগ্র পৃথিবীতে আরো অধিক হতে অধিকতর মাত্রায় অতিরিক্ত পরিমাণ পুঁজি উৎপন্ন হলো। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজির সংকট কমার বদলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজির সংকট আরো বেশী পরিমাণে যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমন উপনিবেশিকতা নীতির অকার্যকরতা নিশ্চিত হয়ে তা অবসানের পথ প্রশস্ত হল।

পুঁজিবাদের সংকটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি তীব্র আঘাত হেনেছিল প্যারী কমিউন- ১৮৭১ সালে। ইতিহাসে এই প্রথম তাবৎ পুঁজিপতি শ্রেণী তার মুখোমুখি দাঁড়ানো

শত্রুশ্রেণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিপন্ন হলো। প্যারী কমিউন বিনাশ ও দমনের গুন্ডামি- ফিস বাবত যেমন জার্মানী লাভ করলো বিশাল পরিমাণ অর্থ, তেমন প্রুশিয়াসহ একত্রীকরণের মাধ্যমে ১৮৭১ সালেই গঠিত হল জার্মান সাম্রাজ্য। ফলে- বিপদাপন্ন বৃদ্ধ পুঁজিবাদের সংকটে আরো অতিরিক্ত পুঁজি-পণ্য নিয়ে বিশ্ব বাজারে উপস্থিত হল বিপুল পরিমাণ পুঁজির বলে বলীয়ান জার্মানী। ফলে- পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় -বিশ্ব বাজার দখল-বেদখলে অনিবার্য হয়ে উঠলো একটি বড় ধরণের যুদ্ধ। যথারীতি- ১ম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো, আক্রমণকারী জার্মানী পরাজিত হলো, জয়ীরা আধিপত্য অটুট-অক্ষুন্নকরণে বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈশ্বিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করল লীগ অব ন্যাশন্স। অর্থাৎ কেবল মাত্র রাষ্ট্র বিশেষ বৈশ্বিক পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম নয় বলেই পুঁজির রক্ষক রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠলো লীগ। এতে রাষ্ট্রের এতোদিনকার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন-বিঘ্ন ও বিপন্ন হল।

ইতো:মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষে গড়ে উঠা কোম্পানি-মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অক্ষম-অযোগ্য কোম্পানির দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারাবাহিকতায় বিপন্ন পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আবশ্যকতা আরো প্রকটভাবে অনুভূত হলো ।

এমতাবস্থায় বিসমার্কের বন্ধু লাসালের অনুগামি জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট যারা ১ম আন্তর্জাতিকের নীতি-কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিতে ১৮৮৯ সালে গঠিত ২য় আন্ত র্জাতিকের অন্যতম উদ্যোক্তা; তারাই- ১৮৯৬ সালে ২য় আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেসে গ্রহণ করে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও জাতীয় মুক্তির নামে উপনিবেশ হতে মুক্তির তথাকথিত স্বাধীনতার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

ঐ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ও কার্যকরতায় লেনিনদের প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক পার্টি- ১ম বিশ্বযুদ্ধের হোতা - সংকটাপন্ন জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকটত্রাণে যেমন সহযোগিতাকারী, তেমন সংকটাপন্ন পুঁজির চাহিদা মতো রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠন করে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিশ্ব সেরা ও শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে গঠন করে তথাকথিত কমিউনিস্ট ৩য় আন্তর্জাতিক।

আবার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মান সম্রাট পালিয়ে গেলে বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়ল মিত্রশক্তির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে ভার্সাই চুক্তিতে সহি-স্বাক্ষর দিয়ে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল- একদা মার্কস-এ্যাংগেলসদের বন্ধুস্থানীয় তবে ১৮৭৫ সাল হতে লাসালীয় সমাজতন্ত্রীতে রূপান্তরিত বেবল-কাউৎস্কিদের জার্মান সোস্যাল পার্টি। এবং এরাই জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীকে কঠোর হস্তে দমন-পীড়ন করার জন্য প্রথম চোটেই খুন করেছিল একদা তাদেরই দলের নেত্রী, তবে ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষে অংশ গ্রহণকারী নিজ পার্টির ভূমিকার বিরোধী -রোজাদের; এবং ১৯১৯ সালে প্রণীত জার্মান সংবিধানে সংযুক্ত করে নাগরিকগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী ও বিরোধী " জরুরী আইন" - নামীয় এক জঘন্য বিধান, যা কার্যকরী করে ঐ সংবিধান প্রণেতাদের উত্তরসুরি বহু লেনিনবাদী কমিউনিস্টকে হত্যা-গুম ও বন্দী করেছিল হিটলার-১৯৩৩ সালে।

এসকল দুস্কর্ম সংঘটনে মরণাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রত্যক্ষ শত্রু – শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করণে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে যেমন ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়ানো আবশ্যক ছিল, তেমন শ্রমিক শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু বিজ্ঞানী মার্কসকে মানুষ নয়, দেবতা ও গুরু বানিয়ে গুরুর প্রধান শিষ্য হিসাবে রঙমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল "মহান নেতা"লেনিন।

অত:পর, মার্কসদেরকে অপমানিত করে তাদের উদ্ঘাটিক বৈজ্ঞানিক সূত্র -তত্ত্বাদিকে বিকৃত করে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভুল-ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা দেওয়া সহ খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে অসত্য-বানোয়াটি তথ্য উপস্থাপন করে, একদা উপনিবেশ আবশ্যকীয় হলেও হালে অতিরিক্ত পুঁজির সঞ্চালন ও পুনরুৎপাদনের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণীই উপনিবেশিকতার নীতিটিকে পরিত্যাগ করে তাদেরই সৃষ্ট লীগ অব ন্যাশন্সের তত্ত্বাবধানে দুনিয়ার সকল পুঁজির স্বার্থ রক্ষণে নতুন নতুন রাষ্ট্র জন্ম দিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কার্যত লীগের আওতায় এবং লেনিনদের ৩য় আন্তর্জাতিকের কর্তৃত্বে ও অধীনে- সমগ্র দুনিয়ার পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে ও পুঁজিপতিদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতির রাজনীতি- তথাকথিত জাতীয় মুক্তি বা নিপীড়িত বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তি বা উপনিবেশ হতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন বা এরূপ রাজনীতিকে দেশে দেশে বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে – নয়া গণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ইত্যকার বিপ্লবী বুলিবাগিশকতার আবরণে দেশে দেশে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন বা পুরনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইত্যাদি নামাকরণ করা হয়।

বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সৃষ্টি – দেশ ও জাতিহীন শ্রমিক শ্রেণীও পুঁজিপতি শ্রেণীর মতোই বৈশ্বিক এবং ঐতিহাসিক কর্তব্য তার– বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজের স্থলে বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে নিজের জন্য শ্রেণীগত সুযোগ–সুবিধা হাসিল নয়, বরং দুনিয়া হতে মানুষে মানুষে শোষণ বন্ধ করা এবং শ্রেণী বিভাজনের অবসান ঘটিয়ে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজির জালে বন্দী মানব জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা বলেই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিকল্পহীন– শর্ত হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য–সংহতি অর্জনে ও আন্দোলন সংগঠনে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিশ্ব সংগঠন। সেই ধরণের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা পুরণের লক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির ইস্ত াহার। পরবর্তীতে একই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি। কাজেই– কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে বৈশ্বিক এবং পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে "শ্রেণী"–প্রত্যয়কে, সমাধিস্তকরণই কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য–উদ্দেশ্য।

সুতরাং, মার্কসদের বক্তব্য মতো কমিউনিস্ট পার্টি যেমন দেশীয় বা রাষ্ট্রীয় নয়, বরং বুর্জোয়ারা যেমন ছোট ছোট বহু রাষ্ট্র গঠন করে দুনিয়াকে বহুধাভাবে বিভক্ত করে বহু সীমানায় সীমিত করতে অপতৎপরতা চালিয়েও কার্যত তারাই স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা–কর্তৃত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্রের অন্তিম হতে অন্তিমতর দুরাবস্থা নিশ্চিত করে কার্যত দেশগুলোর প্রকৃত সীমা অকার্যকর করে সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে সমগ্র দুনিয়ায় অবারিতভাবে গমনাগমন করবে– শ্রমিক নয়, পুঁজি ও পণ্য; তাই কার্যত পুঁজি–পণ্যের জন্য আর কোনো দেশ–রাষ্ট্রের সীমানা থাকলো না, তেমন চালাকি ও চাতুরালী নয়, কার্যত এবং সত্যি সত্যিই –দুনিয়ার দেশগুলোর, তথা সকল দেশের সীমানা মুছে দিয়ে ভূগর্ভস্ত সম্পদ সহ সমগ্র ভূখন্ড ও জল রাশি ভোগ–ব্যবহারে সমগ্র মানব জাতির অবারিত সুযোগ–সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সমগ্র দুনিয়াকে রাজনৈতিক ভাগ–বিভাজনের কবল হতে মুক্ত করে কেবলমাত্র একটি একক ধরিত্রী হিসাবে একত্রীত ও একীভূত করাই যেমন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান করণীয়, তেমন জাত–জাতির চিন্তা–চেতনা বিলীন ও বিলুপ্ত করাই কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য।

অথচ, দেশ–রাষ্ট্রের নামে পার্টি গঠন করে, জাতি মুক্তির নামে সারা বিশ্বে সংকীর্ণ জাতিয়তার প্রসার ও বিকাশ সাধন করে শ্রমিক শ্রেণীকে নানান জাত–জাতির অংশ গণ্যে শ্রমিক শ্রেণীর শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থাধীনে নিপতিত করে, জাতিগত বৈরীতা বৃদ্ধি

করে,নতুন নতুন জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার রাজনীতি করে তথাকথিত বিপ্লবের নামে হাজার-লাখো মানুষ খুন-জখম করে সংকটাপন্ন পুঁজির কেন্দ্রীভূত রূপ ধারণে রাষ্ট্রিকভাবে সহযোগিতা করে সমগ্র দুনিয়ার সমগ্র পুঁজির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় লেনিনবাদী-মাও চিন্তার অনুসারীরা শুরুতেই ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদের বৈশ্বিক ক্লাবে অংশ গ্রহণ করে। এখন সমগ্র বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণী একতাবদ্ধ বটে তাদের সমাজতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংস্থা ও সংগঠনের কর্তৃত্বে। অথচ, লেনিনবাদ-মাও চিন্তার ধারক-বাহক ও সুযোগ-সুবিধাভোগীদের বানোয়াটি ভুয়া কমিউনিস্ট পার্টির চোরাবালিতে আটকা পড়ে বা অনুরূপ রাজনীতির অন্ধকার কানাগলিতে বন্দী হয়ে স্বীয় মুক্তির পথ হারিয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে এবং ভাগ-বিভাগ হওয়ার ক্ষতিকর জাতিগত অন্ধ অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে পরস্পরের সাথে শুধু ঐক্য-সংহতিহীনই নয়, বরং কখনো কখনো বুর্জোয়াদের স্বার্থে ও বুর্জোয়াদের সৃষ্ট তথাকথিত জাতিগত দাংগা বা শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণী নিজেই নিজের সদস্যকে শত্রু গণ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্বয়ংঘাতি বিরোধে জড়িত-যুক্ত হচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পথে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিপন্ন ও মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে রক্ষা করতে গিয়ে লেনিনদের বানোয়াটি তথ্য-তত্ত্ব মূলে গঠিত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত খোদ লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন তদীয় কর্তৃত্বাধীন ব্লক সহ-ই যেমন এখন নেই, তেমন চীনে ব্যক্তিমালিকানা নাগরিকগণের অলংঘনীয় অধিকার, ভিয়েতনামে সকল দেশের পুঁজির নিশ্চয়তা বিধানসহ উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তাকৃত, বিশেষ অর্থনৈতিক জোনসহ বিবাহ-পরিবার এবং উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানা উত্তর কুরিয়ায়ও সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তাকৃত, কিউবায়ও ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষে নানান উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে, এবং একমাত্র কিউবা এখনো সদস্যপদ না পেলেও সমাজতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত অপরাপর সকল রাষ্ট্রই আই.এম.এফের সদস্য। তবে-বুর্জোয়াদের বৈশ্বিক রাজনৈতিক ক্লাব - জাতি সংঘের সদস্য বটে কিউবা।

অত:পর, বেচাকেনা আছে, মালিক-শ্রমিক আছে, ব্যক্তিমালিকানা আছে, উত্তরাধিকার আছে, সেনা-পুলিশ সহ আইন-আদালত ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র আছে, কমিউনিস্ট পার্টি নামীয় রাজনৈতিক দল ও কমিউনিস্ট নামীয় ক্ষমতাধর পরজীবী রাজনৈতিক আছে,

রাজনৈতিকদের চাটুকার ও স্তাবক আছে, ডিক্রি বা সংবিধানমূলে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বহাল তবিয়্যতে বহাল আছে, ব্যক্তি স্বার্থের প্রণোদনা চরমভাবে আছে, পুঁজি আছে, পুঁজিপতি আছে, শ্রমিক আছে, শোষণ আছে, শোষক আছে, শোষিত আছে, পরিবার আছে, জাতি আছে, জাতিগত সংঘাত আছে, দমন-পীড়ন ও অত্যাচার-নির্যাতন আছে, জেন্ডার বিরোধ-বৈরীতা আছে, দারিদ্রতা আছে, খুন-খারাবী আছে, বেশ্যাবৃত্তি আছে, শিশু শ্রম আছে, মতামত প্রকাশের সুযোগহীনতা আছে, পরমত দলন-পীড়ন আছে, মমি আছে, পূঁজা-অর্চনা আছে, মহাত্মার জন্ম-মৃত্যুদিবসের আচার-আচরণ ও সাংকীর্তন আছে, এবং এসবই ছিল ও আছে লেনিন-মাওদের রাষ্ট্রে এবং সর্বোপরি আছে বিশ্ব পুঁজিবাদের বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে।

সমাজতন্ত্রের অজুহাতে এ সকল দুস্কর্ম সংঘটনে- কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুবাদেও যে লেনিনবাদীরা কারসাজি করেছে এতে কোনো সন্দেহ থাকারও সুযোগ রাখেনি লেনিনবাদী-মাওপন্থী মোড়লরাই, যারা অনুরূপ বিকৃতি ও জালিয়াতি এবং কারসাজির - সুবিধাভোগী।

অথচ, সকল ধরণের পরজীবীতার অবসানে ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদের অবসানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বিবৃত এই: " When, in the course of development, class distinctions have disappeared, and all production has been concentrated in the hands of vast association of whole nation, the public power will lose its political character. Political power, properly so called, is merely the organized power of one class for oppressing another. If the proletariat during it contest with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to organize itself as a class, if, by means of revolution, it make itself the ruling class, and as such, sweeps away by force the old conditions of production, then it will alone with these conditions, have swept away the conditions for existence of class antagonism

and of classes generally, and will thereby have abolish its own supremacy as a class.

In place of the old bourgeoisie society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association in which the free developmet of each is the condition for the free development of all."

মস্কোর অনুবাদে–" বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে,সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (public) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। যথার্থভাবে অভিহিত রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে লড়াইয়ের অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে এবং শাসক শ্রেণী হয়ে উৎপাদনের পুরনো অবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তা হলে সেই পুরনো অবস্থার সংগে সংগে শ্রেণী-বিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দুর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যের অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সম্বলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।"

কলকাতার অনুবাদও দুয়েকটি শব্দ চয়ন বা ব্যবহারের তারতম্য ছাড়া একই রকম। লক্ষ্যণীয়, শেষ বাক্যটি যে ভাবে বিবৃত হয়েছে তাতে, যেন মনে হতে পারে যে, সমাজতন্ত্র যখন ভবিষ্যতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন পুরনো হয়ে যাওয়া বুর্জোয়া সমাজের স্থান নিবে একটি সমিতি। অর্থাৎ- বুর্জোয়া সমাজ এখনো পুরানো নয়, বা ইস্তাহারে যে, ইতো:পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়েছে বুর্জোয়াদেরই তৈরী উৎপাদন শক্তির আধিক্য, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী আর টিকতে পারছে না, নিজেও নিজের মালিকানার রক্ষা করতে পারছে না; 'নিরাকরণের নিরাকরণ' প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়াদের কেউ কেউ পরিণত হচ্ছে শ্রম- শক্তি

বিক্রেতায়, এবং অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের সংকট-সমস্যা হতে রেহাই পেতে তারা বাধ্য হয়, প্রতিযোগিতা নয়- সামাজিকতায়, যা-পুঁজিপতির জন্য স্বার্থহানিকর হলেও সামাজিক শ্রমে সৃষ্ট পুঁজির সামাজিকতার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা মানতে বাধ্য হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজেরই বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে একদিকে যেমন তার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় উপনীত হওয়ার কারণে অন্যদিকে, তেমন পুঁজিপতি শ্রেণী- নিজ উৎপাদিত পণ্যই ধ্বংস করতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি করেও ভবিষ্যতে উৎপাদনের অতিরিক্ত সংকট যেন সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তদানুরূপ চুক্তি সম্পাদন করে ও সেই সকল চুক্তি বাস্তবায়নে ইতো:মধ্যে বা সম্প্রতিকালেও বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি সহ যে সকল সংস্থা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মেইন্টেনেন্স কষ্টই কেবল বাড়ে তাই নয়, পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যই আরো নতুন নতুন সমস্যা-সংকট জন্ম হয় বলেই অনুরূপ সংকটে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবলীলা সংঘটিত করে বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠা করেও সংকট-সমস্যা ও মন্দা হতে রেহাই পায়নি বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণী; এবং পুঁজিপতি শ্রেণীই পুঁজিবাদী সমাজকে ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে সমাজকে লম্বালম্বিভাবে – বুর্জোয়া ও শ্রমিক, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ-বিভাগ করেছে, অতীতের অধিপতি শ্রেণী যেমন ইতিহাসের ধারায় বিলীন হয়েছে তেমন বুর্জোয়া শ্রেণীও নিজের বিলুপ্তির শর্ত তৈরী করেও তা স্বীকার বা কার্যকরণে বাঁধা সৃষ্টি করতে " চিরন্তন সত্য" বা অপরিবর্তনীয় সাবেকী নীতি-নৈতিকতা বা ধর্ম-দর্শনের আশ্রয় নিতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক একদা বিতাড়িত-পরিত্যক্ত চার্চ ইত্যাদির পরিপোষণেও লজ্জিত না হয়ে নিজেকেও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে নিপতিত করে, অতীত আশ্রিত হয়ে নিত্যই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলেই মার্কসদের কালেই অর্থাৎ ইস্তাহার রচনার কালেই বুর্জোয়া সমাজ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পুঁজিবাদের এই জরাজীর্ণতায় পরিপূর্ণ বার্ধক্যাবস্থার অনিবার্য পরিণতি-সমাজতন্ত্র , এটিই ছিল কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রতিপাদ্য। এবং পুঁজিবাদ এরূপ বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত না হলে পুঁজিবাদের মৃত্যু পরোয়ানা- এই, কমিউনিস্ট ইস্তাহার, রচিত হতে পারতো না।

স্ববিরোধীতায় ও স্ববৈরীতায় ভরপুর শ্রেণীচরিত্রের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকটকালীন ত্রাণকর্তা মি: লেনিনও তাই স্ববিরোধী চরিত্রের না হয়ে পারেন না বলেই, মার্কসের খাঁটি রুশী শিষ্যদের মোড়লত্বের দাবীদার মি: লেনিন একদিকে মার্কসদের পুঁজিবাদী সমাজ দেখার

অসম্পূর্ণতা স্বপ্রমাণে লিপ্ত হয়ে 'ইস্তাহার' রচনার সময়েতো নয়ই, মার্কস-এ্যাংগলেসের জীবৎকালেও নয়, বরং পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ পর্যায়- সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়েছে- ১৯০৩ সালে , মর্মে ১৯১৬ সালে লিখে, ১৯১৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশ করেছিলেন একটি জগদ্বিখ্যাত প্রতারণামুলক ও আবর্জনা তুল্য মহাপুস্তক। এটিও লিখিত হয়েছিল তার নিপীড়িত জাতির মুক্তি নিশ্চিতির নিমিত্তে পুঁজিবাদী সমাজের ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে লম্বালম্বি ভাগ হওয়ার পরিবর্তে কতিপয় নিপীড়ক ও অধিকসংখ্যক নিপীড়িত জাতিতে সমগ্র দুনিয়াকে ভাগ করার ভুয়া-ভ্রান্ত ও চাতুরালীমুলক ফতোয়াদিকে জায়েজ করার নিমিত্তে।

কিন্তু, লেনিনের নিজস্ব একটি সাম্রাজ্য হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়াব্যাপী অনুরূপ লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক গঠন ও তার মাধ্যমে দুনিয়ার দেশে দেশে লেনিনবাদ সহ লেনিনবাদী পার্টি -রপ্তানী করে, জাতি- মুক্তির নামে দেশে দেশে- জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধনের অজুহাতে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর মুক্তি সাধনের মাধ্যমে দুনিয়ার বেশীরভাগ দেশে পুঁজির আরো বিকাশ ঘটানোর যে রাজনৈতিক লাইন এযাবৎ লেনিনবাদী-মাওপন্থীরা কার্যকর করে আসছে এবং কার্যত অতিশয় বয়োবৃর্ধ পুঁজিবাদই - স্বীয় সংকট-সমস্যা নিরসনে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো ভেংগে বা উপনিবেশ হতে উপনিবেশিক শক্তিকে উঠে এসে নতুন নতুন তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ার অসংখ্য রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিকে সামগ্রীকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণে বিশ্বব্যাংক সহ এত রকমের নানান বৈশ্বিক সিন্ডিকেট ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে, সকল দেশের সকল জাতির উপর বৈশ্বিকভাবে খবরদারী-নজরদারী করাসহ ঐ সকল রাষ্ট্র গুলোর শ্রমিক শ্রেণীকে পুর্বের তুলনায় অধিক হতে অধিকতর হারে শোষণ -পীড়ন ও নির্যাতন করছে।

কিন্তু, তাতে আদৌ জাতি বিশেষের মুক্তি সাধিত হয়েছে কি? না কি, ইতিহাসের গতিপথে বিলীয়মান জাতিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে জোর-জবরদস্তিমুলে বজায় রাখার জন্য দেশে দেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির হামলা - আগ্রাসনের বিরতিহীন অভিযোগ উত্থাপনসহ নানান জাতিগত পরিচয় বানোয়াটিমুলে বিনির্মাণের কৌশলে সাবেকী রাজা-বাদশা নামীয় দেব-দেবতাদের গুণকীর্তণ করা হচ্ছে ? এমনকি, ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যারিষ্টার ও ধর্মে অবিশ্বাসী শিয়া পরিবারে জন্ম নেওয়া জিন্নাহ যেমন " দ্বিজাতী"

তত্ত্বের প্রবক্তা বনে গেলেন, তেমন ভারতীয় মহাত্ম আরেক উকিল করমচাঁদ গান্ধীও তা মেনে নিয়ে কবি রবি বাবুর ভালোবাসার ‘ বাংলা” ভাগ করাসহ ভারত বিভক্তিতে গররাজি নয়, বরং উৎসাহ ভরে তা কার্যকরীকরণে ও ইংরেজ সৃষ্ট সেনাবাহিনীও ভাগ বিভাগ করেছেন আরেক বস্তুবাদী রাজনৈতিক পন্ডিত নেহেরুজী।

অথচ, জাতিগত মুক্তি অর্জন বা জাতিতে জাতিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহীত নয়,বরং বেড়েছে এবং সকল দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যেকার সংকীর্ণ বা স্ব-স্ব স্বার্থে বিরোধ-বৈরীতা স্বত্ত্বেও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে তীব্রভাবে শোষণ-শাসন করার জন্যই যেমন একদিকে, এ সকল নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং রাষ্ট্রগুলোর সমবায়ে বৈশ্বিক সিন্ডিকেট গঠন করেও নানান ধরণের বহুজাতিক করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে, জাত- জাতি বা দেশ বিশেষের পরিচয় নয়, পুঁজিবাদীদের বৈশ্বিক ক্লাবে অংশীদারীত্বের মানদন্ড- পুঁজির মালিকানার পরিমাণ ।

অত:পর, প্রায় উপনিবেশ হীন তথাকথিত জাতীয় মুক্তির দুনিয়ায় বা লেনিনীয় সাবেকী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাবেকী সাম্রাজ্য অটুট- অক্ষুন্ন না থাকলেও দুনিয়ার নানান জাতির শ্রমজীবী মানুষের বা কথিত জাতি বিশেষের জাতিগত আর্থিক অবস্থাটা কিঞ্চিত বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সি.আই.এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের হাল নাগাদ তথ্যমতে- ২০০৮ সালে লাইসটেন্সটিয়ান এর বার্ষিক মাথা প্রতি গড় আয়- ১৪১,১০০ মার্কিন ডলার, বিশ্বে ১ম স্থান, আর ২০১০ সালেও দুনিয়ার ২২৭ ও ২২৮ স্থান লাভকারী কংগো ও বুরোন্ডির মাথা পিছু বার্ষিক গড় আয়- ৩০০ মার্কিন ডলার; এবং ঐ সালেই ঐ পাকিস্তানী জাতির জনক জিন্নাহ’র পাকিস্তান-৭৯ নম্বর স্থান লাভ করে অর্জন করেছে- গড়ে জনপ্রতি বার্ষিক-২,৪০০মার্কিন ডলার, ৬৩ স্থানের অধিকারী ভারতে- ৩,৪০০মার্কিন ডলার, ‘আংকেল’ হোচিমিনের ভিয়েতনামে-৩,১০০ মার্কিন ডলার, ৯০ নম্বরে অবস্থিত কিম ডাইনেষ্টির উত্তর কুরিয়ায়- ১,৮০০ মার্কিন ডলার, ২০৮ নম্বরের নেপালে- ১,২০০ মাকিন ডলার, আর বাংলাদেশ ৯৬ নম্বর স্থান লাভ করে বার্ষিক জনপ্রতি গড়ে আয় করেছে-১,৭০০ মার্কিন ডলার।

আবার, ২০ আগষ্ট, ১৯১৮ সালে “ মার্কিন শ্রমিকদের নিকট পত্র” - মি: লেনিন যেমন লিখেছিলেন-“ তেমনি একটি মহান, সত্যিকারের মুক্তিসাধক, সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ

থেকেই নতুনতম সুসভ্য আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে।" রূপ মহান মুক্তির মহান জাতির মহান আমেরিকার ২০১০ সালের অবস্থাটাও সি.আই.এ ফ্যাক্টবুক হতে কিঞ্চিত জানা যেতে পারে– সারা দুনিয়ার ষ্টক মানির পরিমাণ– ৭৪.১৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা–১২.৩৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাথা প্রতি গড়ে আয়– ৪৭,৪০০ মার্কিন ডলার, লেবর ফোর্স–১৫৪.৯মিলিয়ন, বেকারত্বের হার–৯.৭%, ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিঙয়ে–১০৬, দ্রারিদ্র সংখ্যার নীচে ১২%। এবং ঐ ফ্যাক্টবুকেই বিবৃত আছে যে, আমেরিকার ৮০% জনের নিকট খুব একটা সম্পদ না থাকলেও ২০% এর জনের নিকট কেন্দ্রীভূত হয়েছে অধিকাংশ পরিমাণ সম্পদ। ঠিক যেমন, দুনিয়ার পুঁজি, কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আমেরিকায় এবং পুঁজির এই কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ায়ই ইংলন্ড হতে পৃথক হয়েছিল লেনিনের মহান আমেরিকা, যারা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল অংগরাজ্য বিশেষ। এখনো গোটা দুনিয়ার ১২–১৩শত বিলিয়নিয়ারের মধ্যে একা যুক্তরাষ্ট্রেরই আছে– প্রায় ৫০০।

পুঁজির জোরেই বিশ্বব্যাংক–আই.এম.এফের ৫ প্রধান পরিচালকের মধ্যে মুলত ও মুখ্যত প্রধান পরিচালকের দায়–দায়িত্ব লাভে সফল হয়ে দুনিয়ার পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে সারা দুনিয়ার জাতিগত মুক্তি, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, গণসংগ্রাম, সন্ত্রাস দমন ইত্যকার যাবতীয় বিষয়াদি দেখ–ভাল করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব যখন–যেখানে প্রয়োজন মনে করে সেখানেই শুধু সামরিক–আক্রমণই নয়, রাত–বিরাতে বেসামরিক এলাকায়ও মনুষ্যহীন যুদ্ধ বিমান হতে বেপরোয়া বোমা হামলা ও মানুষ হত্যা করা ইত্যাদিকে বিশ্বনেতৃত্বের বৈশ্বিক দায়িত্ব–কর্তব্য হিসাবে জোরে সোরে প্রচার করতেও লজ্জিত হয় না।

অত:পর, লেনিনের ঘোষণামতো আমেরিকার মহান জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধ করে মহান মুক্তি হাসিল করলেও তখনো আমেরিকায় যেমন ক্রীতদাস প্রথা ছিল, এখনো আমেরিকার মজুরী–দাস প্রথা অর্থাৎ শ্রমিকরা পুঁজির কঠোর দাসত্বে যেমন আবদ্ধ–বন্দী তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের উপকরণ বিশেষ মাত্র। সুতরাং, উল্লেখিত তথ্যাদি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত যে, জাতিগত মুক্তি হাসিলের লেনিনীয় ভুয়া তত্ত্ব দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিতো নয়ই, সামান্যতম সুবিধা হয়নি ও হওয়ার সুযোগ–সুবিধা নাই, বরং ঘটেছে ভয়ানক ও মারাত্মক ক্ষয়–ক্ষতি।

মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও সংকটাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত লেনিন,যদি পুঁজিবাদের বৃদ্ধাবস্থা ও পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি, যা- ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে , তা কবুল করে নেয়, তবেতো, ১৯০৩ সালকেই পুঁজিবাদের বার্ধক্যাবস্থা নির্ধারণ করতে পারতো না। আবার, ১৯০৩ সালেই পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে বার্ধক্যাবস্থায় উপনীত হয়েছে বলেও বৃদ্ধ পুঁজিবাদের চিকিৎসাস্বরূপ- রাষ্ট্রীক পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, জাতীয় মুক্তি ও উপনিবেশ হতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন, ইত্যকার নানান টোটকা- মাধুলি বা প্রয়োজনে সেনা শাসনের একক ক্ষমতাধর ক্ষমতাধিপতির নিয়ন্ত্রণের ফতোয়াদির মাধ্যমে অসম বিকাশের পুঁজিবাদী সমাজের অনুন্নত অঞ্চল বিশেষে জাতীয় পুঁজি বিকাশের অজুহাতে পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল বাড়াতে সক্ষম ও সফল না হত, তবেতো শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি অর্জিত হতো , এবং তাতে সংকটাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী –বৈশ্বিকভাবেই সংগ্রামি ও মুক্তিকামী শ্রমিক শ্রেণীর নিত্য- নৈমত্তিক প্রতিরোধী হামলা-আক্রমণের শিকার হয়ে নিশ্চিতভাবে কবরস্ত হতো । তাইতো, ইস্তাহারের উল্লেখিত ইংরেজী অংশের শেষ বাক্যের অনুবাদ- " শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধপূর্ণ পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমাদের হবে এক সমিতি, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ। " না করে, লেনিনদের অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিত্রার্থকরণে – " পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে" বিবৃত করে – ইস্তাহার রচনা কালেই পুরনো হয়ে পড়া বুর্জোয়া সমাজ নয়, বরং লেনিনের চিত্রিত ও ব্যাখ্যাত বুর্জোয়া সমাজ ষোলকলায় ভবিষ্যতে পুরনো হবে রূপ ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

আবার, উপরোদ্ধৃত প্যারাই বলা হয়েছে যে -" রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শক্তির সংগঠিত ক্ষমতা মাত্র।" এবং সমাজতন্ত্রে অর্থাৎ সমস্ত উৎপাদন যখন সমাজের সকলের "এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা আর থাকবে না।" এবং লেনিন নিজেও রাষ্ট্রের অনুরূপ অত্যাচারী ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারেনি বলেই " রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তকে লিখেছেন – "রাষ্ট্র হল নিপীড়িত শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার।"

তবু, ইস্তাহারের ঘোষণা মতে– পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে প্রতিস্থাপিত- সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিলোপসহ অনুরূপ সামাজিক সমিতির ব্যবস্থাপনার নীতি, অমান্য-

অস্বীকার ও অকার্যকর করে বা রাষ্ট্র বিশেষের গন্ডীতে অনুরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ না থাকলেও , এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং টিকে থাকাও সম্ভব এমন নিশ্চয়তাপূর্ণ ফতোয়াবাজ - খোদ লেনিন যেমন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানিক সংবিধান পরিষদ গঠনের অংগীকারে বলশেভিক পার্টি গঠন করেছিল, এবং সমাজতন্ত্রের নামে কার্যত এক সেনা স্বৈরতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, প্রতিশ্রুত সংবিধান সভার প্রণীত নয়, বরং জনগণের নির্বাচিত সংবিধান সভাকে স্বীয় পুর্বেকার ঘোষণা মতো স্বীয় অবৈধ সরকারের অবৈধ ক্ষমতা বলেই অবৈধভাবেই বাতিল করে , তদস্থলে লেনিনের নিজেরই প্রণীত ১৯১৮ সালের সংবিধান দ্বারা। আবার , বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্রের স্ব-বিরোধীতাপূর্ণ স্বভাবের কারণেই, খোদ লেনিন স্বয়ং নিজের প্রণীত সংবিধানকেই অকার্যকর ও গুরুত্বহীন এক কাগুজে বস্তুতে পরিণত করেছিল – নিউ ইকোনোমিক পলিসি সহ অনুরূপ নানান ডিক্রি জারী করে। মাও সেতুঙও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে তার দ্বারা ঘোষিত ও চিহ্নিত জন শত্রু নিধন-দমনে ভয়ংকর ভাবে ব্যবহার করেছে কেবল চীনা রাষ্ট্র নয়, সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিও। ভিয়েতনাম, কিউবা , ভারত , বাংলাদেশ সহ প্রায় সব দেশের লেনিনবাদী বা মাও পন্থীরা ঘোষণা করছে- ক্ষেত্র বিশেষ রাষ্ট্রের আরো গণতান্ত্রিকীকরণ, বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারতায় বুর্জোয়াদের প্রণীত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান বা ' রাষ্ট্র সবার, ধর্ম যার যার', এই ধরণের নানান গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের। অথচ, রাষ্ট্র যদি সবার হয়, তবে খোদ লেনিন ও মাওয়ের বক্তব্য যেমন একদিকে অস্বীকৃত হয়, অন্যদিকে লেনিন-মাওরাও অনুরূপ স্ববিরোধী কাজ করার দায় হতে রেহাই পাওয়ার সুযোগ নাই বলেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারের এতদসংক্রান্ত বক্তব্য বা নীতিমালা মোতাবেকই কেবল নয়, বরং লেনিন-মাওদের বক্তব্য অনুযায়ীও স্বয়ং লেনিন-মাও যেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার দায়ে অপরাধী, তেমন হালের লেনিনবাদী-মাও পন্থী নানান নামীয় নানান পতিরাও তদার্থে দায়মুক্ত নয়।

তাছাড়া, রাষ্ট্র যদি সবার হয়, তবে সম্পত্তির মালিকানা কার ? অথবা, রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক হয়, অর্থাৎ সকলের হয় বা বুর্জোয়াদের ঘোষণা বা লিখিত সাংবিধানিক নীতি মতো সকলকে আইনের দৃষ্টিতে সমান হিসাবে গণ্য ও গ্রাহ্য করে এবং সকলেই যদি হয় রাষ্ট্রিক সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী তবে সমাজতন্ত্রের আর আবশ্যকতা থাকে কি? অথচ, প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র কখনো এরকম সমান আচরণ করেছে বলে

প্রমাণ যেমন নাই, তেমন লেনিন-মাও, হোচিমিন, কিম বা ফিদেলরাও প্রমাণ করেছেন যে, তারা সাংঘাতিকভাবে দমন-পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছেন, এমনকি একদা সহযোগী-সাথী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপরও। তবু, এমন সোনার পাথরবাটি রূপ রাষ্ট্র বিনির্মাণের দিবাস্বপ্ন বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আরো গণতন্ত্রায়ন, গণতান্ত্রিক সংবিধান ইত্যকার মতামত ইত্যাদি দ্বারা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র অস্বীকার করছেন, অন্যদিকে রাষ্ট্রের জন্মের আবশ্যকতা বা জন্ম রহস্যকে রহস্যাবৃত করে রাষ্ট্র বিনাশের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার চক্রান্তে -ষড়যন্ত্রে সাড়ম্বরে যোগদান করে লেনিনবাদী-মাওপন্থী কমিউনিস্টরাও কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার বিনাশ তথা রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে সমাজতন্ত্র তথা ইস্তাহার উল্লেখিত রূপ সমিতি প্রতিষ্ঠার বক্তব্যকে অস্বীকার করছেন না ?

উপরন্ত, দাসত্বের অনুশাসন-ধর্মকে যার যার বলে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে, সমাজে বুর্জোয়া মানসিকতার সাথে দাসত্বের প্রবণতাকে উস্কানোর মতো বিষয়কেও তথাকতিত গণতন্ত্রের সাথে যুক্তকারী লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও যদি , গণতান্ত্রিক ভোটাভোটিতে ভোট প্রাপ্তি সমেত দাসত্বের রাজনীতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেও কমিউনিস্ট হয় তবে, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে যে বলা আছে- " The Communists disdain to conceal their views and aims.They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. " অর্থাৎ- কমিউনিস্টরা তাদের মতামত-লক্ষ্য গোপন করাটাকে অসন্মানজনক মনে করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তাদের অভিষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র বিদ্যমান সকল সামাজিক শর্তগুলোর বলপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমে। " তা-হলে ধর্মের স্বীকৃতিকারী সহ রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন বা রাষ্ট্রকে সকলের সমান অংশীদারীত্বের প্রতিষ্ঠান বানিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে ভুয়া ধারণা প্রচার ও প্রসারকারী এবং বক্তিমালিকানা সহ সমাজের সকল শর্তাদি অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের বিদ্যমান সকল সামাজিক শর্তাদির বিনাশ-বিলুপ্তি না ঘটিয়েই নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করে কল্পিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকারীরা কেউ-ই ইস্তাহারের অত্র নীতিমালা মূলে কমিউনিস্টতো নয়ই, নিদেনপক্ষে, সন্মানিতজন হিসাবেও গণ্য হওয়ার যোগ্য?

তবে, পুঁজিবাদী সমাজের বার্ধক্য নিয়ে বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন ও মাওরা যত ফতোয়াই জারী করুক না কেন, কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বক্তব্য যে,কল্পিত বা বানোয়াটি নয় বা যথার্থভাবেই পুঁজিবাদের বার্ধক্য সমেত পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী বিরোধ-বৈরীতায় অতি উৎপাদন সংকটেই পুঁজিবাদী সমাজ তার সকল বৈশিষ্ট্য ও প্রথা-রীতি এবং আচার-আচরণাদি সমেত কবরস্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্বেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতো-কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায়-ফে.এ্যাংগেলস জানিয়েছেন- " That the history of these class struggels forms a series of evolutions in which, nowadays, a stage has been reached where the exploited and oppressed class –the proletaiat-cannot attain its enamcipation from the sway of the exploiting and ruling class – the bourgeoisie – without, at the same time, and once and all, emancipating society at large from all exploition, oppression, and class distiction, and class struggles."

না, লেনিন,মাও, হো-চি, কিম,ফিদেল বা কারাত বাবুরা যেমন বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর জন্যই আগে জাতিগত মুক্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটন করতে হবে প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার মধ্যে, তার পর , আসলে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক উচ্ছেদকৃত ভূমিহীনদেরকে পুনরায় ভূমিতে বেঁধে পুঁজিবাদী মালিকানার প্রতি মোহগ্রস্ত করে চিন্তা-চেতনায়, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা বিরোধী , কেবলই ব্যক্তিমালিকানার মধ্যে নিজের উন্নতি ও নিশ্চয়তা খুঁজে খুঁজে বিশ্ব পুঁজিবাদের শোষণের খোরাক হয়ে ক্রমেই নি:স্ব হতে নি:স্বতর হবে, মাওদের মতো সূর্যের আলোয় আলোকিত হবার জন্য নিজেই স্বৈরতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতায় জ্বলে-পুড়ে খাক হবেন, অথবা, মহান শিক্ষকদের শিক্ষা অনুযায়ী, মাতৃভূমির জন্য প্রাণপাত করবেন, আবার , জেন্ডার সমতার নামে লেনিনীয় বুলিতে নারীকেও ক্ষমতায়নের নামে ব্যক্তিমালিকানা বা তদানুরূপ বোধের প্রতি আকৃষ্ট ও মোহগ্রস্ত করে কার্যত, মুক্তির প্রতিবন্ধক ব্যক্তিমালিকানার প্রতি মোহান্ধ করে সামগ্রীকভাবে মুক্তি সম্পর্কে মারাত্মক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে 'ক্ষমতায়ান' তথা ব্যক্তিমালিকানার হাজারো দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষের পথে নারীকে ঠেলে দিয়ে এমনকি সম্পত্তিহীন নারীদের মধ্যেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পতন-বিলীন ও বিলুপ্তির চিন্তা-চেতনা তিরোহীত

করে কেবল পুরুষ বৈরীতার যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ-বৈরীতা বাড়িয়ে তুলে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত ঐক্য-সংহতির পথে মারাত্মক বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বুর্জোয়া সমাজের বিনাশ ব্যতীত মুক্তি অর্জনের ন্যূনতম সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও ভুয়া মুক্তির ভুয়া স্বপ্নের মায়াজালে আটক করে ভয়ানকভাবে নিংড়ে নিবে নিরক্ষর নির্বিশেষে সকল নারীর শ্রমও বিশ্ব পুঁজিবাদ। অথবা শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণকে বিবাহ-পরিবার ও উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান সহ তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষের দাসে পরিণত করলেও এমন সমাজতন্ত্রের কোনো কল্পনা মার্কস যেমন করেননি তেমন ১৮৮৮ সালেও যে, এ্যাংগেলস করেননি, তাতো উপরোদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারাই নিশ্চিত হয়। বরং, ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " In short the Communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things. In all these movements, they bring to the front as the leading question in each, the property question, no matter what its degree of development at that time." অনুবাদে- "সংক্ষেপে, প্রচলিত সমাজ ও রাজনৈতিক শৃংখলার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সর্বত্র কমিউনিস্টরা সমর্থন করে। এই সকল আন্দোলনে তারা সম্পত্তির প্রশ্নটিকেই মুখ্য প্রশ্ন হিসাবে সামনে নিয়ে আসবে, সেই সময়ে তার বিকাশের মাত্রটা কতটা তা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়।" অর্থাৎ স্থান-পর্যায় নির্বিশেষ সর্বত্র ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের জন্যই কমিউনিস্টরা ক্রিয়াশীল।

অথচ, লেনিন-মাওরা পুঁজিবাদের অসমতার প্রশ্ন তুলেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার প্রতি মোহান্ধতা সৃষ্টি করে ভূমিহীনদের জমি দান বা ভূমিতে বর্গাচাষীর স্বত্ব-স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠার বাহানায় কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে জাহির করে, বা রাষ্ট্রিক মালিকানাধীন সম্পত্তিকে ভুয়াভাবে জাতীয় সম্পত্তি গণ্যে তা রক্ষণা-বেক্ষণে প্রত্যেককে দায়-দায়িত্ব বহনে নৈতিকভাবে প্ররোচিত করা, ইত্যকার নামে গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সমাজতন্ত্রের মুলা দেখিয়ে কার্যত সেবা করছে , বাঁচিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিমালিকানাজনিত মুল্যবোধের, তাতে সামগ্রীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী।

ভূমি নাই যার, তার আবার পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি প্রেম! দেশ নাই যার তার আবার দেশপ্রেম! মজুরি দাস শ্রমিকও তার শ্রম শক্তি বেচাবিক্রির জন্যই আর দশটা পণ্যের মতোই বাজারে যেতে হয় এবং পুঁজিবাদী সমাজের পণ্যের বাজারে আর দশটা পণ্য যেমন জাত-জাতি বা দেশ-রাষ্ট্রের গন্ডীতে সীমিত হলে চলে না, তেমন শ্রমিককেও দেশ-বিদেশের মায়া-টান বা প্রেমে অন্ধ থাকলে শ্রম শক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকার দুর্ভোগ বাড়ে । উত্তর কুরিয়া-চীন যতোই বন্দী করে রাখতে চায় , তবু সুযোগ পেলেই চীন-কুরিয়ার শ্রমিক তার শ্রমের অধিক মুল্যের আশায় দেশান্তরী হয়। তবে যেখানেই বিক্রি করুক বা যার কাছেই বিক্রি হোক, তাতে খুব একটা হেরফের হয় না শ্রমিকের চরিত্রের। কারণ- সর্বত্রই তার একটাই যোগ্যতা, আর তা হচ্ছে মুল্য এবং অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত-মুল্যও উৎপন্ন করা বলেই শোষক, তা দেশী-বিদেশী, জাতীয়-বিজাতীয়, সম বা বিপরীত লিংগধারী, বা ব্যক্তি বা কোম্পানি বা রাষ্ট্র নির্বিশেষে যেই ক্রেতা হোক শ্রম শক্তির, তারা- প্রত্যেকেই উদ্বৃত্ত-মুল্য আদায়-উশুল করেই শ্রমিকের মজুরি দেয় বিধায় সর্বত্রই শ্রমিকের চরিত্র একই এবং পরিচয়ও একটাই - সে কেবলই শ্রমিক এবং শ্রমিক বলেই শোষিত-পীড়িত ও নির্যাতিত। কাজেই, দেশ-জাতি নাই শ্রমিকের তাই জাতি প্রেম-দেশপ্রেম বা লেনিন-ষ্ট্যালিনের 'পিতৃভূমি' বা মাওদের ' মাতৃভূমি' রক্ষা বা মুক্তির আবশ্যকতা বা কারাত বাবুদের উপনিবেশ হতে স্বাধীনতা লাভ ইত্যকার কোন কিছুই শ্রমিকের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সহায়ক নয়, প্রয়োজনীয়তো নয়ই।

তবু, 'স্বজাতি' ও 'স্বদেশ" এর পোষাক আবৃত করে দুনিয়ার শ্রমিককে দেশ-জাতির গন্ডিতে আটক ও আবদ্ধ করে শ্রমিক শ্রেণীর দুনিয়া জয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতেই ইস্তাহারের তদসংশ্লিষ্ট অংশের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যেমন প্রমাণিত, তেমন অনুরূপ রাষ্ট্র গঠন-নিয়ন্ত্রণ করে বা তদানুরূপ রাষ্ট্র গঠন-পত্তনে কমিউনিস্ট পার্টি নামীয় দল বিশেষ, দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা করে লেনিনীয় ' গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার" নীতি দ্বারা পরিচালিত দল, এবং দল পরিচালনাকারী দলপতি বা রাষ্ট্রপতি বিশেষ যেমন লেনিন , তেমন ষ্ট্যালিন, মাও, হো-চি, কিম, হোক্সা, টিটু,ক্রুশ্চেভ-ব্রেঝনেভ, চসেস্কু, জারুজালিস্কি, ফিদেল, এবং কারাত, দহল প্রমুখ নানান জাতীয় ও নানান স্তরের নানান পতি সকলেই সুযোগ-সুবিধাভোগী বলেই ইংরেজী ভাষায় দখল থাকা সত্ত্বেও কারাত বাবুদের পার্টিও কেবলমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক জালিয়াতি-প্রতারণা ও চালবাজিকে আড়াল ও জায়েজ করার মাধ্যমে অন্তত ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে ফাঁকি দিতে ও শ্রমিক

শ্রেণী সহ মুক্তিকামী মানুষজনের মধ্যে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অমন জালিয়াতি পূর্ণ অনুবাদ করে তা বছরের পর বছর বা বহু বার বহু সংস্করণ ছাপিয়ে প্রকাশ করলেও কখনো ভুল-ত্রুটির নামমাত্র উল্লেখ করেনি।

আবার, অন্যদিকে, লেনিনদের ঘাড়ে সোওয়ার হয়ে মরণাপন্ন পুঁজিবাদ এ যাবৎ টিকে থাকার লড়াই করলেও পুঁজির কেন্দ্রীভূত রূপ-চরিত্রের কারণেই বৈশ্বিক সিন্ডিকেট গঠন করে ঐ বৈশ্বিক কেন্দ্র হতে দেশ বিশেষের শুধু নীতি-কৌশল নির্ধারণ বা মুদ্রার দাম নির্দিষ্টকরণ বা আইন-কানুন পাল্টানো-বদলানোই নয়, বরং, গ্রামীণ কালভার্ট নির্মাণ হতে জ্বালানীর দাম নির্ধারণ, এমনকি নির্দিষ্ট ধরণের বিদ্যুৎ বাল্ব ব্যবহারেও বাধ্য করে বিশ্বব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকগণকে। তাই, বিশ্বব্যাংকের একচ্ছত্র আধিপত্যে -নিয়ন্ত্রণে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই নয়, আটক-বন্দী বটে খোদ মহা প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী গয়রহ। তবু, কারাত বাবুরা বলবেন- স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ইত্যকার ভুয়া বুলি? তবে, রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদের পরিণতিতেও স্বীয় চরিত্রদোষে সংকট মুক্ত হতে পারেনি বলেই ১৯৭০ দশকের সংকট মোকাবেলায় বিশ্ব পুঁজিবাদ ভুয়া মুক্ত বাজারের ধ্বণি তুলে মুলত বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্বে-পরামর্শে, শর্তে ও নজরদারী-খবরদারীতে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করায় বিগত দশকেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আবশ্যকতা যেমন ফুরিয়ে আসছিল, তেমন লেনিন-মাওদের রাষ্ট্রগুলোতে ব্যক্তিগত পুঁজির বহর বাড়ছিল রাষ্ট্রীয় নীতি-কর্তৃত্ব বলে এবং রাষ্ট্রীয় -দলীয় সুযোগ-সুবিধাভোগী নানান পতিদের বলেই লেনিনের সাম্রাজ্য এখন নাই, মাওয়ের সাম্রাজ্য ব্যক্তিমালিকানাকে সাংবিধানিকমূলে " অলংঘনীয়" অধিকার হিসাবে ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের চেয়ে চীনের পুঁজিপতি বা চীনে শ্রম শোষণে নিয়োজিত যে কোন দেশের পুঁজিপতিকেই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তথাকথিত ' সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি' চালু করেছে। ফলে- সারা দুনিয়ায়ই কমিউনিস্ট পার্টি নামীয় লেনিনবাদী-মাও পন্থী পার্টিগুলো দিনে দিনে ক্ষয়িত-অবক্ষয়িত হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও বিশ্ব পুঁজিবাদ স্বসৃষ্ট সংকট হতে রেহাই না পেয়ে আবারো ২০০৮ সালে মন্দায় পড়ে বিগত শতকের ৮০ দশকের মুক্তবাজারী ফর্মুলার বদল করে এখন বিশ্বব্যাংকেরই প্রস্তাবনায় ও সুপারিশে এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্রে চালু করছে- পাবলিক, প্রাইভেট পার্টনারশীপ তথা -পি.পি.পি নীতি। তাতেও রেহাই পাবে না বয়োবৃদ্ধ -জরাজীর্ণ ও কবরপাড়ে উপনীত-পুঁজিবাদ।

লেনিন-মাওদের বা হো-চি-ফিদেল বা কারাত বাবুদের দেশ-জাতির মধ্যে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে তথাকথিত সমাজতান্তিক রাষ্ট্র গঠন বা পত্তন নয়, বা তদার্থে গণতান্ত্রিক বা নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ছুতায় দেশ বিশেষের সীমানায় বন্দী বা আটক-আবদ্ধ হওয়া নয়, বা হোক ভূমিহীন বা ষ্ট্যালিন, কিম ও মাওদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী বা নারী, যেই হোক , কারোই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন নয়, বিপরীতে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই যে ব্যক্তিমালিকানার সীমা ক্রমাগতই সংকোচিত করার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার পথে ধাবিত হয়ে এখন কার্যত মাল্টি ন্যাশনাল করপোরেশন, রাষ্ট্র ইত্যাদির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে উৎপাদন উপকরণের বেশীরভাগের মালিকানা অর্পন করে ইতো:মধ্যেই ব্যক্তিমালিকানার প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে গুরুত্বহীন পর্যায়ে নিয়ে এসে এবং সামগ্রীকভাবে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিকে এক কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে গিয়ে কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

পুঁজিবাদে- আলংকারিক রাজা-রানী বনা ছাড়া মধ্যযুগীয় বর্বর রাজা হওয়ার সুযোগ নাই। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও লেনিন-মাওরা একালের মহাক্ষমতাধর রাজা-ধিরাজ বনে দুনিয়ায় রাষ্ট্র সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভয়ানক ভূমিকা পালন করে দুনিয়ার শ্রমিককে 'স্বদেশ', 'স্বজাতি'-এর কল্পিত জালে ও মায়ায় আবদ্ধ করতে চাইলেও বৈশ্বিক পুঁজিবাদই কেবল পুঁজি-পণ্যের সঞ্চলন তথা বাজারের মাধ্যমে দুনিয়াকে জয়-একত্রীকরণ ও দখল করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেনি, বরং সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়ে সমগ্র দুনিয়াকে কার্যতই একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করে এই ভিলেজের পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াত সুগমে ও নিশ্চিতে ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে সত্যিকার অর্থেই একটি একক সংস্থাভূক্তকরণে সাফল্য লাভের মাধ্যমে কার্যত দুনিয়া ভাগ-বিভাগকারী রাষ্টগুলোকে অকার্যকর করে দিয়ে দুনিয়া হতে রাষ্ট্রকে বিদায় জানানোর প্রত্যক্ষ নজির স্থাপন ও উপযুক্ত শর্ত উপস্থাপন করেছে । ফলে-মানব জাতির সমগ্র বিশ্বের অধিকার অর্জনে তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথটিকে দৃশ্যমান করে তুলেছে পুঁজিপতি শ্রেণী । তদুপুরি, পুঁজিবাদী উপকরণ মোবাইল-ইন্টারনেট এ বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে, এ বিষয়ে মৌলিক শর্ত -দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি ও সম্মিলিত আন্দোলন পরিচালনায় উপযুক্ত ও যোগ্য বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর একটি একক বিশ্ব সমিতি। সেই রূপ ঐক্য গড়ে তোলার জন্যই কমিউনিস্ট

ইস্তাহারের শেষ প্যারার শেষ লাইন এই: " The Proletariat have nothing to lose but their chains. They have a world to win.."

এবং কোনো দেশ বিশেষ নয়, বরং একটি দুনিয়া জয় করতেই শৃংখলিত শ্রমিক শ্রেণীর আহবান এই: " Proletarians of all countries, unite."

কিন্তু, লেনিন-মাওরা মুখে মুখে " দুনিয়ার মজুর এক হও" শ্লোগান দিয়েও কার্যত দুনিয়া জয় করা নয়, বরং দুনিয়াকে অসংখ্য রাষ্ট্রিক শৃংখলে বন্দী ও বিভক্ত করে ভূমি সহ নানান শৃংখলায় শ্রমিক শ্রেণীকে শৃংখলিত করার মাধ্যমে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের বেড়ীতে আবদ্ধ করে তাদের দুনিয়া জয় করার পথেই কেবল ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, অধিকন্ত, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী চেতনাকে বিনাশ-ভোতা ও বিভ্রান্তকরণে জাতি প্রেম, মাতৃ/পিতৃভূমি প্রেম, ভূমি প্রেম, দলপতি ও দল প্রেম ইত্যকার নানান জাতীয় নানান প্রেমের নানান রশি ব্যবহারে ভয়ানকভাবে সচেষ্ট ছিল এবং এখনো লেনিনবাদী-মাও পন্থার পতিবৃন্দ অনুরূপ নানান রশিতে বেঁধে রাখতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই রূপ ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্যই কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে কারসাজি মূলে বিকৃত অনুবাদ করে উহাকে একটি ভুয়া বা ফেইক ডক্যুমেন্টে পরিণত করেছে বলেই মস্কো ও কলকাতার বাংলায় অনুদিত ও প্রকাশিত ইস্তাহারটি, মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক প্রণীত কমিউনিস্ট ইস্তাহার নয়।

লেনিনবাদীরা যতরকম প্রেমের রশিতে বাঁধুক বা শৃংখলিত করুক দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে, বার্ধক্যের জরাজীর্ণতায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত অতীত আশ্রিত পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের অজান্তে দেশ-জাতির সীমা-গন্ডী প্রকাশ্যে চুরমার না করলেও কার্যত সুনামির জলোচ্ছ্বাসের জলের মতো তা ভাসিয়ে দিয়ে এবং ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো তা ভেংগে তছ-নছ করেও, ভাংগা-চুরা ও বিধ্বস্ত রাষ্ট্রিক কাঠামো সহ সংকট উত্তরণে ব্যর্থ লেনিনবাদ সমেত বিশ্বব্যাংক -আই.এম.এফের ঐতিহাসিক অযোগ্যতা ও অক্ষমতায়ও কেবলই টিকে আছে পুঁজিবাদের কপিনে শেষ পেরেক ঠুকার হাতিয়ার তথা শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতির অনুপস্থিতিজনিত কারণে। পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই যেমন সামান্য সংখ্যক পরজীবী তথা পুঁজিপতির জন্যই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ইত্যাদির মতো বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেও সংকট হতে পরিত্রাণ পায়নি, তেমন সেনাশক্তির বলেও পরিত্রাণ

পাওয়ার সুযোগ নাই। বরং, পুঁজিবাদীদের রক্ষক ও সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সংগঠনের বিপরীতে ও তদস্থলে দুনিয়ার সকল মানুষের একটি বিশ্ব সমিতি প্রতিস্থাপনের প্রত্যক্ষ বস্তুগত ভিত্তি তৈরী করেছে পুঁজিবাদই। কাজেই, মালিকহীন,শ্রমিক হীন, শোষণহীন, শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থাপনায় ইস্তাহার ঘোষিত এক বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠায়- সকল দেশের শ্রমিকের একটি বৈশ্বিক সমিতি যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত সরকারী শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র বিলোপ ও পুরনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তি নিশ্চিতির শর্ত পুরণ তথা সকলের মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিতির মাধ্যমে এবং তদমুলেই শ্রমিক শ্রেণী নিজের শৃংখল হতে যেমন মুক্ত হবে, তেমন সমগ্র মানব জাতিও শৃংখলমুক্ত হবে এবং ভূমিহীনেরা ২ একর ভূমি মালিকানা হাসিল নয়, বা দেশ-জাতির মুক্তির অজুহাতে দেশ বিশেষের ভুয়া মালিক নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণী সত্যি সত্যি জয় করবে, বিশ্ব।

অথচ, উপরোদ্ধৃত ছোট্ট ইংরেজী বাক্যেরও উভয়েরই বাংলা অনুবাদও ভ্রান্তিদোষে দুষ্ট। লেনিন যেমন একটি মাত্র দেশ জয় করে আরো দেশ জয়ে প্রয়োজনে সামরিক হামলা-আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক দেশ জয় করে মাওদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন গড়ে, তবেই- ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে সমগ্র বিশ্ব বা সারা জগৎ জয় করবেন, এবং সেটিই হবে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব জয়ের পথ-পরিক্রমা বলেই তদানুরূপ বিশ্ব জয়ের তদানুরূপ ধারণা ছড়াতে - " জয়ের জন্য তাদের একটি বিশ্ব আছে।" এর স্থলে " জয় করার জন্য আছে সারা জগৎ" উভয়ের অনুবাদে বিবৃত আছে। অর্থাৎ মার্কসরা যেমন পরিস্কার করে ইস্তাহারের গোটা বিবরণ দিয়ে সমাপ্ত করেছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শ্রমিক শ্রেণীকে দেশহীন, জাতিহীন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন ও আন্তর্জাতিকতাবাদীতে পরিণত করেছে তেমন দেশ না থাকলেও শ্রমিকদের জয় করার জন্য আছে "তাদের একটি বিশ্ব" যা জয় করার জন্য তাদের হারাতে হবে শুধুই শোষণের শৃংখল। কাজেই, কেবল দেশ প্রাপ্তি বা জাতি মুক্তি নয়, ২ বিঘা ভূমি লাভ বা ঋণের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সম্পতিবান তথা ধনী হওয়ার খোয়াবও প্রলেতারীয়েতের মুক্তির পথে বাঁধা, অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানার স্বপক্ষে পরিচালিত ক্রিয়া-কলাপ বা তদানুরূপ চিন্তা চেতনা আধুনিক শ্রমিকের জন্য যেমন, তেমন শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য না হয়েও সমাজ মুক্তির শর্তে নিজ নিজ মুক্তি হাসিল বা তদ্রুপ মুক্তি প্রত্যাশীগণেরও শৃংখল বটে।

সুতরাং, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শৃংখলিত করার যাবতীয় রশির মূলোৎপাটনে একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রমিক শ্রেণী তাদের শৃংখল মোছনে যখন তাদের বিশ্ব জয়ে একটি বিশ্ব সমিতিতে একত্রিত হবে তখনই ইস্তাহারের শেষ প্যারায় যেমন বলা আছে-"Let the ruling classes tremble at a communist revolution." অর্থাৎ একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতংকে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক।" তেমন ভয়ে কাঁপতে শুরু করবে সকল লেনিনবাদী মোড়ল-মাতুব্বর সমেত দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিপতি-পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদের আশ্রিত পরজীবী গয়রহ।

ইস্তাহারের এই বাক্যেও যথার্থভাবেই, লেনিন-মাওদের নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক ধরণের নানান জাতীয় বা দেশীয় বিপ্লব নয়, বরং কমিউনিস্টদের করণীয় হিসাবে কেবল একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনই চিহ্নিত হয়েছে। কারণ- পুঁজিবাদী সমাজ একটা, তদস্থলে সমাজতন্ত্র একটা ছাড়া একাধিক বা ততোধিক হওয়ার সুযোগ যেমন নাই, তেমন পুঁজিবাদ - একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বলেই সমাজতন্ত্রও একটি আঞ্চলিক বা স্থানীয় বা দেশীয় বিষয় নয়। তাই, কমিউনিস্ট বিপ্লব একাধিক নয়, একটি এবং ইস্তাহারে মার্কস-এ্যাংগেলস যথার্থভাবে নির্দিষ্ট করেছেন- " একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব" ।

কাজেই, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব ব্যতীত নয়া বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক ইত্যকার কোনো ধরণের বিপ্লব সংঘটন করার যেমন আবশ্যকতা নাই তেমন ঐ গুলি ক্ষতিকর বটে -দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির পার্টি সেহেতু কমিউনিস্ট পার্টিও লেনিন-মাওদের তথাকথিত বিপ্লব সংঘটন করতে পারে না বা তদানুরূপ বিপ্লবের কলা-কৌশল গ্রহণ ও কার্যকর করতে পারে না।

সুতরাং, কমিউনিস্ট মাত্রই কেবলমাত্র ঐ একটি বিপ্লব তথা ব্যক্তিমালিকানা অবসানের একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নিমিত্তেই সংগঠিত ও সক্রিয় হতে হবে, কেবলমাত্র একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে। এবং সন্দেহাতীতভাবে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী সচেতন ও সংগঠিত করতে তথা ইস্তাহারের প্রথম ধ্বণি ও নীতি- " দুনিয়ার মজুর এক হও" কার্যকরীকরণে কার্যকর ও উপযুক্ত পার্টি কোনোভাবেই স্থানীয় বা জাতীয় নয়, **অতি অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে- বৈশ্বিক।**

-সমাপ্ত-

Truth for delightful life

What & Why

Primary Declaration

মাত্র ১১-১২ শ বিলিয়নিয়ার ও কোটি কোটি নি:স্ব-হতদরিদ্র ও বেকারসমেত বিশ্বের মোট প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না যে, স্থায়ী অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা বৈ আনন্দময় জীবন যাপন করছেন। কিন্তু কেন ?

মানব জাতির ভোগ-ব্যবহারের সামগ্রী উৎপন্নে ন্যাচরাল রিসোর্সের সকলক্ষেত্র এখনো অনির্ণিত;এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সহিত মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। তাই সম্পদ সীমিত, একটি ডাহা মিথ্যা কথা; প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম শক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় জড়িত মাত্র ৩৫০ কোটি মানুষ ২০০৮ সালে ধরিত্রীর সকলের জন্য জনপ্রতি বার্ষিক ১০,৪০০ ডলার উৎপন্ন করেছে । অথচ, ঐ বছরই ২২০ কোটি মানুষ বার্ষিক ৭৫০ ডলার ও ১২০ কোটি মানুষ দৈনিক ১ ডলার করে ব্যয় করতে পারেনি,উপরন্ত ৬০ লাখ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে।অন্যদিকে মোট ২৭ ট্রিলিয়ন ডলারের মজুত সংকটে পড়ে তৎকালে দুনিয়ার প্রথম ধনীব্যক্তিটি সহ খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ বিলিয়নিয়ার তাঁদের মোট পুঁজির অংশবিশেষ হারিয়েছে এবং গাড়ী উৎপাদনে বিশ্বের ৪নম্বর- "জেনারেল মোটরস" সহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু কোম্পানী - ব্যাংক ইত্যাকার বহু প্রতিষ্ঠান দেওউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। প্রাইভেট প্রপার্টি হারানোর আতংক মুক্ত নয় কেউ। কিন্তু কেন?

শ্রম ব্যতীত মূল্য সৃষ্টি না হলেও এবং অপরিশোধিত শ্রম তথা আত্মসাৎকৃত শ্রম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজি, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি হলেও ধরিত্রীর অধিকাংশ মানুষ যাঁরা শ্রম শক্তি বিক্রেতা তাঁরা সম্পদের স্রষ্টা হয়েও সম্পত্তিহীন; আর যাঁরা শ্রম করে না তবে শ্রম শক্তির ক্রেতা বা অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী সেই সকল পরজীবী সংখ্যাল্প মানুষেরাই প্রায় সকল সম্পদের মালিক। কিন্তু কেন?

মহাজগত ও মহাজগত হতে উদ্ভূত জীবজগত হচ্ছে বাস্তব। তাই, অলৌকিকতা-মিথ বা কল্পকথা নয়, বস্তুগত বাস্তবতাই হচ্ছে সত্য। মহাজগত কেউ তৈরী করেনি এবং জীব জগতের বিবর্তন তথা জীবের জন্ম-বিকাশ ও মৃত্যুও বস্তুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৈ অবস্তুগত বিষয় নয়। জীবের " আত্মা" বলে কিছু নাই; তবু লোকে দেহকে নশ্বর ও আত্মাকে অবিনশ্বর গণ্যে কেবলই দেহে আত্মার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে জীবন-মরণ গণ্য করাসহ লোকের ধনী-নির্ধন হওয়া-না হওয়া, বা রোগ-বালাই ও চিকিৎসা হওয়া-না হওয়া বা জ্ঞানী-গুণী বা শিক্ষিত- মেধাবী বা প্রতিভাধর হওয়া- না হওয়া ইত্যকার যাবতীয় দৈনন্দিন লৌকিক বা বস্তুগত বিষয়াদিকে কেবলই অবস্তুগত বা অলৌলিক তথা ভূয়া কর্তৃত্বের ক্রিয়া-কর্ম রূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বশত মুক্তি প্রত্যাশায় ঝাড়-ফুঁক,তাবিজ-কবজ ও ধান্ধাবাজ-বুজরুক এবং চালাক-চতুর মহাজ্ঞানী-মহাজনদের পালায় পড়ে বা শরণাপন্ন হয়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎসত্ত্বেও ঘাটের কড়ি খরচ করে মহাজনদের চিরস্থায়ীত্ব সহ ' চিরন্তন আত্মা'র চিরকালীন শান্তি -সদগতির জন্য পূজন-ভজন বা আচার-আচরণ করে আসছে। কিন্তু কেন ?

পজেটিভ-নেগেটিভ অর্থাৎ বিপরীত শক্তি তথা বৈপরীত্যের ঐকাই বস্তু। তাই,দ্বান্দ্বিকতার হেতুবাদে বস্তুমাত্রই ক্রিয়াশীল-গতিশীল।বস্তু জগতের বস্তু নিচয় পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল এবং পারস্পারিক তাপে-চাপে বস্তুমাত্রই পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরিত হয় । অত:পর, বস্তুগত জগত ও জীবনকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে দেখা-বুঝার নিমিত্তে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভবের পরও মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-পীড়ন ও দমন করার জন্য নিছক সংকীর্ণ ব্যক্তি ও শ্রেণী স্বার্থে স্বার্থান্ধ-ঘৃন্য,বর্বর-অসভ্য,প্রবঞ্চক-তস্কর, খুনি-সন্ত্রাসী ও ভন্ডসহ তাবৎ পরজীবীদের মহাওস্তাদদের সৃষ্ট ও অজ্ঞতা ভিত্তিক,মূঢ়তা নির্ভর, প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের বোধহীন কেবলই অন্ধ বিশ্বাস আশ্রিত, স্বশ্রেষ্ঠত্বের আক্রোশী অহংবোধ পুষ্ট; এবং ব্যক্তির মর্যাদাহীনতা-সচেতনাহীনতা এবং যুগৎ স্বৈরতান্ত্রিক ও গোলামি মানসিকতার- ভাববাদী মতাদর্শ দ্বারা তাড়িত বহু মানুষ এখনো জীবন ও জগতকে কৃত্রিম বা অসত্যভাবে দেখে বলেই কল্পনা-আশ্রিত হয়ে ঠকে, শোষিত-বঞ্চিত ও প্রতারিত-শাসিত হয় এবং কার্যকারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন না করে বা প্রমাণ ও যুক্তি-তর্ক নয় কেবলই পূর্বারোপিত বোধ ও অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয় বা সামগ্রীকতা নয়, খন্ডিত; পরিপূর্ণ নয়, আংশিক নিদেনপক্ষে,ভিতর-বাহির নয়, কেবলই বহিরাংগ দেখার স্থুল দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। কিন্তু কেন ?

আদিতে বহুকাল মানব জাতির মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য ছিল না; কিন্তু, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে অজ্ঞতার কারণে জীবন ধারণের উপকরণের অভাব বৈ প্রাচুর্য ছিল না । তাইতো, অভাব হতে রেহাই পেতে যেমন স্থানিকতার প্রেমে আবদ্ধ নয় বরং মাইগ্রেশন করেছে মানুষ তেমন উপরকরণ লাভ ও উৎপন্ন করতে গিয়ে কতিপয় চালাক-চতুর লোক মাথা ও গায়ের জোরে দখল-বেদখল ও হত্যা-খুন, প্রতারণা-জোচ্চুরি ও জালিয়াতির মাধ্যমে বেশীরভাগ মানুষকে দাস বানিয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পত্তন করলেও নতুন উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ-বৈরীতায় অতীতের প্রতিটি সমাজই বিলীন-বিলোপ হয়ে শেষত মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদনের পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেও এবং ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে শ্রম শক্তি শোষণ করে পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈরীতা-বৈষম্য ও শত্রুতা সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী বিভাজনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি টিকে থাকার আবশ্যকীয় শর্তে- পুনরুৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ তথা পুঁজির সঞ্চালন ও বিনিয়োগের আবশ্যকতায় পণ্যের সস্তা দর সমেত অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নানাবিধ নিষ্ঠুর-জঘন্য কার্যাদির মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে দখল করে সাবেকী সকল ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থার বিনাশ ঘটিয়ে এবং সাবেকী মালিকদের সম্পত্তিহীন করে সমগ্র দুনিয়াকে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদীন ব্যবস্থার আওতায় এনে এবং পুঁজিবাদী ধাঁচে সমগ্র দুনিয়াকে গড়ে সমগ্র দুনিয়ার একাংশকে আরেকাংশের বা একাঞ্চলকে অপরাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল করে এবং দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে অপরাপর মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার বস্তুগত শর্ত তৈরী করে একটি বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় নিত্য-নতুন উৎপাদন উপকরণের সৃষ্টি ও নৈরাজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন করে পুন:পুন সংকট-মহাসংকটের চক্রে নিমজ্জিত-নিপতিত হয়ে উদ্ধার আশায় দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের তান্ডব ও হিংস্রতা সংঘটিত করে কোটি কোটি মানুষ খুন-জখম এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য ও অসংখ্য স্থাপনা-অবকাঠামো ধ্বংস করে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতিকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ-গাইড ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক সহ নানান সংস্থা-সংগঠন জন্ম দিয়েও পুঁজির জন্ম শর্তেই সৃষ্ট মন্দা-মহামন্দার

কবল হতে রেহাই পায়নি পুঁজিবাদ । অথচ, উৎপাদন উপকরণের এমন বিদ্রোহ তথা মহাসংকটের হেতুবাদেই যে, পুঁজিবাদী সমাজ বিলীন ও বিলুপ্ত হবে তাও ভাবতে-মানতে চায় না ইত:পূর্বে অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তিচ্যুতির ঐতিহাসিক নায়ক সেই পুঁজিবাদী শ্রেণীসহ তাঁদের প্রভাবিত জনসমষ্টি। কিন্তু কেন?

সকল অনিশ্চয়তা, অকল্যাণ ও অশান্তির জন্য দায়-দোষী ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ-বিনাশ এবং ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক-সমর্থক তাবৎ সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদির বিলুপ্তি না ঘটিয়ে ভূয়া জনকল্যাণ, অবাস্তব দারিদ্র দূরীকরণ ও কৃত্রিম শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তথা শোষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ, জাতি সংঘ ও তাদের সদস্য ও সহযোগী এবং সমর্থক সংস্থা-সংগঠনগুলো বহু বছর যাবৎ ক্রিয়াশীল থাকলেও পরজীবী বৈ বেশীর ভাগ মানুষের যে কল্যাণ বা সমৃদ্ধি হয়নি এবং শান্তি যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাতো নিশ্চিত; তবু মানুষ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে এখনো পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী নয়।কিন্তু কেন ?

ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম মানবীসহ কালে কালে বাস্তব জগতের সের্ভেৎ-ব্রুনোরা বহুজন- কি ও কেন'র উত্তর জানার চেষ্টা করে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবু, কোপার্নিকাস, ডারউইন, আইনাষ্টাইন, মার্কস-এ্যাংগলস প্রমুখ বহু বহুজন জীব ও জগতের বিষয়গুলোকে কি ও কেন দ্বারা প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে ইতো:মধ্যে পৃথিবীর স্থিরতা ও কেন্দ্রীকতা বিষয়ক ভূয়া বক্তব্য ভূয়া প্রমাণ করে সোলার সিস্টেমসমেত মহাবিশ্বের বয়স-ব্যাপ্তি সহ প্রকৃতির গতি-প্রকৃতি এবং জীব ও জীবনের রহস্য উন্মোচন এবং সম্পদ ও সম্পত্তিবান সৃষ্টি তথা ধনী-দরিদ্র হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন ও উৎপাদন উপকরণের সহিত মানুষ ও মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক সম্পর্কাদি-তথ্য ও সূত্র তথা মানবজাতির বিকাশের ইতিহাস আবিস্কারের মাধ্যমে পুন:পুন মন্দা কবলিত বয়োবৃদ্ধ-অতীত আশ্রিত পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি-প্রাচুর্যময়, শোষণহীন, শ্রেণীহীন, চিরকালীন শান্তি ও অনাবিল আনন্দের সাম্যবাদী সমাজের তত্ত্ব-সূত্র আবিস্কার-ব্যাখ্যা করা সহ মোবাইল-ইন্টারনেট প্রযুক্তি করায়ত্ত করলেও তদপুরি, শিক্ষা-চিকিৎসা, পরিবহন-যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারে আগ্রহী হয়েও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাকে বুঝতে বা মানতে অসংখ্য মানুষ এখনো আগ্রহী নয়। কিন্তু কেন ?

নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মুক্ত হয়ে বা সাবেকী সকল প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের ঘেরাটোপের কবলমুক্ত হয়ে কেবলই খোলা চোখে- প্রকৃতির সহিত মানুষের এবং মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেখতে সক্ষম হয়ে দুনিয়ার শ্রমজীবী ও মুক্তিকামী মানুষ একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হলে, নিদেনপক্ষে অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়ার মাধ্যমে যে, পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুনিয়া থেকে যেমন মালিক তেমন শ্রমিক শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে অর্থাৎ মজুরী প্রথা বিলোপের মাধ্যমে জাত-জাতি, ধর্ম-বর্ণ, লিংগ ইত্যকার সকল ভেদাভেদ মুক্ত কেবলই মানুষ পরিচয়ে পরিপূর্ণ মানবিক বোধে পরিপূর্ণ-মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসাবে সমগ্র দুনিয়াকে সকলের বসবাসের অবাধ বিচরণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার করে জনবসতির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে জনবসতি ও বসবাসের অভিশাপ হতে যেমন তেমন বসতিহীনতার দুর্ভোগ-দুরাবাস্থা হতে মুক্তি দিয়ে ধরিত্রীর সকলের জন্য আবশ্যকীয় সকল সামগ্রীর পরিকল্পিত উৎপাদন ও সকল কাজে সকলের অংশগ্রহণের উপযোগী একটি বৈশ্বিক সমিতি বা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত বলেই রাষ্ট্রিক গন্ডী বা রাজনৈতিক ভাগ-বিভাজন মুক্ত একক ধরিত্রীর মুক্ত-স্বাধীন বাসিন্দা হিসাবে সকল মানুষ প্রকৃতি ও জীবজগতকে খোলা চেখে দেখতে পাবে বলেই সকল মানুষ বিজ্ঞানী হিসাবে বৈজ্ঞানিক কার্যাদির মাধ্যমে কেবলই প্রকৃতি জয়ের আনন্দে চিরকালীন আনন্দিত হতে সক্ষম হবে; তাওতো তত্ত্বগতভাবে প্রমাণিত। তবু, অনুরূপ অনাবিল আনন্দ লাভ তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণীসহ সাম্য প্রত্যাশীরা তদার্থে সফল হতে পারছে না। কিন্তু কেন ?

মার্কসদের মতে- বুর্জোয়া অর্থনীতিই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিগত বিরোধ ক্রমেই মিলিয়ে দিচ্ছে। এবং মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ বন্ধ হলে বা জাতির মধ্যকার শ্রেণী বিরোধ দূর হলেই জাতিগত শত্রুতা ও বৈরীতার অবসান হবে। তবু, তদানুরূপ কাজ না করে বরং জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদির ছুতায়- পচন ও পতনশীল বুর্জোয়া সমাজের চাপে-ভারে স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য রাষ্ট্রকে ভেংগে যেমন বুর্জোয়ারা তেমন লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা বহু রাষ্ট্রের জন্ম দিতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে জাত-জাতির মোড়কে আবদ্ধ করে স্বদেশি-স্বজাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কেবলই বিবদমান বুর্জোয়াদের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে নিজের শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে এবং শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়ার পরিবর্তে বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহে বাধ্য হয়ে নিজেদের দুরাবস্থা বর্ধিত করা সত্ত্বেও অনুরূপ ক্রিয়াদিকে মহান কর্ম হিসাবে গণ্য করছে লেনিনবাদীরাও । যদিচ, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত জন্মলগ্নেই বিরোধ শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণীর এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোনো দেশ নাই বলেই তাঁরা আন্তর্জাতিক। তবু, তাঁদেরকে দেশপ্রেমিক হতে বলা হয়। কিন্তু কেন ?

বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় অর্থনীতির স্বার্থে যথার্থভাবে সাবেকী মালিকানা উচ্ছেদ করায় উচ্ছেদকৃত শ্রেণী যেমন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তেমন বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্রিয়ায় অস্থিত্ব সংকটে নিপতিত নিম্ন বিত্ত, হস্ত শিল্প কারাখানা মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী প্রমুখরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে তাঁরা সমাজকে পিছনে ফিরিয়ে নিতে চায় বলে তাঁরা প্রতক্রিয়াশীল। কিন্তু, বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের উপযোগি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে বলেই শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম -প্রগতিশীল। অথচ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশ্বিক শৃংখলের আওতায় অবাস্তব ও অসম্ভব হলেও স্বাধীনতা ইত্যাদির অজুহাতে কার্যত পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অপ্রচেষ্টা এবং যা কস্মিকালেও সম্ভব নয়; তবু দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর তেমন ধরণের আন্দোলনকে সমর্থন এবং তাকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করা বা প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াদের আন্ত বিরোধ-বৈরীতায় অংশ গ্রহণ বা সমর্থন করা বা পক্ষভুক্ত হওয়া এবং এমনকি- ভূমি সংস্কারের অজুহাতে শ্রমিক শ্রেণীর গ্রামিণ মিত্র ক্ষেতমজুরকে ভূমির শৃংখল ও ব্যক্তি মালিকানার মোহান্ধতায় আবদ্ধ করে শিল্প শ্রমিক শ্রেণীকে দুর্বল ও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট-ব্যাহত ও বাঁধাগ্রস্ত করছে লেনিনবাদী-মাওপন্থীরা । কিন্তু কেন?

স্থানীয় বা জাতীয় নয়, পুঁজিবাদ একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা।তাই, পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপনের সমাজতন্ত্রও বৈশ্বিক বলেই মার্কসদের মতে-এক দেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়; এবং **শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অন্যূন শর্তসমুহের প্রথমটি হচ্ছে অগ্রণী সভ্যদেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া**। এবং শ্রমিক শ্রেণী নিজেই তা অর্জন করবে। তদমর্মে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি ছিল না ও অগ্রণী সভ্যদেশগুলোর অনুরূপ মিলিত ক্রিয়া সংঘটিত হয়নি। তবু, দাবী করা হল যে,কেবলমাত্র রাশিয়ায় এবং পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপীয় বকে বা চীন-ভিয়েতনাম ইত্যকার দেশে সমাজতন্ত্র প্রতষ্ঠিত হয়েছে। আবার, মার্কসদের মতে, বেচা-কেনার লোপ ও রাষ্ট্রের বিলোপ বৈ ক্রেতা-বিক্রেতা সমেত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র নয়; অথচ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকরণের 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলো যেমন পরস্পর বিরোধ-বৈরীতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে তেমন পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের সহমতে-সহযোগে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন আই.এম.এফের সহপ্রতিষ্ঠাতা হয়ে স্বয়ং কমিউনিস্ট গণ্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ইউরোপীয় বকসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্থিত্ব এখন নাই; চীন-ভিয়েতনামও বিশ্বব্যাংকের সদস্য এবং ব্যক্তি মালিকানা নিশ্চয়তাকৃত। তাছাড়া, প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট নামীয় পার্টিগুলোও বহুধাভাগে বিভক্ত এবং কেবলই অবক্ষয়িত। কিন্তু কেন ?